Durga Puja Program October 16, 2010

Puja	… 11:00 AM
Anjali	… 12:00 Noon
Prasad & Lunch	… 12:30 PM
Cultural Program	… 2:30 PM
Puja & Arati	… 5:00 PM

Cultural Programme 2:30 ~ 5:00 PM

Devi Vandana	Sneha Ruikar
Rabindrasangeet (Tagore songs)	Yuka Okuda, accompanied on tabla by Masanori Hisamoto
Rabindrasangeet tunes	Aishwarya Kumar, Nishant Chanda and Aryan Kumar
"Selfish Giant" (*Rabindranath Tagore's Music & Poems have been weaved into Oscar Wilde's immortal story The Selfish Giant To form an enchanting musical*)	Adrija, Amartya, Akash, Akansha, Arunansu, Asmita, Gargi, Joy, Madhumanti, Manjari, Manav, Maya, Neetra, Nimisha, Rupkatha, Saptarshi, Sneha Kundu, Sneha Ballabh, Soumiya, Subhankar, Tojo and Tannistha. Special dance appearance by Sudipta Bhawal Mukherji Dance choreographed by Subha Kokubo Chakraborty Directed by Sudipta Roy Chowdhury
	* * * * * * *
Contemporary dance *Based on Ananda Shankar's music*	Bithika Washizawa, Malini and Shauna
"Ami eto je tomay bhalobeshechi" Eternal love songs in Bengali and Hindi	Anindya Bhattacharrya, Biswanath Paul, Bhaswati Ghosh, Indranil Roy Chowdhury, Ipshita Roy, Meeta Chanda, Mitali Ghosh, Mrinmoy Das, Pamela Ballabh, Prantik Chakraborty, Rita Kar, Samudra Datta Gupta, Sagarika Das, Viswa Ghosh, Saptarshi Ballabh, Shovana Dasgupta, Sanjib Chanda, Masanori Hisamoto (tabla) and Kaori Izumida (keyboard)
Odissi Dance Performance	**Tridhara** Visiting Dance Group from India, led by Guru Gajendra K. Panda
Bengali Rock Band	**Park Street** Arka Gupta, Arnash Gupta, Prantik Chakraborty, Sachin Jain
Stage, Light and Sound management	Sanjib Chanda, Biswanath Paul, Prabir Patra, Pranesh Kundu, Santanu Nag, Saptarshi Ballabh, Madhab Ghose, Kaori Izumida, Atsushi Suzuki
Master of Ceremonies	Nandini Basu & Brajeshwar Bannerjee

Program coordinated by Rita Kar

Venue: Ota Bunkanomori Hall, Ota-ku, Chuo 2-10-1, Tokyo 143-0024, Tel.: 03-3772-0700

© Bengali Association of Tokyo, Japan (BATJ). All rights reserved.
Disclaimer: The articles compiled in this magazine are personal opinion of the authors and in no way represent any opinion of BATJ.

মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ
CHIEF MINISTER
WEST BENGAL

सत्यमेव जयते

Writers' Buildings, Kolkata-700 001
West Bengal, India
E-mail : cm@wb.gov.in
cm@wb.nic.in
Fax : 0091-033-22145480
Tel. : 0091-033-22145555

N0. 830 - P/CM
9 September, 2010

I am happy to know that the Bengali Association of Tokyo, Japan, is bringing out the next issue of 'Anjali' in October, 2010. This issue, I am sure, will focus on the cultural activities of the Indian community in Japan.

I wish the publication all success.

(Buddhadeb Bhattacharjee)

सत्यमेव जयते

AMBASSADOR OF INDIA
TOKYO

16 September, 2010

MESSAGE

I am happy to learn that Durga Puja is being celebrated by the Indian Community in Tokyo on 16 October, 2010.

Durga Puja marks the triumph of good over evil and provides an opportunity for Indians from across Japan to come together in celebrations.

An increasing number of our Japanese friends have also been participating in these annual Durga Puja celebrations, a sign of the deepening friendship and mutual understanding between our peoples.

I appreciate the efforts undertaken by the Organizing Committee to celebrate Durga Puja and extend my warm greetings to all members of the Indian Community on this joyous occasion.

(H.K. Singh)

2-2-11, KUDAN-MINAMI, CHIYODA-KU, TOKYO, 102-0074 JAPAN Telephone : 03-3265-5036 Facsimile : 03-3234-4866

সম্পাদকীয়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে নানান উৎসব, দেশ-বিদেশের রবীন্দ্রপ্রেমীরা সক্রিয় হয়েছেন কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে। আমাদের কাছেও পৌঁছেছে সেই সুরের অনুরণন -- "জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ / ধন্য হোল, ধন্য হোল মানবজীবন।" সেই ভাবাবেগে আপ্লুত আমরাও। আর তারই ফলস্বরূপ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই মুখ্যত এইবারকার "অঞ্জলি" সম্পাদনার দুঃসাহসিক অভিযান। আসলে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যে পরিমাণ জ্ঞান ও উপলব্ধির প্রয়োজন তা অর্জন করা একেবারেই সহজ নয়। তবু ভালবাসার টানে সেই অক্ষমতাকেও উপেক্ষা করা হোল।

বিদগ্ধ গুণীজনদের মত আমিও বলতে চাই, "আমার মনোজগত রবীন্দ্রনাথের গড়া। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে বলুন, দর্শন, কাব্য, ধর্মের ভিতর দিয়ে বহুর মধ্যে একের সন্ধানে বলুন, আমার মনোময় জগত সেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাঁকে আমিও আমার 'জীবনের ধ্রুবতারা' করতে চাই তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক যেন একতরফা। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাকে উজ্জীবিত করে। বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তের জন্য চিত্তশুদ্ধি হয়, উত্তরণের শিহরণও জাগে। কিন্তু যে অধ্যাত্মের ভিত্তিতে রচিত এই কবিতা ও গান, যা আমার এত প্রিয়, তাকে তো আমার জীবনদর্শন নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দিই নি ! উপনিষদের শাশ্বত বাণী, কাব্যায়িত সহজ-সরল রূপে যখন প্রকাশ পেয়েছে কবিগুরুর রচনায় তখন সেই সৃষ্টির মহত্ত্বের যৎসামান্য অনুধাবন করতে পারলেও, অন্তর্নিহিত গভীর চেতনাকে নিজের অন্তরে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারি নি। তাই কবির বাণী আমার কাছে শুধু বাণীতেই সীমিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত যেদিন আমার হৃদয়ে, সকল পূজার মন্ত্রের সাথে একাকার হয়ে মিশে যাবে, সেদিন আমি রবীন্দ্রনাথকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানানোর অধিকার লাভ করবো।

সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতার নবমূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। আজকের সমাজেও রবীন্দ্রনাথের মূল চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা হয়তো বেড়েছে বৈ কমে নি। আনন্দের বিষয়, দেশে-বিদেশের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন। রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ যার কোনও দিন হয় নি তার কাছেও রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন। আমাদের সীমিত সামর্থ্য নিয়েও আমরা সেই ব্রত পালনে উদ্যোগী। এই প্রসঙ্গে অকুন্ঠ ধন্যবাদ জানাই সেই শুভানুধ্যায়ীদের যারা তাঁদের রচনায় রবীন্দ্রনাথের নানান বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত কোরে "অঞ্জলি"কে সাহায্য করেছেন কবিগুরু-র সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনে।

জাপানের সাথে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ দীর্ঘকালের। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে যে তীর্থক্ষেত্র গড়ে তোলেন, সেই তীর্থক্ষেত্র আকর্ষণ করেছে বহু জাপানীকেও। জাপান থেকে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কিছু সময় কাটিয়েছেন অথবা জাপানে রবীন্দ্রচর্চায় নিয়োজিত থেকেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই "অঞ্জলি"র একটি বিশেষ অংশ তাঁদের রচনা দিয়ে সংকলিত করা হোল।

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষক ও প্রশাসনিক দায়িত্বের অধিকারী নেপালচন্দ্র রায়কে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমার জীবনের শেষভাগে এই কথাটা বোঝাবার জন্যেই আমি বেরিয়েছি যে, সব দেশই আমার দেশ এবং সকল দেশের ইতিহাসে জড়িয়ে মানুষের ইতিহাস তৈরী হচ্ছে। কেউবা দুঃখ দিচ্ছে কেউবা দুঃখ পাচ্ছে, কিন্তু মোট ফলটা সব এক জায়গায় গিয়ে জমে উঠছে -- নানা সভ্যতা এবং নানা রাজ্য সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা গড়ায় মানবমহিমার এক বিরাট মন্দির তৈরি হচ্ছে।"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার বাণী তাঁর সার্ধশতবর্ষেও কতটা প্রাসঙ্গিক তার বিচার করুন নিখিল বিশ্বের মুক্তমনা মানুষেরা, আর তাঁর বিপুল ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্যে ধন্য হোক সকল প্রাণী।
"অঞ্জলি"র পাঠক পাঠিকাদের জানাই আন্তরিক শারদীয় শুভেচ্ছা ।।

Editorial

Drawing those that hold his works in high estimation, preparations are right now under way everywhere in the world to celebrate Rabindranath Tagore's one-hundred and fiftieth birthday. We too resonate to this enthusiasm by dedicating Anjali 2010 to the memory of the poet whose pervasive influence we continue to feel in all walks of our lives. Indeed, it was our love and admiration for this noble soul that had emboldened us to defy our shortcomings and urged us on in our venture.

Tagore is our retreat from all earthly clamors, as the wise say, for the path that he laid before us promises our unity with the sublime. However, much as I, for one, seek guidance in his philosophy or poetry on my way along this path, I seem somehow to stray away into a one-way alley. His lyrics do seem at times to cleanse my soul and imbue me with a feeling of emotional fulfillment. Yet, I realize eventually that I have failed to follow his guidance in deciding the course of my life. If momentarily, they do awaken me to the messages of the Upanishads, though, alas, never leaving a permanent mark on my soul. His words are no more than just words in my world. If ever they merge with my prayers and settle in my heart, I will know for certain that I have paid him my tributes.

On his one-hundred and fiftieth birthday it is necessary to reassess Tagore and reassure ourselves of his relevance to our society today. Happily, there are many among us aware of the need to acquaint the younger generations with his legacy. As for us around Anjali, we think that, notwithstanding our limitations, we made the best use of our resources to enrich it this year with materials readers will enjoy. We extend our heart-felt thanks to those who helped us by throwing light on Tagore's multi-faceted activities.

Tagore's relationship with Japan was as long as it was deep. His Vishwabharati attracted many from Japan. It is of great importance to us to know of the experience sons and daughters of this country gained there. Part of Anjali is devoted exclusively to their views.

To Nepal Chandra Roy who taught in Santiniketan and also played a role in the ashram's management, Tagore once wrote that he considered himself a son of all the countries, in whose individual histories are woven the annals of mankind as a whole. Some countries have a background of inflicting sorrows, while some might have one of suffering pain. However, all that make up history collect eventually in one place. Story of civilizations and the rise and fall of empires are instrumental in building an imposing temple extolling the glory of humanity. This, he added, was the message he intended to reach the world's citizens. Tagore at the time was fairly advanced in age and was sailing abroad.

Let all open-minded citizens of the world decide how relevant Tagore's profound legacy is in leading all the world's citizens on a path of glory.

"Anjali" extends best wishes to all its readers.

Acknowledgements

Every year we come up with a new topical theme for compilation of Anjali. This year, being one hundred and fiftieth birth anniversary of Rabindranath Tagore, we thought it would be most appropriate to dedicate Anjali 2010 to the memory of the poet, whose pervasive influence we continue to feel in all walks of our lives. Indeed, it was our love and admiration for this noble soul that had emboldened us to defy our shortcomings and urged us on in our venture.

As we initiated this venture, we contacted many writers here and abroad to collect their thoughts on Tagore. The overwhelming support we received from all of them helped us to compile the special section of Anjali. We extend our heartfelt thanks to all of them. We also thank every other contributor who has enriched other sections of Anjali by their valuable contributions.

The Embassy of India in Tokyo extended their gracious support for which we are very thankful. We hope to receive the same patronage in future as well. We would like to thank all advertisers who have sponsored this year's publication. We thank Syamal Kar, Arijit Basu, Sanjib Chanda, and Byomkesh Panda for their greater achievements in building up strong relationship with all our sponsors.

Anjali continues its multi-lingual nature through articles written by native speakers of different languages and various cultural backgrounds. We sincerely thank each of them for their support. Karabi Mukherjee, Bhaswati Ghosh, and Viswa Ghosh, helped us in proof reading. We are thankful to them. We also thank Shobi Insatsu for their ongoing support in printing Anjali.

At different stages of this process, we received valuable advices from many well wishers. We tried to incorporate their suggestions as much as possible, and convey our sincere thanks to all of them.

Lastly, we would like to appreciate Nishant (Sanjib and Meeta's son), who had to bear with us when we were engrossed in Anjali's preparation.

Editorial Team

Editorial Team

Ranjan Gupta
Ruma Gupta
Sanjib Chanda
Meeta Chanda
Sudeb Chattopadhyay
Keiko Chattopadhyay

Illustrator & Collage

Meeta Chanda

Cover Design

Madhab Ghose

Integration & Design

Sanjib Chanda

(*Recent versions of Anjali magazine are available at BATJ website and Anjali 2010 will also be available later.)*

Contents

Special Theme - Rabindranath Tagore

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা - স্বামী মেধসানন্দ 10
Rabindranath Tagore's Universalism - Viswa Ghosh 19
গীতাঞ্জলি কাব্যের শতবার্ষিকী - অনুরাধা গুপ্ত 22
The Spirituality of Rabindranath Tagore - Anirvan Mukherjee 23
আমার রবীন্দ্রনাথ - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 25
Appreciating the legend – a humble attempt - Nandini Basu 26
ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা প্রভু তোমার পানে - ভাস্বতী ঘোষ (সেনগুপ্ত) 27
রবীন্দ্রসাহিত্যের জাপানি অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু স্মৃতি - কল্যাণ দাশগুপ্ত 29
রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সন্ধানে - শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় 31
গানের রবীন্দ্রনাথ - ডঃ অনিতা চৌধুরী 35
রবীন্দ্রমানসের মানসীরা - সুদীপ্তা রায়চৌধুরী 37
অচেনা রবীন্দ্রনাথ - কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত 39
মনস্তত্ত্ববিদদের গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ঈশিতা সান্যাল 42
জাপানে রবীন্দ্রনাথ - কিওকো নিওয়া 44
গল্পের নাম রবীন্দ্রনাথ - নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 45
শান্তিনিকেতনে পবিত্র-পরিবার - ১২১ বৎসর আগেকার একটি দৃশ্য - মাসাইয়ুকি উসুদা 47
আমার জীবনে -- আপনি, রবি ঠাকুর - সুপর্ণা বসু 51
シャンティニケタンの追憶 Fond Memories of Shantiniketan 神戸朋子 Kambe Tomoko 54
একজন জাপানী আশ্রমবাসীর কথা - কাজুহিরো ওয়াতানাবে 55
সে যে সব হতে আপন আমাদের শান্তিনিকেতন - সেৎসু তোগাওয়া (মাকিনো) 58
তিরিশ বছর পর শান্তিনিকেতনে - মাসায়ুকি ওওনিশি 60
ছাতিম গাছের পাতা বুকে নিয়ে - সাওরি কুরোদা 61
আমার স্মৃতির খাতা - ইউকা ওকুদা 62
From 1984 to 1994 in Santiniketan - Koichi Yamashita 63
Santiniketan, My Hometown - Yukino (Himali) Amemiya 63
シャンティ二ケタンの想い出 Memories of Santiniketan 村尾 草苑子 Masako Murao 64
〜私のインド生活〜 My Life in India 山東 良子 Ryoko Santo 66

Story, Travelogue, Feature, Poetry

My Best XI for the World Cup 2010 - Shoubhik Pal 67
Rain Dance - Udita Ghosh 69
Activism, in 140 characters or less - Diya Kar 70
Rendezvous with Touch Rugby - Anagha Ramanujam 71
An ode to Salil Chowdhury - Sujata Chowdhury 73
Of Children and Siblings - Sougata Mallik 74
A Walk Down Memory Lane - Ahona Gupta 76
Food, Energy, Life - Sudheer Reddy 77
General Nutrition Concepts - Alaka Mohan Chutani 79
Edomura, an unique experience in Japan! - Adriana Elena Stoica 81
Flowers in Japan - Christine Banerjee 82
The Battle of Wits - Tapan Das 85
Explaining India's Growth Mechanics - Gautam Ray 86
HAYABUSA: The first Space Odyssey to an "Asteroid" - Dr. Pankajakshan Thadathil 89
Haiku - Purnima Ghosh 90
The Shortcomings of a Zero Interest Rate Policy - Sanjeev Gupta 90a
আমার প্রিয় জাপানী মহিলা-কবি মিসুজু কানেকো - ৎসুয়োশি নারা 91
ক্ষুদ্‌দা ও কোলকাতার পুজো - অনুপম গুপ্ত 93

আটলান্টিক শহরে বঙ্গ-সম্মেলন - শুভা কোকুবো চক্রবর্তী 95
আজ কাল পরশুর বারমাস্যা - মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত) 97
নিত্য ট্রেন যাত্রা - তুলি পাত্র 102
সূত্রধর মাহাতো ও একটি উন্নয়নের সূত্র - শংকর বসু 103
মশা - নমিতা চন্দ 104
উপলব্ধি - অজিত কুমার পাল 104
विश्व प्राकृतिक धरोहर शिरेतोको — लोचनी अस्थाना 105
फूलों पर मोहित जापानी मन — प्रभा मित्तल 106
हरी–भरी वादी, झाड़ू नदी और तप्त कुंड की त्रिवेणी — अखिल मित्तल 107
अमरात्मा — शुक्ला चौधुरी 108
“साकुरा–साकुरा“ — सुरेश ऋतुपर्ण 110
मैं दूर देश क्यूँ जाता हूँ? — अनुराग पांडेय 111
कुछ रंग इधर उधर के — मोहन चुटानी 112
कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो — सुनीता पंघाल 112
融和にむけて Building Harmony 吉田美紀 Yoshida Miki 113
里山保育へ向けて Country-style Day Nursery 山田さくら Yamada Sakura 116

Young budding stars Section:

My Room - Sneha Kundu, Grade II 120
My trip to Universal Studios Japan - Shubhankar, Grade III 121
Mystery of the Golden Statue - Nishant Chanda, Grade IV 122
Invading Robots - Arsh Bhole, Grade IV 124
A trip to Phuket - Aishwarya Kumar, Grade V 125
Amazing Facts Compiled by - Aneek Nag, Grade VI 126
The Parcel - Amartya Mukherjee, Grade VI 127
Marathon – A True Story - Tannistha Roychoudhury, Grade VII 128
The Sign of a Victory: A glimpse of Indian Football - Arindrajit Basu, Grade XII 133
Butterfly Ankita Basu, Grade VI 134
Meal-at-Home - Shalini Mallik, Grade XII 135

Drawings 137
Photographs 141
Arts 142

Statement of Accounts 147
Special Thanks 147

Surrender your pride to truth,
fling away your promise if it is found
to be wrong.
March 24 - 1931. Rabindranath Tagore

তোমারে করিবে যারা বিচ্ছিন্ন মুক্তির শৃঙ্খলে
তারা আছে কই!
সত্যের বন্ধন পরো, সেই বন্ধন প্রেম মন্ত্রমাঝে
তারা অশরীর।
জীবন-বীণার তার অখিল শক্তি দিয়ে বাঁধো,
দিনে রাত্রে সুখে দুঃখে আলোয় আঁধারে তুমি সাধো
মৃত্যুহীন প্রাণের মঞ্জীর ॥
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা

- স্বামী মেধসানন্দ

রবীন্দ্রনাথ এক অতলান্ত গভীরতা

রবীন্দ্রনাথ আশি বছরের এক পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন করেছিলেন। সে জীবনের একদিকে যেমন অপার বিস্তার , অন্যদিকে অতলান্ত গভীরতা । সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার বর্ণালী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সে জীবন আবার বিচিত্র সৃষ্টিসম্ভারে পূর্ণ । ব্যক্তিজীবন, জাতির জীবনের খুব কম দিকই ছিল যা তাঁর প্রতিভার সোনার কাঠি ছুঁয়ে যায় নি। এমন সর্বতোমুখী, কালজয়ী প্রতিভা সর্বদেশে, সর্বকালে বিরল । এ হেন রবীন্দ্রনাথের অবদান তা সে যে ক্ষেত্রেই হোক তার ঠিক ঠিক মূল্যায়ন করা অতীব কঠিন। যে উৎস থেকে সেই প্রতিভার প্রবাহ উৎসারিত এবং যে বিভিন্ন ধারায় তা প্রবাহিত , সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকলে সে মূল্যায়ন সম্ভব নয় - ফলতঃ রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য আর একজনই কেবল রবীন্দ্রনাথের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন -- যেমন, বিবেকানন্দও নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আর একজন বিবেকানন্দই বুঝতে পারবে এ বিবেকানন্দ কি করে গেল !" এ হেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনার ব্যাপারে নিজের যোগ্যতার সীমাবদ্ধতার কথা সম্পূর্ণ মনে রেখে "অঞ্জলির" সম্পাদকের অনুরোধে তাঁর জীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আধ্যাত্মিকতা নিয়ে দু-চার কথা লেখা যেতে পারে।

আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি

যদি প্রশ্ন করা যায়, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি কি ছিল, তার নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর সনাতন ধর্ম, যা হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত, তার সুপ্রাচীন শাস্ত্র উপনিষদ। তাঁর নিজের কথায়, "আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে ।" কোন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তা ঘটেছিল এখন তা আলোচনা করা যাক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে হিন্দুসমাজের একটি অংশ রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবে আদর্শে, চিন্তায়, কর্মে ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ বলে একটা আলাদা সমাজ হিসেবে পরিচিত ও পরিগণিত হতে থাকলো । কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দীর্ঘকালীন হিন্দুসংস্কার, চারিপাশে হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব, হিন্দুদের সঙ্গে দৈনন্দিন আদান-প্রদান -এ সমস্তর ফলস্বরূপ ব্রাহ্ম সমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে সংশয় ও আপাতবিরোধিতার অভাব ছিল না । এতদসত্ত্বেও এটি ঘটনা যে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরিণাম -- যার অনেক কিছুই ইতিবাচক দিক ছিল।

ব্রাহ্মসমাজ

একদিকে সনাতনপন্থী, অন্যদিকে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার নিগড়ে বদ্ধ , শ্লথ ভারতীয় সমাজের মধ্যে যখন আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত এসে পড়লো, তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার একটি ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ। দ্বিতীয়টি, প্রাচীন যা কিছু তা যে উত্তম তাই প্রতিপাদন, এবং তৃতীয়টি হোল মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদ, যা প্রধানত পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, তার আলোকে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে যা ইতিবাচক তাকে গ্রহণ করে , প্রয়োজন মত পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যা ভালো তাকেও আত্তীকরণ করার প্রচেষ্টা । ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন এই তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার ফলে সম্ভূত। কালক্রমে যখন ব্রাহ্ম সমাজ বিভক্ত হল তখন মূল সমাজটি "আদি ব্রাহ্মসমাজ" বলে পরিচিত হল। আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুশাস্ত্র উপনিষদকে নিজেদের ধর্মীয় আদর্শের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। উপনিষদুক্ত নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানধারণা ব্রাহ্মদের ধর্মীয় , সামাজিক ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে প্রধান গুরুত্ব পেল । অন্যদিকে তারা হিন্দুদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রতিমাপূজা, অবতারবাদ, গুরুবাদ বর্জন করলো যদিও এ তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তিসিদ্ধ ও অনুভবসিদ্ধ। হিন্দুসমাজও বলাবাহুল্য ব্রাহ্মদের ভিন্ন আদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠান ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। ফলে সেই সময় হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে পারস্পরিক নিন্দা-সমালোচনার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল।

উত্তরাধিকার

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রধান অনুসারী এবং পরবর্তীকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে ব্রাহ্ম ছিলেন এবং ব্রাহ্ম পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। সেই সূত্রে তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই তাঁর প্রথম জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। ইতিবাচক প্রভাবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল উপনিষদ ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা -- যা সরাসরি তিনি তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন । দেবেন্দ্রনাথের অনেক সন্তানের মধ্যে একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের উপর সম্ভবতঃ সেই প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী গভীর ও ক্রিয়াশীল ছিল।

Self schooled

প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক Matthew Arnold, Shakespeare সম্বন্ধে লিখিত একটি সনেটে মন্তব্য করেছিলেন যে Shakespeare হলেন self schooled। রবীন্দ্রনাথও আক্ষরিক অর্থে তাই ছিলেন। প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা খুব কম গ্রহণ করলেও তাঁর রচনাবলী পাঠে বোঝা যায় কি বিপুল ছিল তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার। পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব জ্ঞানচর্চা। পুস্তক, প্রকৃতি, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ছিল তাঁর জ্ঞানচর্চার অন্যতম অঙ্গ। সেই জ্ঞান তাঁর মননশীল, সৃষ্টিশীল প্রতিভার জারক রসে রসায়িত হয়েছে, সৃষ্টি করেছে তাঁর অসাধারণ রচনাবলী। সেই রচনাবলীকে

যা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তা হল তাঁর জীবনদর্শন। সেই জীবনদর্শন যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তা হল ঔপনিষদিক আধ্যাত্মিকতা। তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত সকলেই জানেন সেগুলির মধ্যে জীবনদেবতার কথা বারবার ফিরে এসেছে। সেই জীবনদেবতা এবং উপনিষদের ব্রহ্ম তথা পরমাত্মা বা পরমেশ্বর অভিন্ন। সেই ব্রহ্মের "Anthropomorphic" রূপ নিরাকার, কিন্তু সগুণ ব্যক্তি ঈশ্বর (personal God) - অদ্বৈত বেদান্তীর নিরাকার, নির্গুণ, শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম নন। কারণ নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম নিয়ে সাধনা করা চলে, কিন্তু কবিতা লেখা চলে না। শুধু কবিতা নয় যে কোন শিল্পসৃষ্টিতে দ্বৈতভাবনা, অর্থাৎ শিল্প, শিল্পের বিষয়বস্তু ও শিল্পী এ পার্থক্য থাকতেই হয়।

যে কোন মৌলিক সৃষ্টিশীল ও চিন্তাশীল মানুষের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো থেমে থাকেন নি। কি চিন্তায়, কি কর্মে, কি রচনায় তিনি নিজেকে কোন একটা অচলায়তনে বদ্ধ রাখেন নি। ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা "চরৈবেতি"র পক্ষে ছিলেন তিনি। তাঁর জীবন ও রচনা অনুধাবন করলে এ কথার যথার্থতা বোঝা যাবে।

অধ্যাত্ম চেতনার ক্রমবিবর্তন – প্রতিমা পূজার বিপক্ষে ও সপক্ষে

বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বলে আমরা এখানে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমবিবর্তনের কথা আলোচনা করবো।

পিতা দেবেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে সেই সমাজের প্রচারিত ও অনুসৃত আদর্শের স্বপক্ষে একসময় যে সব বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন পরবর্তী যুগে তার অনেক কিছু থেকে তিনি সরে এসেছিলেন। একটি বিশেষ সম্প্রদায় চেতনা থেকে বিশ্বচেতনায় উত্তরণের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর দুই কালের বক্তব্যর তুলনামূলক আলোচনায়।

একসময়ে হিন্দুধর্মের প্রতিমা পূজার তীব্র সমালোচনা করে তিনি লিখেছিলেন, "মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা , যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে, বিশেষ জাতিকে, বিশেষ বিধিনিষেধ সকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে --- মূর্তিপূজা সেই সময়েরই যখন --- ধর্ম আপন ঈশ্বরকে সঙ্কুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সঙ্কুচিত করিয়াছে -- ।"

কিন্তু একই বিষয়ে পরে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দুর্গাপূজার তাৎপর্য ও মহিমা সম্বন্ধে লিখলেন, "যেটাকে আমরা দূর থেকে শুষ্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি সেইটি কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল আকার ত্যাগ করে; তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক -অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। -- হৃদয়ের ভিতর দিয়ে কল্পনার ভিতর দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায় -- তাদের সীমা পাওয়া যায় না। -- এই কারণে বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে, ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি যদি মাটির পুতুল বলে দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়। --- "

আদি ব্রাহ্মসমাজের ধ্যানধারণা থেকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী যুগে এতটাই সরে এসেছিলেন যে "সমাজের" তদানীন্তন কর্ণধাররা "সমাজের" সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবার কথা বিবেচনা করছিলেন। এভাবে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডী থেকে নিজেকে মুক্ত করে কেবলমাত্র বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বকে তিনি তাঁর হৃদয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন বলে তাঁর বিশ্বভারতীর কল্পনা ও রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল। তাঁর বিশ্বভারতীর স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন ধর্মের নিষ্ঠাবান অনুসরণকারী ছিলেন তেমনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের, এমনকি বিদেশেরও কিছু কিছু মানুষ ছিলেন। এইভাবেই বিশ্বভারতীর আদর্শ "যত্র বিশ্ব ভবতি একনীড়ম্" বাস্তবায়িত হয়েছিল।

বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক পরমপুরুষ তথা ব্রহ্মের কথা শুনে এসেছেন, সামাজিক ও পারিবারিক ব্রহ্ম উপাসনায় যোগ দিয়েছেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি উপনিষদের সুললিত মন্ত্র আবৃত্তি ও তার আলোচনা শোনার সুযোগ পেয়েছেন এবং ব্রহ্মসঙ্গীতও গেয়েছেন।

ইতিমধ্যে উপনয়নের সময় পাওয়া গায়ত্রী মন্ত্রের আবৃত্তি ও তার অর্থধ্যান তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাকে পরিপুষ্ট করে -- একথা নিজেই উল্লেখ করেছেন।

প্রভাতী উপাসনা

পরবর্তীকালে তিনি উপনিষদ গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছেন -- মনন করেছেন। এর অনিবার্য্য ফলস্বরূপ তাঁর সত্ত্বার গভীরে ব্রহ্মভাবনা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। সেই ব্রহ্ম তথা ঈশ্বরভাবনা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল আরও দুটি কারণে। প্রথমতঃ ব্রাহ্ম সমাজের প্রথামত কেবলমাত্র যৌথ উপাসনায় তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, -- আবার পিতা দেবেন্দ্রনাথের মত সংসার থেকে নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ঈশ্বর আরাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন নি। কিন্তু প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্রাহ্ম মুহূর্তে যখন সমস্ত প্রকৃতি শান্ত, স্তব্ধ, যখন সংসারের কলকোলাহল শুরু হয় নি সেই সময় তিনি উপাসনার আসন বিছাতেন। পারিপার্শ্বিকতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে, ভূমার সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা অনুভব করার সেইটাই ছিল তাঁর বিশেষ ক্ষণ, তাঁর একান্ত নিজস্ব সময়। যামিনীর শেষ যামে উঠে সেই যে তিনি বিশ্ববীণার সঙ্গে নিজের জীবনবীণা বেঁধে নিতেন সেই বীণার সুরই ছিল তাঁর সারাদিনের ব্যস্ত জীবনচর্য্যার, তাঁর প্রতি মুহূর্তের চিন্তা, কর্ম, রচনার "টাইটেল মিউজিক" -- যদিও কখনও তা শ্রুত, কখনও অশ্রুত।

দুঃখের বরষা

আরও একটি কারণ যা তাঁর ঈশ্বর চেতনাকে গভীরতর করেছিল তা হল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে পাওয়া বহু দুঃখ-বেদনা। বাদ্যযন্ত্রের তার যত সুক্ষ্ম হয় সামান্য শব্দও তাতে অনুরণিত হয়। কবির হৃদয়, শিল্পীর হৃদয় -- যা অতীব কোমল, সুক্ষ্ম তার সংবেদনশীলতাও অনেক বেশী। প্রিয়জন বিয়োগ থেকে শুরু করে, তাঁর সাহিত্যরচনার মূঢ় সমলোচনা ইত্যাদি নানাবিধ বেদনা তাঁকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করতো সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে দেখলে সব কিছু হারানোর মুহূর্তেই মানুষ সব কিছু পায়। দুঃখই তো মানুষকে গভীর করে, তাকে পরমপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে দেয়।

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল,
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।

জীবনদেবতা

"সত্যম্ , জ্ঞানম্ , অনন্তম্" ব্রহ্মকে একেবারে আপন করে নেওয়া, তাকে হৃদয়ের দেবতারূপে দেখা, ব্রহ্মের প্রতি সেই নিবিড় প্রেম পোষণ করার প্রক্রিয়া আরও বিশেষভাবে শুরু হল সম্ভবত তখন থেকে যখন তিনি আধ্যাত্মিক রসে ভরপুর নৈবেদ্য, গীতালি, গীতাঞ্জলির এক একটি কবিতা, পূজা পর্যায়ের এক একটি গান রচনা করতে থাকলেন । কবিতা ও সঙ্গীত এমন একটি মাধ্যম যেখানে শব্দের স্বল্প পরিসরে ভাবের ব্যাপ্তি ও গভীরতা, হৃদয়ের চরম আর্তি ও আত্মনিবেদন সম্ভব । বিশেষতঃ পূজা পর্যায়ের সঙ্গীতরচনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরের প্রতি প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো । এই ঈশ্বরই তাঁর কাছে "জীবন দেবতা" রূপে ধরা দিলেন -- যে জীবনদেবতা তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত -- তাঁর জীবনতরণীর কর্ণধার ।

"ত্রিবেণী সঙ্গম"

শান্তিনিকেতনের উপাসনা সভায় যে আধ্যাত্মিক ভাবকে তিনি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন কখনও উপনিষদ, কখনও গীতা, কখনও বা বুদ্ধদেব বা যীশুখ্রীষ্টের বাণী উদ্ধৃত করে তাকে অনেক সংহত, অনেক গভীর, অনেক মনোহর রূপে পাই তাঁর কোন কোন কবিতায় । তাকেই আরও নিবিড়, নিটোল রূপে, আরও হৃদয়গ্রাহী রূপে পাই যখন সেই ভাব গীতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে । ভাব-বাণী-সুরের এই ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন করে মনে হয় একটা কিছু পরম পাওয়া হল । যথার্থ ভাবগ্রাহীরা সেইসব গানগুলিকে শুধু একটা সাময়িক ভাল লাগা, বা তাকে সাময়িক সান্ত্বনা পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে দেখেন না । বরং তার মধ্যে একটা অনন্ত সত্তা, অতলস্পর্শ শান্তি যাকে রবীন্দ্রনাথ শান্তির পারাবার বলেছেন , তার সন্ধান পেয়ে কৃতার্থ বোধ করেন ।

রবীন্দ্রচেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য -তাঁর গভীর ঈশ্বর প্রেম সম্বন্ধে অনবহিত থাকলে রবীন্দ্ররচনার মূলধারা সম্বন্ধে ধারণা করা দুরূহ হয়ে পড়ে । তাঁর রচনাবলীতে সাময়িক আনন্দের আয়োজনের অভাব না থাকলেও তাঁর যে বৈশিষ্ট্যের জন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ, যা পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যবোদ্ধাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল তা তাঁর সাহিত্যে চিরন্তন সত্যের , নিরন্তর আনন্দের -- যার আরেক নাম ঈশ্বর -- তাঁর নিবিড় উপস্থিতি ।

রবীন্দ্রনাথ ধার্মিক, না আধ্যাত্মিক ?

রবীন্দ্রনাথ লৌকিক অর্থে ধার্মিক পুরুষ - যিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন , মন্দিরে যান, বিভিন্ন পূজা-অর্চায় অংশগ্রহণ করেন, দেবতাকে ভোগ নিবেদন করেন, নিজের আর পরিবারের জন্য প্রার্থনা করেন -- ছিলেন না । কিন্তু তিনি ছিলেন এক উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক পুরুষ । ধর্মের বহিরঙ্গ হল আচার-অনুষ্ঠান আর অন্তরঙ্গ দিক হল আধ্যাত্মিকতা । আধ্যাত্মিকতা এমন একটা বোধ যার দ্বারা ঈশ্বর, বিশ্বপ্রকৃতি, সকল মানুষ এবং নিজের মধ্যে এক অখণ্ড সত্ত্বাকে উপলব্ধি করা যায় । সবার মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সবাইকে আবিষ্কার করা আধ্যাত্মিকতার মূল কথা । এর দ্বারাই আমাদের গতানুগতিক জীবন থেকে এই মহৎ জীবনে উত্তরণ ঘটে । "শান্তিনিকেতন" এবং "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থ দুটিতে -- যা রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার দলিলস্বরূপ - তাদের পাতায় পাতায় আধ্যাত্মিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে । এখানে তিনি পরমেশ্বরের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, মানুষের স্বরূপ, চেতনার কোন ভূমিতে তাদের মিলন ঘটে, সেই মিলনের স্বরূপ ও ফল, দৈনন্দিন কোন সাধনার দ্বারা সেই স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, তার প্রতিবন্ধকই বা কি প্রধানতঃ উপনিষদ থেকে বহু উদ্ধৃতি সহযোগে তা আলোচনা করেছেন । বাংলা সাহিত্যে তো বটেই, ভারতের অন্য ভাষার সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ একজন অনন্য পুরুষ যাঁর প্রধান পরিচয় সাহিত্যিক হলেও ধর্মীয় আচার্য্যের ভূমিকাতেও যাঁকে আমরা দেখি, এবং তাঁর ক্ষেত্রে সেই ভূমিকাগ্রহণ এতই স্বাভাবিক ছিল যে এ নিয়ে প্রশ্নও ওঠে না -- বিশেষতঃ যখন আমরা জানি তাঁর জীবনের ভিত্তিভূমি ছিল আধ্যাত্মিকতা ।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্

তাঁর উপাসনা সভায় উপনিষদ থেকে সেই সমস্ত শ্লোক যা তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল -- যার উদ্ধৃতি তিনি বারবার দিয়েছেন তাদের কয়েকটি মাত্র বাংলা অনুবাদ সহ নীচে উল্লেখ করা হল :

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যজেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ ধনম্ ।"

জগতে যা কিছু আছে তার সমস্তকে ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করে দেখবে, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে । আর কারও ধনে লোভ করবে না ।

"ওঁ পিতা নোহসি ।"

তুমি পিতা, আছ । আমি স্বীকার করছি তুমি পিতা ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমম্ ,
সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্
সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ।"

যে পরমব্যোম সেইখানে আত্মার মধ্যে যিনি সত্যজ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ পরমব্রহ্মকে গভীরভাবে অবস্থিত জানেন তাঁর সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হয় ।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কশ্চন ।"

ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কদাচই ভয় পান না ।

"আমি খুঁজে বেড়াই তারে"

উপনিষদ তাঁর অধ্যাত্মচেতনার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকলেও উপনিষদভিন্ন হিন্দুদের অন্যান্য শাস্ত্র বিশেষ করে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে । বৈষ্ণবসাহিত্য ও বাউলদের জীবনদর্শন ও সঙ্গীতও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল । উপনিষদুক্ত পরমসত্যের লোকায়ত প্রকাশ তিনি বাউলদের

জীবনচর্য্যায় ও গানে দেখতে পেয়েছিলেন । তাঁর বিশেষ প্রিয় বাউল গানের একটি পংক্তি ছিল "মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ" অথবা "আমি খুঁজে বেড়াই তারে / আমার মনের মানুষ যে রে --- "

আধ্যাত্মিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন আলোচনা পাঠ করে এরূপ সিদ্ধান্ত করলে সম্ভবতঃ ভুল হবে না, ব্রহ্ম উপলব্ধির বিভিন্ন পথ যথা জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান ও ভক্তির মধ্যে ভক্তি তথা প্রেমের পথ বা আরও সঠিকভাবে বলতে হলে জ্ঞানমিশ্রা প্রেমের পথই ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পথ ।

প্রেম ও জ্ঞান

তাঁর বেশ কিছু গান ও কবিতার প্রধান উপজীব্য ঈশ্বরপ্রেম । সেই প্রেমকে আশ্রয় করে আরও বহুবিধ ভাব এসেছে যথা, আত্মনিবেদন, শরণাগতি, প্রার্থনা, সীমার মধ্যে অসীম ও রূপের মধ্যে অরূপকে দেখা, সুখে-দুঃখে ও সম্পদে-বিপদে ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, ঈশ্বরকে না পাওয়ার বা পেয়েও হারানোর বেদনা, ঈশ্বরানুভূতির নিবিড় আনন্দ, ভগবৎ সাধনার দুরূহতা, ভগবৎ করুণা, ঈশ্বরের সঙ্গে নানাবিধ সম্পর্ক । ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও প্রেমের পরিণতি এক হলেও পথ হিসেবে তাদের পার্থক্য তো আছেই । জ্ঞান মস্তিষ্ক-নির্ভর, কিন্তু প্রেম হৃদয়-নির্ভর । কবির মানসিকতা যেহেতু হৃদয়-নির্ভর -- কারণ কাব্যের উৎস মস্তিষ্ক নয়, হৃদয় -- সেইজন্য কবির ঈশ্বর আরাধনার মার্গও হৃদয়-নির্ভর, তথা প্রেম ।

যেমন আগে বলা হয়েছে ধর্ম আলোচক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জ্ঞানমিশ্রা প্রেমের ভাব প্রবল । কিন্তু কবিতা বা সঙ্গীত রচয়িতা হিসেবে তাঁর মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমের ভাবই প্রধান -- সেখানে জ্ঞানবিচারের এতটুকু কাঠিন্য নেই ।

"দেবতারে প্রিয় করি"

তাঁর ঈশ্বরপ্রেম ছিল এমন একটি বৃত্ত যার কেন্দ্র ছিল সর্বত্র কিন্তু পরিধি ছিল না কোথায়ও । সেখানে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতির ভেদরেখা লুপ্ত । সেই বোধের অপরূপ কাব্যিক প্রকাশ "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা ।" সাধনার প্রথম স্তরে দেবতা ও প্রিয়জনের অবস্থান ভিন্ন; দেবতা শ্রদ্ধেয় কিন্তু প্রিয় নন; আবার ভালবাসার মানুষ প্রিয় কিন্তু তাতে দিব্য উপস্থিতির অভাব । সাধনার দ্বিতীয় স্তরে দেবতাকে প্রিয় করার সাধনা এবং প্রিয়র মধ্যে দেবতার উপস্থিতির অন্বেষণ । সাধনার চরমস্তরে দেবতা ও প্রিয়র ভেদরেখা অবলুপ্ত ।

গান-কবিতার কুইজ

ভালোবাসার ভাষা এক তা সে মানবীয় প্রেম হোক বা ভগবৎ প্রেমই হোক । বিশেষতঃ মানবীর প্রেম ও ভগবৎ প্রেমের ভেদরেখা যখন সঙ্গীত বা কাব্যরচয়িতার মন থেকে মুছে যেতে থাকে তখন তাঁর রচিত কোন গান বা কোন কবিতা পূজা পর্য্যায়ের আর কোনটি প্রেম পর্য্যায়ের তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে । ঠিক এমনটিই ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে । ফলতঃ রবীন্দ্রনাথের কোন গান , যেখানে প্রেম বা পূজার অনুষঙ্গ বিশেষ কোন শব্দ অনুপস্থিত -- প্রেম পর্য্যায়ের কি পূজা পর্য্যায়ের তা নিয়ে রীতিমত 'কুইজ' হতে পারে ।

উদাহরণ দেওয়া যাক । "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা / এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা ।" স্বামী বিবেকানন্দ এই গানটি ভক্তিগীতি হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন । রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত "সঙ্গীত সংগ্রহ" বইটি যা ভক্তিগীতির সঙ্কলন, সেখানেও এটিকে ভক্তিগীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । এই প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত বর্তমান লেখকেরও স্বভাবত ধারণা ছিল এটি "পূজা" পর্য্যায়ের গান এবং "অঞ্জলি"র পাঠকেরও অনেকের ধারণা সম্ভবত তাই । কিন্তু গীতবিতানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ধরা পড়লো এটি "প্রেম" পর্য্যায়ের । আবার "তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ / ও মোর ভালবাসার ধন" এই গানটিকে লেখকের মনে হত "প্রেম পর্য্যায়ের", কিন্তু সেটি প্রকৃতপক্ষে "পূজা" পর্য্যায়েরও । এ ধরণের বিভাগ নিয়ে মনে প্রশ্ন উঠলেও আমাদের এখন তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই ।

অবশ্য ভক্ত বা প্রেমিকের কাছে এ ধরণের প্রশ্নের খুব একটা প্রাসঙ্গিকতা নেই বলে মনে হয়; যেহেতু ভাষার থেকে তাদের কাছে ভাবই প্রধান; আর দু রকম ভাবই যখন এক ভাষায় প্রকাশ করা যায় -- ক্লাসিক রচনার যা অন্যতম বৈশিষ্ট্য । তাই "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" গাইবার সময় যদি ভক্ত তার ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ বা বা শ্রীরামকৃষ্ণকে "জীবনের ধ্রুবতারা" রূপে কল্পনা করে নেয় বা প্রেমিক "তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ" গাইবার সময় প্রেমিকার প্রতি সেই ভাব আরোপ করে তাহলে পণ্ডিতদের আপত্তি হলেও ভক্ত বা প্রেমিকের তাতে কিছু এসে যায় না । এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও তাতে আপত্তি হত বলে মনে হয় না - যদিও তাঁর গানের কিছু কিছু ব্যাপারে যেমন গায়ন পদ্ধতি, গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি তেমন স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না ।

ঈশ্বরের রূপকল্প

আগে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি ঈশ্বর-এ (Personal God) বিশ্বাসী হলেও তাঁর ঈশ্বর নিরাকার । ঈশ্বরের প্রতিমা সম্বন্ধে তাঁর প্রথম যুগের বিরুদ্ধ মনোভাব পরবর্তী কালে অনেকটা নমনীয় হয়ে এলেও তিনি কখনও তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন কি না সন্দেহ ।

কিন্তু তাঁর পূজা পর্য্যায়ের গান যখন আমরা শুনি , যেমন "চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে" বা "ঐ আসন তলে মাটির পরে লুটিয়ে রব / তোমার চরণ ধূলায় ধূসর হব" কিম্বা "মহারাজ, এ কি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে" তখন যদি শুধু সুরে সন্তুষ্ট থাকি -- যেমন "ক্লাসিকাল" গানের ক্ষেত্রে, তাহলে তো কথা নেই । কিন্তু সুরের সঙ্গে যদি গানের অর্থও অনুধাবন করার চেষ্টা করি যা সঙ্গীত রচয়িতার অভিপ্রেত এবং ভজন গানের একটি আবশ্যিক শর্ত যেহেতু তা না হলে সে গানের পরিপূর্ণ রস উপলব্ধি করা যায় না, ফলে রচনার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, তখন মনের মধ্যে স্বতঃই এই সংশয় ওঠে ঈশ্বর যদি নিরাকারই হন তাহলে তাঁর "চরণ", "চরণধূলা", তাঁর "সাজ" কিভাবে সম্ভব ? ফলতঃ এইসব গান শোনার সময় আমাদের পূজ্য কোন দেব-দেবী বা মানুষের রূপ আমাদের মনে ভেসে ওঠে এবং তাতেই আমরা স্বচ্ছন্দ বোধ

করি। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের সাকার রূপে বিশ্বাস করেন না তাদের মনকে এ গানগুলি কি আপাতবিরোধিতার বোধে পীড়িত করে না বা তাঁদের মনে তখন কি "ইমেজ" ভেসে ওঠে ? কবিও যখন এ ধরণের কবিতা বা গান রচনা করেছিলেন তখন তাঁর চিত্তাকাশে কি রূপকল্প ফুটে উঠতো জানতে ইচ্ছা হয়।

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি ?"

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা, যেমন ত্যাগ-বৈরাগ্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। "ধূলামন্দির" (দেবতা মন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ ---) থেকে আরও অনেক কবিতায় যেমন "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়" বা তাঁর প্রবন্ধের কোন কোন অংশ পাঠ করলে এমন ধারণা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা যে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাসজীবন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব অনুকুল ছিল না। কিন্তু একথাও তো সত্য যে মহাপুরুষ তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ছিলেন তিনি হলেন বুদ্ধদেব। যীশুখ্রীষ্টকেও তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। অথচ এঁদের দুজনেরই জীবনের মূলভিত্তি ছিল ত্যাগ-বৈরাগ্য এবং তাই ছিল তাঁদের প্রচারিত আদর্শও। তাহলে এও কি একধরণের আপাতবিরোধিতা ? না, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সেই ধরণের সন্ন্যাসকে সমালোচনা করেছেন যার পরিণাম তাঁর ভাষায় "নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্য ও নির্মমতায়"। কিন্তু যে ত্যাগ "নিজেকে রিক্ত করার জন্য নয়, নিজেকে পূর্ণ করার জন্যই" , যেখানে "আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহঙ্কারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য" সে ত্যাগকে তিনি শ্রদ্ধার উচ্চাসন দিয়েছেন। তাই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত কর্মযোগকে তিনি সমূহ প্রশংসা করেছেন।

"চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর"

হৃদয়হীন শুষ্ক আধ্যাত্মিক জ্ঞানকেও রবীন্দ্রনাথ যেমন মেনে নিতে পারেন নি তেমনি হৃদয়বৃত্তির সাময়িক উদ্বেলতা তথা ভাবোচ্ছ্বাসকেও তিনি সমর্থন জানান নি। ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে, লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়ির যে পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল তা হল ভাব বা ব্যবহার হবে সংযত, মার্জিত, পরিশীলিত। রবীন্দ্রনাথ শুধু সে ধারা অনুসরণ করেন নি, তার ব্যক্তিপ্রকৃতি ও যুক্তিও তার পক্ষে ছিল। তিনি লিখেছেন –

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তি মদধারা
নাহি চাহি নাথ ।।
--- সম্বরিয়া ভাব অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর ।।"

অথচ এও ঠিক মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের এবং এ যুগের শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তির উচ্ছ্বাস তো সর্বজনবিদিত। বাঁধভাঙ্গা ভক্তি তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশা থেকেই বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর একটি সুবিখ্যাত স্কেচের বিষয়বস্তু "ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দাম" নৃত্য আর তার ক্যাপশান "শান্তিপুর ডুবু ডুবু , নদে ভেসে যায়"। শ্রীরামকৃষ্ণের এমন বক্তব্য পাই যেখানে তিনি বলছেন, "যেখানে উর্জিতা ভক্তি -- ভক্ত ভাবে হাসে নাচে গায় সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং বর্তমান।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভক্তির আতিশয্য নিয়ে সমালোচনা অন্ততঃ সেই ক্ষেত্রে যথার্থ মনে হয় যেখানে সেই আতিশয্যের কারণ প্রকৃত ভক্তি বা ভাব নয় -- তা নিছক ভাবাপ্লুতা, আবেগ সর্বস্বতা যা যথার্থ আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী -- যার কঠোর সমালোচনা বিবেকানন্দও করেছেন।

"তোমার গর্ব ছাড়িব না"

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মচিন্তার আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে অন্য প্রসঙ্গে যাবো। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি দুটি ক্ষেত্রেই বাসনাকে সংযত করা - মনের যে অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি বৃত্তি আছে তাকে সংযত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সংযত করার উপায় প্রধানতঃ তিনটি। বাসনা বা বৃত্তিগুলিকে দমন (suppression) বা পূরণ (fulfillment) বা তাদের উর্দ্ধায়ন (sublimation)। বৃত্তিগুলিকে বিচারসহ যদি দমন করা যায় তাতে সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের অবদমিত করলে বা জোর করে চাপা দিয়ে রাখলে পরে বিভিন্ন দৈহিক -মানসিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। বাসনার যথেচ্ছ পূরণ বা বৃত্তিগুলিকে ছেড়ে দিলে পরিবার বা সমাজজীবন ভেঙে পড়ে। কিন্তু বাসনা বা বৃত্তির উর্দ্ধায়ন বাসনা বা বৃত্তির কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বাপেক্ষা ইতিবাচক পথ। বাসনা বা বৃত্তিগুলিকে ভগবন্মুখী করা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় সেগুলিকে ভগবানের দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। অহঙ্কার যদি করতেই হয় ভগবানকে নিয়ে অহঙ্কার করা। রবীন্দ্রনাথ কি চমৎকার করে এ ভাবটিকে প্রকাশ করেছেন যখন তিনি লিখেছেন --- "সকল গর্ব দূর করি দিব, তোমার গর্ব ছাড়িব না"।

হে অনন্তপুণ্য

ধর্মীয় মহাপুরুষদের (আমরা যাঁদের অবতার বলি) মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীষ্টকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন আগেই বলা হয়েছে। যদিও বুদ্ধদেব ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না, অথচ রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী, তবু বুদ্ধের মানবজীবনের মূল সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে "প্রাক্‌টিক্যাল" আলোচনা, তাঁর যুক্তিনিষ্ঠা, সর্বোপরি তাঁর মহাপ্রাণতা, সর্বজীবে দয়া এবং শান্ত, পুণ্য ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল।

কয়েক বৎসর আগে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ উপলক্ষ্যে ওখানকার একজন আশ্রমিক যিনি দীর্ঘকাল ওখানকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং পরে ওখানকার "নিপ্পন ভবন"এর অধ্যক্ষ হয়েছিলেন এবং জাপান ভ্রমণে এসেছিলেন সেই মাননীয় সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (সৌমেনদা নামে অধিক পরিচিত) সঙ্গে তাঁর বাড়িতে বর্তমান লেখকের সাক্ষাত হয়। সৌমেনদা ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। সৌমেনদা-র বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের একটি ফটো দেখতে পাই -- যা আগে দেখিনি। সেই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের মুখে এমন একটি আর্ত্তি প্রকাশ পাচ্ছিল

যা একেবারে বিরলদৃষ্ট । কৌতূহলী হয়ে সৌমেনদাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে ছবিটি তোলা হয়েছিল যখন তিনি বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধমন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলেন । ভক্তেরা যে গভীর আকুতি নিয়ে, আত্মনিবেদনের ভাব নিয়ে মন্দিরে ইষ্টদেবতাকে দর্শন করে বাইরের মানুষ, পরিবেশ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঠিক সেই ভাবটি দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম । সাধারণতঃ যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বহু ফটোতেই দেখি তার থেকে এ এক ভিন্ন রবীন্দ্রনাথ । সেই ছবিটি রামকৃষ্ণ মিশনে বাংলা মাসিক পত্রিকা উদ্বোধনে সম্প্রতি ছাপা হয়েছে যা এখানে পুনর্মুদ্রিত করা হল ।

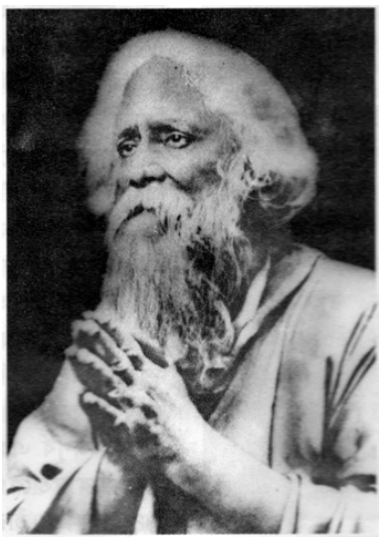

রবীন্দ্রনাথের রচনায় শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন উল্লেখ আছে কি না বর্তমান লেখকের তা অনুসন্ধান করার সুযোগ হয়নি । কিন্তু এ যুগের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর আদর্শের প্রধান ধারক ও প্রচারক বিবেকানন্দ -- যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ছিলেন এবং যাঁদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে কমবেশী জানতেন -- তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর কি মনোভাব ছিল এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে । বিষয়টি কিছুটা বিতর্কমূলক যা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বা পুস্তকের বিষয়বস্তু হতে পারে ।

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা ধেয়ানে তোমার"

কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য ও ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । রবীন্দ্রনাথ সুনিশ্চিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন -- তবে দক্ষিনেশ্বরে নয়, কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের কোন একটি উপাসনা সভায় -- একথা শ্রীম লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে উল্লেখিত আছে । শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব যে ক্রমশঃই প্রসারিত হচ্ছিল, তাঁকে আরাধ্য দেবতা রূপে অনেকে গ্রহণ করছিলেন রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন । তার স্বীকৃতি তাঁর লিখিত মালঞ্চ উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যাবে যেখানে অসুস্থ নায়িকা নীরজা দেওয়ালে প্রলম্বিত শ্রীরামকৃষ্ণর ছবিকে উদ্দেশ্য করে বলছে ---

"বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে । আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পূজা-অর্চনা সব গেল আমার ।"

১৯৩৬ সালে শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর আরও বেশ কয়েকটি দেশে মহাধুমধামের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয় । এ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ছন্দে গ্রথিত যে অমূল্য বাণী দেন তা হল :

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা ।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ দিল এ জগতে;
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি ।

কিন্তু শুধু বাণী দেওয়া নয়, আরও প্রত্যক্ষভাবে তিনি ঐ জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন । সে কাহিনীর যেমন ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তেমনি তা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক এবং নাটকীয় মুহূর্তে পূর্ণ । কাহিনীটি আমরা জানতে পারি রামকৃষ্ণ মিশনের অধুনাপ্রয়াত সন্ন্যাসী পূজনীয় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী -- যিনি দক্ষ সংগঠক হিসেবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সুপরিচিত ছিলেন এবং যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ এই ত্রয়ীর যথাক্রমে ১৯৩৬, ১৯৫৪ এবং ১৯৬৩ সালে জন্মশতবর্ষ পালন উৎসবের সম্পাদক তথা মুখ্য সংগঠকের গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন -- তাঁরই দেওয়া বিবরণ থেকে । মূল বিবরণটি ছিল ইংরাজীতে । আমরা তার নির্বাচিত অংশ এখানে বাংলা অনুবাদে তুলে ধরছি । তাঁর স্বমুখে এবার সে কাহিনীটি শোনা যাক্ ।

ধর্ম সম্মেলনে যোগদান – শর্ত, আরও কিছু শর্ত

এক বৎসর ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন । তা চলে ১৯৩৭ সালের ১লা মার্চ থেকে ৮ই মার্চ পর্যন্ত । দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তাতে অংশগ্রহণ করেন । এই ধর্মসম্মেলনে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথের অংশগ্রহণ কিন্তু সহজে সম্ভব হয় নি ।

সবশুদ্ধ ধর্মসম্মেলনের যে ১৪টি অধিবেশন হয়, তার অন্ততঃ একটিতে সভাপতিত্ব করবার অনুরোধ নিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলাম । সব শুনে তিনি বললেন, "স্বামীজী, আমার অভিজ্ঞতা হল আমি কোন সভায় যখনই বক্তৃতা দিতে গিয়েছি, তা সে যেখানেই হোক, শুধু বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোল দেখেছি । এমনকি পরস্পরে মারামারি ও রক্তপাতের ঘটনাও বিরল নয় । আপনি কি চান আপনাদের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমি আর একবার এ ধরণের ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়ি ?"

আমি বললাম, "আমি আপনাকে কথা দিতে পারি যে আমাদের অনুষ্ঠানে ঐরকম কিছু হবে না ।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের সভা কোথায় হবে ?"

উত্তর দিলাম, "কলকাতার টাউন হলে ।"(চিৎপুর রোড)

তিনি বললেন, "আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে না, কারণ সেখানে অনেকটা সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হবে । আমি এখন

তা পেরে উঠব না।" (রবীন্দ্রনাথের তখন বয়স ৭৬, মাঝে মাঝে অসুস্থও হয়ে পড়ছিলেন।)

আমি বললাম, "কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হল-এ (কলেজ স্কোয়ারের পূর্বদিকে) যদি হয় ? তাহলে আপনাকে আর কষ্ট করে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হবে না। আপনি তাহলে রাজী হবেন তো ?"

রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত তাতে রাজী হলেন। স্থির হল তিনি ধর্মসম্মেলনের ৩রা মার্চের অপরাহ্নের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন।

এই সাক্ষাতের কিছুকাল পরে যখন সভার প্রস্তুতি চলছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতিত্ব করার আরও কিছু বাড়তি শর্ত দিলেন। তিনি জানালেন, যেহেতু তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না তিনি তাঁর বক্তব্য বলার পরই সভা ছেড়ে চলে আসবেন। তাঁর জিজ্ঞাস্য ছিল, তিনি চলে আসার পর কে তখন সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন ?

ফলে তখন আর একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব, যিনি রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন, খোঁজ করার প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ সে ব্যক্তি উপযুক্ত না হলে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হতে রাজী হবেন না।

এরপর রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে বড়জোর ১৫০০ থেকে ১৬০০ শ্রোতা বসতে পারে। কিন্তু এমন সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে যে কয়েক হাজার লোক হলে ঢুকতে চাইবে। তখন কি করবেন ? শেষপর্যন্ত ঢুকতে না পেরে তারা হট্টগোল শুরু করবে এবং নানারকম গণ্ডগোল পাকাবে। ফলে আপনাদের সভা শেষ পর্যন্ত পণ্ড হয়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথকে আমি তখন এই বলে আশ্বস্ত করলাম, "দেখবেন, এরকম অবাঞ্ছিত কিছু হবে না। কারণ আমরা হলের বাইরে কলেজ স্কোয়ার পার্কে যে পাম গাছগুলি আছে তাতে অনেক লাউডস্পীকার লাগিয়ে দিয়েছি। যদি ঐ পার্কে পঁচিশ হাজার লোকও জড়ো হয় তাহলেও তারা ধর্মসম্মেলনের সমস্ত বক্তৃতাই ভালভাবে শুনতে পাবে।"

এ কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, "স্বামীজী, আপনারা দেখছি খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। এখন আমি নিশ্চিন্ত হলুম সব কিছু নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে।"

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের বদ্‌লী সভাপতি হিসাবে আমি যাঁকে স্থির করলাম তিনি হলেন "Modern Review" (এবং "প্রবাসী" পত্রিকারও) পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আমি রামানন্দ বাবুকে সমস্ত পরিস্থিতি জানিয়ে অনুরোধ করলাম যে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে তাঁকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি তা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, "রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে আমি তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করব ! এর থেকে বড় সম্মান আর কি হতে পারে ! আমি এ প্রস্তাবে খুবই খুশী।" এ সংবাদ জেনে রবীন্দ্রনাথও বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

৩রা মার্চ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভা আরম্ভ হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথকে মঞ্চে নিয়ে আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ আমার নজরে এল হলে দুজন দর্শকের মধ্যে মারপিট শুরু হয়ে গেছে -- এমনকি একজন চেয়ার তুলছে আর একজনকে মারবে বলে। আমি ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনমতে তাদের আলাদা করে দিলাম। তারপর তাদের একজনকে আর একজনের থেকে অনেক দূরে বসিয়ে দিলাম।

একটি অসাধারণ ভাষণ

রবীন্দ্রনাথ যখন হলে ঢুকলেন তখন হল সম্পূর্ণ শান্ত ও নিস্তব্ধ। অন্যান্য বক্তারা এবং আমরা সংগঠকরা মঞ্চের উপর চেয়ারে বসলাম। কেবল রবীন্দ্রনাথের জন্য একটি আরামদায়ক চেয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। বক্তাদের মধ্যে সকলেই ছিলেন বিখ্যাত যেমন সরোজিনী নাইডু, স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড (সে সময়ের একজন প্রখ্যাত বৃটিশ রাজপুরুষ এবং মনস্বী ও যশস্বী লেখক)। আমি মাঝে মাঝেই রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছিলাম তিনি কোন অসুবিধা বোধ করছেন কি না।

বলাবাহুল্য প্রধানতঃ যাঁর আকর্ষণে অধিকাংশ দর্শক এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ -- যাঁর সম্বন্ধে প্রত্যেক ভারতবাসী গর্বিত। রবীন্দ্রনাথ চেয়ারে বসে তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন। অপূর্ব সেই ভাষণটি পাঠ করতে আধ ঘন্টার মত সময় লাগল। সূঁচ পড়লেও শোনা যাবে এমন নিস্তব্ধ পরিবেশে দেড় হাজার শ্রোতা নিবিষ্ট চিত্তে সেই বক্তৃতা শুনলেন।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বক্তৃতার শেষে চলে যাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ চেয়ারেই বসে থাকলেন। এদিকে সভাও চলতে লাগল। আমার কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব অস্বস্তি হতে থাকল এই ভেবে যে রবীন্দ্রনাথ যদি সভার শেষপর্যন্ত থেকে যান তাহলে তাঁর বদ্‌লী সভাপতি হিসেবে ঠিক করা রামানন্দবাবুকে কি জবাবদিহি করব। তাই আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকলাম যে রবীন্দ্রনাথ সভা শেষ হওয়ার অন্ততঃ কয়েক মিনিট আগেও যেন চলে যান। তাহলে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও রামানন্দবাবুকে সভাপতির আসনে বসানো যাবে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত ঘটনা তা ঘটলো না। যখনই আমি রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি তিনি ক্লান্ত বোধ করছেন কি না, তিনি

উত্তর দেন, "না, না স্বামীজী, আমি ভালই বোধ করছি -- আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আমার সব কিছু খুব ভাল লাগছে।"

তাঁর ভাষণের পর আরও তিন ঘন্টা সভা চললো। সারাক্ষণ রবীন্দ্রনাথ বসে থাকলেন এবং সব বক্তৃতাই শুনলেন। স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে উঠে বললেন, "এই ধর্ম মহাসভা সাতদিনের বদলে যদি শুধু আজকের দিনের জন্যও হতো তাহলেও বলা যেত তা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এবং সে সফলতার কারণ রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ভাষণ।"

সভার শেষে রবীন্দ্রনাথ চলে যাওয়ার পর রামানন্দবাবুর সঙ্গে আমি কথা বললাম এবং তাঁকে ধর্মসম্মেলনের অন্য একদিনের অধিবেশনের সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি অনুগ্রহ করে রাজী হওয়ায় আমার এক বড় দুশ্চিন্তা দূর হল।

সভায় রবীন্দ্রনাথের যোগদানের পরের দিন অর্থাৎ ৪ঠা মার্চ রামানন্দবাবু এবং আমি দুজনেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম খোঁজ নেওয়ার জন্য যে আগের দিনের অতখানি ধকলের পর তাঁর শরীর কেমন আছে। রবীন্দ্রনাথ তখন বললেন, "আমি ভালই আছি। স্বামীজী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এত দর্শকের উপস্থিতি সত্ত্বেও এরকম শান্তিপূর্ণ সভার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে প্রথম। আমি বাস্তবিকই এই সভা বিশেষভাবে উপভোগ করেছি। রামকৃষ্ণ মিশনের সংগঠন ক্ষমতায় সত্যিই আমি অভিভূত। আপনারা সত্যিই একটা বড় কাজ করেছেন।"

আমি অবশ্য বিশ্বাস করি রামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সাফল্য আমাদের প্রচেষ্টায় হয় নি -- রামকৃষ্ণদেবের কৃপাতেই তা সম্ভব হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও আমরা

সাধারণতঃ কোন বিষয় আলোচনার একাধিক উদ্দেশ্যের মধ্যে দুটি মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে। এক হচ্ছে সেই বিষয়টি জানা, আর একটি আমাদের জীবনে সে বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা। প্রথম উদ্দেশ্যর কথা মনে রেখে কিছুটা আলোচনার পর এরপর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সংক্ষেপে কিছু বলা যাক। তার আগে একটু ভূমিকা।

আমরা বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসি -- কিছু না কিছু তাঁর চর্চাও করে থাকি। কিন্তু সে চর্চা বা ভালোবাসার গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ভালোবাসা বা চর্চার গভীরতা যথেষ্ট কম, কারণ তা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও নৃত্যতেই সীমিত , যার আবেদন প্রধানতঃ আমাদের ভাবাবেগের কাছে। আর যে কোন ভাবাবেগই , যার কোন দৃঢ় ভিত্তি থাকে না, যা কোন গভীর উৎস থেকে উৎসারিত হয় না -- তার প্রভাব হয় সাময়িক।

"মহতী বিনষ্টি"

প্রধানতঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনৃত্যতেই সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হল, রাজাধিরাজ যাঁর ভাণ্ডারে বিবিধ মূল্যবান রতন আছে যার সামান্য কিছু পেলেও সারা জীবনের অভাব মিটে যাবে এবং যা তিনি অকাতরে দিতেও চাইছেন আমরা তা না নিয়ে সাময়িক আনন্দের জন্য তাঁর কাছে সামান্য অর্থভিক্ষা করছি। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে আমাদের জীবনের পাত্রকে পূর্ণ করে দেওয়ার মত বস্তু যথেষ্ট থাকলেও আমরা তা কি নিতে চাই ? অথচ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ এবং বাংলা আমাদের মাতৃভাষা হওয়ার সুবাদে আমরা না জানি কত সহজেই তা পেতে পারতাম। এর থেকে "মহতী বিনষ্টি" আর কি হতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্।

আমরা আগে আলোচনা করে এসেছি যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি অন্যতম সাধনা ছিল "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা।" কিন্তু আমাদের জীবনে সে সাধনার কোন অঙ্গীকার না থাকাতে, কোন প্রতিফলন না থাকাতে দেবতা আমাদের থেকে দূরেই থাকেন -- দেবতার দিব্য স্পর্শে আমরা সঞ্জীবিত হই না, ঊর্দ্ধায়িত হই না -- যা ভূমা তা আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। অন্যদিকে প্রিয়রে দেবতা করি না বলে, প্রিয়র মধ্যে যে দিব্য সত্ত্বা আছে তার কোন সন্ধান করি না বলে প্রিয়কে ভালোবাসা আমাদের আসক্তির জালে বদ্ধ করে, মুক্তির আনন্দ পাই না, তা আমাদের অনন্ত সত্ত্বাকে সঙ্কুচিত করে রাখে প্রসারিত হতে দেয় না; শুধু তাই নয়, কালক্রমে প্রিয়র প্রতি সেই প্রেম শীর্ণ শুষ্ক হয়ে যায় -- এমনকি "পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে" তারও আশংকা থাকে।

যে অধ্যাত্ম ভিত্তিক জীবনদর্শন রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের তথা রবীন্দ্ররচনার মূল ভিত্তি, যে উৎস থেকে তা উৎসারিত, যে বোধে তা সঞ্জীবিত, যা তাঁকে "কবিমনীষী" করেছে, যা তাঁর জীবনকে সার্থক করেছে, তার সন্ধান করা, নিজের জীবনে কমবশী তাকে লাভ করে তাকে মহত্তর করা, পূর্ণতর করার প্রয়াসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে যথার্থরূপে ভালোবাসা ও চর্চা করার সূত্র নিহিত।

"সমস্তই কেবল সংসারকে দেব, তাঁকে কিছুই দেব না !"

কি সেই জীবনদর্শন যার কথা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি, কিভাবে সেই জীবনদর্শনকে আমরাও নিজেদের জীবনে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে প্রয়োগ করে ঠিক ঠিক লাভবান হতে পারি সে সম্বন্ধে আমাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের উপদেশ উদ্ধৃত করে বর্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত হবে। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং মূল্যবান সেই উপদেশগুলির বক্তব্য গভীর অথচ প্রাঞ্জল -- ফলে নতুন করে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

*আমি সমস্ত জীবন বাইরের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম, দশজনের সঙ্গে মিলছি মিশছি হাসি গল্প করছি আর ভাবছি কোনমতে দিন কেটে যাচ্ছে -- যেন দিনটা কাটানোই হচ্ছে দিনটা পাবার উদ্দেশ্য। যেন দিনের অন্য কোন অর্থ নেই।

*একবার অন্তরের দিকে চোখ ফেরাও। তখনই সমস্ত মানে বুঝতে পারবে। তোমার এই সুগভীর নির্জনতার মধ্যে, তোমার এই অন্তহীন চিদাকাশের মধ্যে তাঁর এই অদ্ভুত বিরাট লীলা দিনে রাতে অবিশ্রাম এই আশ্চর্য্য প্রভাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কেবল বাইরের দিকে দেখতে গেলে এতে আনন্দ পাবে না, অর্থ পাবে না।

*আগাগোড়া সমস্তই কেবল সংসারকে দেব, আর তাঁকে কিছুই দেব না, তাঁকে প্রত্যেক দিনের মধ্যেই একান্ত "না" করে রেখে দেব এ তো কোন মতেই হতে পারে না।

*এ আমি তোমাদের জোর করেই বলে রাখছি এত বড় বিশ্ব এবং এমন মহৎ মানব জীবনে তাঁকে কোন জায়গাতেই একটুও স্বীকার করবে না -- এ তো কিছুতেই হতে পারে না।

*দিনের আরম্ভে প্রভাতের অরুনোদয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে

এই কথাটা একবার স্বীকার করে যেতেই হবে যে ''পিতা নোহসি''। তুমি পিতা, আছ। আমি স্বীকার করছি তুমি পিতা। আমি স্বীকার করছি তুমি আছ। আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাটি বলে যাবার জন্য তোমাদের সংসার ফেলে চলে আসতে হবে। সেইটুকু সময়ে থাক তোমাদের কাজকর্ম, থাক তোমাদের আমোদপ্রমোদ।

*কিছু যদি নাই জোটে তবে এই অভ্যাসটুকু প্রত্যহ তাঁর কাছে এনে দেবে। সকলের চেয়ে যেটা কম দেওয়া অন্ততঃ সে দেওয়াটাও তাঁকে দেব।

*যখন বিদ্যার ধনের বা মানুষের উপাসনা করি তখন সেটা এত সহজ উপাসনা হয় না। তখন উপাসনা যে কাকে বলে তা বুঝতে বাকি থাকে না। কেবল ঈশ্বরের উপাসনাই হচ্ছে উপাসনার মধ্যে সবচেয়ে ফাঁকি।

*প্রতিদিন সকল কর্মের মধ্যে আমাদের সাধনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। এই সাধনাটিকে আমাদের গড়তে হবে। শরীরটিকে, মনটিকে, হৃদয়টিকে সকল দিক দিয়ে ব্রহ্মবিহারের অনুকুল করে তুলতে হবে।

(মনকে আসক্তিমুক্ত করার সাধনা একটি প্রয়োজনীয় সাধনা -- তা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।) --- কিন্তু প্রতিনিয়ত এর জন্য চেষ্টা করতে হয়। --- তাই আমি প্রতিদিন শেষরাতে উঠে চুপ করে বসে নিজের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। এক এক দিন পারিনে, শক্ত হয়। কিন্তু আবার কোন কোন দিন দেখি, ফস করে বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। যেন স্পষ্ট দেখতে পাই আমার ছোট্ট আমিটা ঐ দূরে আলাদা হয়ে বসে রয়েছে, যাকে তোমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বল সেই মানুষটা। সেই লোকটা অতি তুচ্ছ। তার রাগ আছে , ক্ষোভ আছে, আরো কত ক্ষুদ্রতা আছে, সে অতি সাধারণ একটা মানুষ। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে সে চঞ্চল হয়; কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি তার চেয়ে অনেক বড়। আমাকে ছোটখাট সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা স্পর্শ করে না, আমার মনের গভীর শান্তির ব্যাঘাত কেউ করতে পারে না, আমি যেন নিজেকে সেই বিরাটের মধ্যে বিলীন দেখতে পাই। এটার জন্য কি কম চেষ্টা করতে হয় -- প্রতিদিন ক্রমাগত চেষ্টা করতে করতে তবে সহজ হয়ে আসে -- ''। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা বলছেন, ''একেবারে নিঃশেষে মরে তবে তাতে বেঁচে উঠতে হবে। তাঁদের সেই পথ অবলম্বন করে প্রতিদিন অহংকারের দিকে, স্বার্থের দিকে, আমাদের নিঃশেষে মরতে হবে এবং মৈত্রীর দিকে, প্রেমের দিকে, পরমাত্মার দিকে অপরিমাণ রূপে বাঁচতে হবে।''

শান্তি শান্তি শান্তি

কে বলতে পারে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীগুলির কোন একটির গভীর অনুধ্যান আমাদের হৃদয়ের দীর্ঘকালের বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে পূর্ণতার সন্ধান দেবে না, যার পরিণতিতে আমরা বলে উঠব --

অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, খেলা হল সমাপন
চপল চঞ্চল লহরী লীলা পারাবারে অবসান,
নীরব মন্ত্রে হৃদয় মাঝে
শান্তি শান্তি শান্তি বাজে
অরূপকান্তি নিরখি অন্তরে মুদিত লোচনে চাই।
আর কোলাহল নাই ।। ❑

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ –
* শান্তিনিকেতন -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* মানুষের ধর্ম -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* গীতবিতান -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* সঞ্চয়িতা -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* মালঞ্চ -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* Global Vedanta February 17, 2009
Published by Vedanta Society, Seattle
* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও মন্তব্যের কয়েকটি এবং মুদ্রিত ফটো দুটি উদ্বোধন পত্রিকা (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মাসিক মুখপত্র), রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট লেখকদের ও উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশকের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ।

Rabindranath Tagore's Universalism

- Viswa Ghosh

A couple or more years back I received a T-Shirt (see image) bought in Mumbai as a gift from my two daughters – a T-Shirt that carries a wonderful message of universalism. This mere T-shirt attests to the fact that we continue to have a whole lot of folks in India who would design and sell such T-Shirts, who agree with the message, and give the assurance of India remaining free from xenophobia. We may hope that the spirit of universalism that Rabindranath Tagore (henceforth, Tagore) re-kindled, breathed and lived will continue to thrive in India for long and, hopefully, will also spread to other lands.

A generation younger than another *Brahmo Samajist*, Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar (1820-1891) and a contemporary of Swami Vivekananda (1863-1902) and Mohandas K. Gandhi (1869-1948), Tagore (1861-1941) was well known for his universalism – a conception of the world as a single unit, and humanity as the defining characteristic of human beings rather than man-made categories, which allows for the appreciation of greatness in all shapes and sizes of humans, from any source of thought and in all regimes of belief, and affirms faith in a common heritage of immeasurable diversity for all of humankind.

In this essay I have attempted to present his philosophy of *universalism*, which I believe to be one of the highest kind. To provide a broader context and some idea of the social milieu within which he nourished his philosophy I cite his contemporaries and other philosophers.

On Religion

I am fairly certain that Tagore (and other universalist philosophers like Swami Vivekananda) would have been delighted by the message of universalism printed on the T-shirt. Being one of the leading members of *Brahmo Samaj*, Tagore subscribed to *Advaita Vedanta* according to which, not only are the different deities merely celestial manifestations of the ONE, *Brahman*, but there is also no religious separation between God and humanity:
"… our spirituality is based not on your philosophical and religious dualism which separates God, humanity and nature, but on the One underlying the many – that is *Brahman*."[1]

In this view, things in reality exist only in relationship with each other. Thus, according to Tagore, if the relationship is removed *that* reality ceases to exist (and another different 'reality' may emerge from another set of relationships). And the ultimate guarantor of such relationships is the ONE.

In July 1930 Tagore met Einstein at the latter's Potsdam residence. As an aside it is worth noting Einstein's reactions on seeing Tagore for the first time: "His shock of white hair, his burning eyes, his warm manner impressed me with the human character of this man who dealt so abstractly with the laws of geometry and mathematics."[2]

It is extremely interesting to note Tagore's understanding of universal truth that is revealed from their dialogue at this meeting. Excerpts from a dialogue between Tagore and Einstein (below) illuminates Tagore's thoughts on reality and universal truth:

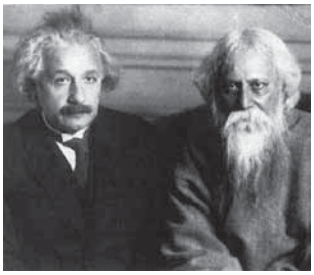

Einstein: "Do you believe in the divine as isolated from the world?"
Tagore: "Not isolated. The infinite personality of man comprehends the universe. There cannot be anything that cannot be subsumed by the human personality, and this proves that the truth of the universe is human truth."
Einstein: "There are two different conceptions about the nature of the universe - the world as a unity dependent on humanity, and the world as reality independent of the human factor."
…
Tagore: "The world is a human world – the scientific view of it is also that of the scientific man. Therefore, the world apart from us does not exist; it is a relative world, depending for its reality upon our consciousness. There is some standard

of reason and enjoyment which gives it truth, the standard of the eternal man whose experiences are made possible through our experiences."

Einstein: "Truth, then, or beauty, is not independent of man?"

…

Tagore: "What we call truth lies in the rational harmony between the subjective and objective aspects of reality, both of which belong to the superpersonal man."

Einstein: "We do things with our mind, even in our everyday life, for which we are not responsible. The mind acknowledges realities outside of it, independent of it. For instance, nobody may be in this house, yet that table remains where it is."

Tagore: "Yes, it remains outside the individual mind, but not the universal mind. The table is that which is perceptible by some kind of consciousness we possess."

Einstein: "If nobody were in the house the table would exist all the same, but this is already illegitimate from your point of view, because we cannot explain what it means, that the table is there, independently of us. Our natural point of view in regard to the existence of truth apart from humanity cannot be explained or proved, but it is a belief which nobody can lack – not even primitive beings. We attribute to truth a superhuman objectivity. It is indispensable for us – this reality which is independent of our existence and our experience and our mind - though we cannot say what it means."

Tagore: "In any case, if there be any truth absolutely unrelated to humanity, then for us it is absolutely non-existing."

This interesting dialogue with Einstein took place in July 1930 at the latter's Potsdam residence.[3]

Tagore had concluded that *Advaita Vedanta* was the basis of India and her deeper spirituality. Envisioning the highest of ideals for India, Tagore wrote in "The Indian Pilgrimage" (***Bharat Tirtha***):

None can tell, at whose beckoning,
vast waves of humanity
… merge into the Great Sea! …
All shall give and take, mingle and be mingled in,
none shall depart dejected
From the shores of the sea of
Bharata's Great Humanity! [4]

Thus, for Tagore, India stood for spiritual universalism and universalism of the spirit.

On Nationalism

As can be expected from a universalist like Tagore, he was fiercely opposed to Nationalism, the unflinching devotion to one's nation that sees it as supreme, that seeks justifications of cultural or racial supremacy to explain this greatness. His philosophical basis informed his rejection of the Nation as a concept and Nationalism as a political idea.

In his lectures in the U.S. during 1916~17 he condemned Nationalism in no small measure.[5]

"The Nation has thriven long upon mutilated humanity. Men, the fairest creations of God, came out of the National manufactory in huge numbers as war-making and money-making puppets, ludicrously vain of their pitiful perfection of mechanism. Human society grew more and more into a marionette show of politicians, soldiers, manufacturers and bureaucrats, pulled by wire arrangements of wonderful efficiency."

Expressing his outrage on the behavior of nations and nation-states in his poem titled, "The Sunset of the Century", written on the last day of the 19th Century[6]:

The last Sun of the century sets amidst the blood-red
clouds of the West and the whirlwind of hatred.
The naked passion of the self-love of Nations, in
its drunken delirium of greed, is dancing to the
clash of steel and howling verses of vengeance.
The hungry self of the Nation shall burst in a
violence of fury from its shameless feeding.
For it has made the world its food.
And licking it, crunching it and
swallowing it in big morsels,
It swells and swells…

Not being in full agreement with any of India's politicians – that included such colossus figures like Mahatma Gandhi, Subhas Bose, Balgangadhar Tilak, Jawaharlal Nehru, Valabbhai Patel – Tagore did not enter politics. Although in spirit he was always with the struggle for freedom, he distanced himself more and more from Nationalism and nearly every brand of *Swadeshi* as these propounded hatred for the British, or burning of Manchester-made goods, or blind obedience to the "spin and weave," and so on.

On the one hand he opposed the British attempts at partitioning of Bengal in 1905 and, on the other, he opposed the virulent and violent kind of politics that allegedly aimed at India's independence from the British.

Tagore's stand was not an easy one. It called for a careful negotiation of a middle-path. Freedom of countries was important so that they could negotiate, partner with, borrow and learn from each other on equal terms. But he spurned national chauvinism or national narcissism. Thus, each country needed the necessary space for flourishing and self-fulfillment. But none had the right to denigrate the other as

inferior and presume superiority over others.

To appreciate these subtle differences in his attitude we need to realize that while he supported the quest for freedom with all his being, he opposed any action that would spread hatred for the 'other'. To him partitioning of Bengal would add a wedge between an already divided population and distance the people from universalism. At the same, hatred for anything British – people and goods – would also drive a wedge between two peoples.

To reconcile and understand Tagore one has to look at his concept of universalism which was sincerely indiscriminate and, closely linked to his view of freedom. Hence, in 1908, in one of his oft referred to letters, Tagore wrote to Srimati Abala Bose, a social-worker and educationalist, and widow of scientist and nationalist, Sir Jagdish Chandra Bose:

> "Patriotism cannot be our final spiritual shelter; my refuge is humanity. I will not buy glass for the price of diamonds, and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live."[7]

Finally, to understand Tagore's desire for independence from an unjust British rule, one needs to look beyond the façade of political freedom. For him of paramount importance was freedom of the mind. Hence, he penned in the ***Gitanjali*** (75):

Where the mind is without fear
and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been
broken up into fragments
by narrow domestic walls; ...
Where the clear stream of reason
has not lost its way into the
dreary desert sand of dead habit; ...
Into that heaven of freedom,
my Father, let my country awake.

Conclusion

In conclusion, one realizes that Tagore was far ahead of his time and, in many senses, even of ours. He spoke in a language the significance of which many of his contemporaries – great stalwarts in their own right – failed to comprehend. Nobel Laureate Chemist, Ilya Prigogine, commented:[8]

> "The question of meaning of reality was the central subject of a fascinating dialog between Einstein and Tagore. Einstein emphasized that the sciences had to be independent of the existence of any observer. This led him to deny the reality of time as irreversibility, as evolution. On the contrary Tagore maintained that even if absolute truth could exist, it would be inaccessible to the human mind. ***Curiously enough, the present evolution of science is running in the direction stated by great poet.***" (my highlights)

Another point that strikes out is his relevance to our world today – a world that is, on the one hand, strife with greed and narrowness of minds and, on the other, pregnant with possibilities of universalism, of universal acceptance of cultural, religious and ethnic differences, of universal harmony, of a borderless world that is rid of Nations and Nation-states, and brimming with the potent. And, above all, for the sensitive mind his life and work provide the soothing effect after being exposed to the torture and torment of a civilization (so called, the most intelligent) that appears not to know the answer to the simplest of questions, "*Quo Vadis*". ❑

(Endnotes)

1 Gosling, David L. *Science and the Indian Tradition.* (cites Tagore), London: Routledge, p. 131.

2 *Ibid.,* (Einstein cited) p. 138.

3 *Op.cit.,* Gosling, David L. P. 138.

4 Chatterjee, Monish. "Rabindranath Tagore: Sadhaka of Universal Man, Baul of Infinite Songs." The English translation is taken from Monish Chatterjee. For readers who may be interested in confirming the meaning in original, Tagore's original verse in ***Bharat Tirtha*** (ভারততীর্থ) reads:

…
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
…
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে –
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।।
…

5 Tagore, Rabindranath. *Nationalism.* "Nationalism in the West," Norwood, Massachusetts: Norwood Press, August 1917, p. 58.

6 *Ibid.,* "The Sunset of the Century", p. 157.

7 Sen, Amartya. "Tagore and His India," *The New York Review of Books,* June 26, 1997.

8 Dutta, Krishna & Robinson, Andrew (eds). *Rabindranath Tagore: The Myriad-Minded Man*. New York, Bloomsbury Publishing Plc., 2009, p. 14

গীতাঞ্জলি কাব্যের শতবার্ষিকী

- অনুরাধা গুপ্ত

৩১শে শ্রাবণ ১৩১৭ গীতাঞ্জলির আত্মপ্রকাশ । নোবেল পুরস্কারে ভূষিত গীতাঞ্জলির শতবার্ষিকীতে জানাই আমাদের অভিবাদন ।

বিলেত যাওয়ার পথে "সিটি অফ গ্লাসগো জাহাজ"-এ বসে গীতাঞ্জলি কাব্যের কিছু কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথ তর্জমা করেন এবং লিপিবদ্ধ করেন "Song Offerings"-এ আমাদের গীতাঞ্জলি । রোটেন স্টাইনকে দেওয়া Song Offerings পড়ে তাঁর (রোটেন স্টাইন) মনে হল এই গানগুলি যেন এক অতীন্দ্রিয়তাবাদী মরমী সাধকের লেখা । পরবর্তী ঘটনা তো সকলের জানা, যার ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ ।

চটুল অশাস্ত্রীয়, হাল্কা মেজাজের সঙ্গীত যখন বাংলা তথা ভারতের মার্গ সঙ্গীতের পথকে ক্লেদাক্ত করছে তখন গীতাঞ্জলির গানগুলো যেন এক মরুদ্যান । এই গানগুলির সুদূর প্রসারী মর্মস্পর্শী বাণী অস্তমিত শৈল্পিক চেতনাকে বারি সিঞ্চনে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে ।

এ যুগেও যখন রোমান্টিকতা নির্বাসিত, কবির এই কবিতা সঙ্কলনে রোমান্স বাস্তব, অনবদ্য । পরবর্তী প্রজন্ম শতায়ু গীতাঞ্জলির কবিতাবৃত্তিতে হবে রোমাঞ্চিত, সুক্ষ্ম ও সুকুমার অনুভূতির অনুরণনে হবে পুলকিত । দিশাহীন প্রজন্মের কাছে আলোর দিশারী, আমাদের জিয়ন কাঠি ।

গীতাঞ্জলি শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করলে দুটি শব্দ পাওয়া যায় -- গীত ও অঞ্জলি । রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিপ্রবণ কবিতাগুলিকে তাঁর জীবন দেবতার পায়ে উৎসর্গ করেছেন । গীতাঞ্জলি কাব্যের প্রায় সব কবিতায় তাঁর ভক্ত প্রাণের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে ।

"ঘনশ্রাবণমেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু ,
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক
তব ভবন দ্বারে ।"

সীমার মাঝে যেমন অসীমের প্রকাশ, তেমনি কবির অন্তরে তাঁর অন্তর্যামীর উপলব্ধি মধুর হয়ে উঠেছে । যেমন জীবাত্মা আর পরমাত্মার মিলন, তেমনি কবি ও তাঁর জীবন দেবতার মিলনে "বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে ।"

উপনিষদে বলা হয়েছে "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" -- রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের এই বাণী গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন । গীতাঞ্জলির নানা কবিতায় এই ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে । "আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান", তার জোয়ার কবির অন্তরে ঝঙ্কৃত হয়েছে । তাঁর মনে হয়েছে "সেই আনন্দ-চরণপাতে / ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে ।" এই পরম অনুভূতি কবিকে হরষিত করেছে, রোমাঞ্চিত করেছে ।

"আজিকে এই আকাশ তলে
জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন করে মনোহরণ
ছড়ালে মন মোর ।"

জগতের এই আনন্দ যজ্ঞে প্রবেশাধিকার লাভ করে কবি ধন্য । তাই তিনি বলেছেন –

"তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশি
গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্না হাসি । "

এই জগত সংসারের অন্তরালে যে বিরাট পুরুষ আছেন, তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম", কিন্তু লীলাচ্ছলে "বহুস্যাম" হয়েছেন । এই জগৎ সংসার সৃষ্টি করে কোন অনাদি কাল থেকে জীব জগতের সঙ্গে খেলা চলছে । গীতাঞ্জলির কবিতায় তারই ব্যঞ্জনা –

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর ,
তোমার প্রেম হত যে মিছে ।"

বর্তমান কালের এই ভোগবাদী জীবনে শতবর্ষ পূর্বে লেখা গীতাঞ্জলির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই মনে হয় । ক্ষমতালোভী, অর্থলোভী মানুষ যখন বিবেকশূন্য হয়ে দিশেহারা – "বাসনা যখন বিপুল ধুলায় / অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়" -- তখনই তো গীতাঞ্জলির প্রার্থনা সঙ্গীত শোনা যায় – "ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র/ রুদ্র আলোকে এসো ।" সেই লোভী, পাপী মানুষ নিঃসঙ্কোচে বলতে পারবে –

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে ।" ❑

The Spirituality of Rabindranath Tagore

- Anirvan Mukherjee

Introduction

There are different opinions regarding the 'subject matter' of spirituality. To some – spirituality is purely the subject matter of religion – whereas for others, spirituality has a broader meaning. In the 'broader context' definition, besides religion - education is also considered as a means for attaining spiritual experience, since true knowledge also leads to an 'inner uplift' of the soul. This article attempts to explore Tagore's spirituality in a 'broader context'.

Though Rabindranath Tagore is sometimes referred to as 'the great mystic from the East' – it is necessary to realize that, he was essentially a poet. In fact he never wanted to be labeled a theologian or a philosopher. As regards spiritualism, in his own words – at the age of 18, he experienced *"a sudden spring breeze of religious experience for the first time … I became conscious of a stirring of soul within me"*. Throughout his life, a number of Tagore's writings and devotional poems deal with religious experience & spirituality.

Liberal Outlook

In order to understand Tagore's spirituality, a brief understanding of his childhood environment is essential. Though Tagore came from a landed and wealthy Hindu family – that took *noblesse-oblige* for granted, the family environment was – in his own words – *"a confluence of three cultures: Hindu, Mohammedan and British"*. As a result, Tagore's outlook was liberal and cosmopolitan. This set him apart from contemporary mystics. For example, he never advocated renunciation as a means for seeking God. Rather he accepted life as it is and enjoyed the manifold beauties of life and nature enthusiastically.

So Tagore - in his poem advises the priest to leave his singing and chanting and seek God where the tillers are tilling the soil or the path makers are breaking the stones.

"Leave this chanting and singing and telling of beads! Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee!

He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the path maker is breaking stones. He is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust. Put off thy holy mantle and even like him come down in the dusty soil!

Deliverance? Where is this deliverance to be found? Our master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation; he is bound with us all forever.

Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense! What harm is there if thy clothes become tattered and stained? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow."

Dualism

Tagore's philosophical position was essentially that of a 'dualist' – where there is a constant synthesis between the opposites. So to him freedom is the absence of bondage – but it can only be realized through bondage. To take an analogy: A string and a harp – can produce music together – when they are being bonded to each other. So also life, it realizes its freedom in the midst of bonds. Even Tagore sees perfect harmony between illusion ('Maya') and truth. The world maybe an illusion ('Maya') but it is essential – since without illusion – truth will be empty. This concept is well articulated in the poet's dance-drama composition – 'Chitrangada'.

"Illusion is the first appearance of truth.
She advances towards her lover in disguise.
But a time comes when she throws off her ornaments and veils and stands clothed in naked dignity".

Education

As I stated at the beginning, spiritualism in a 'broader context', also includes education. It is in the sphere of education that Tagore's ideas were truly revolutionary. The origins of his ideas on education, first appeared in an article called 'Tapoban' (Message of the Forest), where he explained how – *"The Forest, unlike the Desert or Sea is living …. It gives shelter and nourishment to life. In*

such surroundings, the ancient dwellers realized the spirit of harmony with the universe…" This leads him to the idea of a hermitage – when starting his school in Shanti-Niketan. While setting up his school – he looked for a 'Tapoban (forest)' like place with an intimate community of teachers & students. Though the concept was based on the ancient system of education (called the 'Brahmacharya Ashram') he rejected the rigidity of the old system. His concept of a school was one where the students are in harmony with the nature and also integrated with the rest of the world. Eventually Viswa-Bharati was formed and as we know – the rest is history.

Conclusion

I would like to conclude by quoting a verse from Gitanjali ('Song Offerings') which explains the poet's experience - that can be gained from meditation:

"I ask for a moment's indulgence to sit by thy side.
The works that I have in hand I will finish afterwards.
Away from the sight of thy face my heart knows no rest nor respite.
And my work becomes an endless toil in a shoreless sea of toil.
Today the summer has come at my window with its sighs and murmurs;
And the bees are plying their minstrelsy at the court of the flowering grove.
Now it is time to sit quiet, face to face with thee,
And to sing dedication of life in this silent and overflowing leisure." ❑

Citation and Nobel Prize Medal

CITATION:
"Because of his profoundly sensitive, fresh, and beautiful verse, by which, with consummate skill, he has made his poetic thought, expressed in his own English words, a part of the literature of the West"

আমার রবীন্দ্রনাথ

- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শৈশব কৈশোর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বময় একজন, যৌবনের শুরুতে এসে আমি দুজন রবীন্দ্রনাথের দেখা পাই । একজন রবীন্দ্রনাথ বাইরের ও সর্বসমক্ষের, আরেকজন রবীন্দ্রনাথ অন্তর্নিহিত গোপন । বাইরের রবীন্দ্রনাথ, যিনি কবিগুরু, বিশ্ববরেণ্য, দ্রষ্টা, তাঁর সম্পর্কে কিছুটা অভিমান ও বিরোধিতা জমে ওঠে । তাঁকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখা দেয় আমার মধ্যে । এই দুঃসাহসের মধ্যে হয়তো একটু শৌখিনতা ছিল, সে শৌখিনতা কিছুটা কল্লোলযুগের লেখকদের উত্তরাধিকার, আর কিছুটা কাগজের ওপর আমার নিজের কলম রাখার অহংকার-বশতঃ । কিন্তু তখনও ভিতরে একজন সুবিপুল রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, আমার অধিকাংশ একা মুহূর্তের যিনি অধীশ্বর, কোনো বালিকাকে প্রেমপত্র লিখতে গেলে তাঁর রচনা ছাড়া গতি ছিল না, আমার যে কোনও মুগ্ধতাবোধে তিনি ভাষা দিতেন । মাঠ জুড়ে বৃষ্টি পড়ছে, তখন আমি গুন গুন করতে বাধ্য ছিলুম তাঁর গান, হঠাৎ মানুষের মধ্যে থমকে গিয়ে আমি মানুষকে দেখতুম, গোপন রবীন্দ্রনাথের চোখে গ্রন্থ খুলে আমি দেখতে পেতুম শব্দের অসংখ্য সিঁড়ির উন্মোচন ।

ক্রমশ আমি ভিতরের এই রবীন্দ্রনাথকে হারাতে শুরু করি, অনেকটা আত্মবিস্মৃত হবার মতোই এই রবীন্দ্র-বিস্মৃতি, এজন্য আমি বেশ কিছুদিন বেদনা পেয়েছি । তখন আমার তেইশ বছর বয়েস, তিরিশে চৈত্র সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি, এমন সময় ঝড় উঠলো, কালবৈশাখীর, ঘন্টা দেড়েক ধরে চললো সেই বিপুল তাণ্ডব । আমি বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিলাম, অনেকক্ষণ পর একটা কথা মনে পড়ায় চমকে বা শিউরে উঠেছিলাম । ততক্ষণ ধরে ঝড় দেখছি, কিন্তু একবারও আমার মনে পড়েনি তো যে, এই ঝড়ে গত বছরের সমস্ত আবর্জনা ও গ্লানিকে উড়িয়ে দিয়ে নবীনকে আহ্বান জানাচ্ছে । এ কথা মনে পড়ার পরে সচেতনভাবেও এ ধরণের কোনো রূপক আমি দেখতে পেলুম না ঝড়ের মধ্যে । বরং বাগান ও যত রাজ্যের ধুলো উড়িয়ে আসছে আমার চোখে, আমাকে অন্ধ করে দেবার ফিকির এই ঝড়ের, কিন্তু আমি তো গত বছরের আবর্জনা নই । বাগানের নবীন হরিতকি গাছটা যে সে উপড়ে ফেলে দিল, তার মধ্যেও কোনো সমীচীনতা নেই । প্রকৃতি, এই ধরণেরই অযৌক্তিক ও পাগলাটে, ঈর্ষায় ভরা । আসলে ঝড়ের কোনো রূপ বা রূপক কিছুই নেই । ঝড় হচ্ছে ঝড়ই আর কিছুই না, আমি যে এই দণ্ডে ঝড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এইটুকুই সত্য, আমি দৈবাৎ তখন এয়ার কণ্ডিশন ঘরে বসে থাকলে সে কেমন করুণভাবে মিথ্যে হয়ে যেত । সেই রকম রোদ্দুর, বৃষ্টি ও নদী, এরা সবাই উপমাবিহীন, আমি এদের সামনে দাঁড়ালে একটা মুহূর্তের সত্য সৃষ্টি হয়, এবং সেটা আমি তখন কী রকমভাবে বেঁচে বা দাঁড়িয়ে আছি, তার ওপর নির্ভরশীল ।

এইভাবে আমি অন্তরের রবীন্দ্রনাথকে হারাতে শুরু করি । এই হারানোর সমূহ ক্ষতি আমারই নিজস্ব । এই বিপুল সম্পদ অপসারণের ফলে আমি কত দরিদ্র এখন, আমার শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু, ভাগ্যহীন ললাট, কিন্তু আমি সত্যবাদী হয়েছি, তপস্বীর মত সত্যবাদী । আমি দীর্ঘকাল কবি রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে এক উৎসবময় দেশে মধুর স্মৃতি ভরে বেড়াতে গিয়েছি, তারপর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি উঠেছেন এক আলোকোজ্জ্বল বিমানে, আমি প্রবেশ করেছি এক অপরিচিত অরণ্যে, যেখানে বিপদ ও ভালো লাগা মুহূর্তে বদল হয় । তিনিই হাত ছাড়িয়ে নিয়েছেন, আর আসতে চাননি । আমি জেনে গেছি, কবিতা আর কখনো বাণী উচ্চারণ করবে না, কবিতা আর কোনো কবিকে জনতার মাথা ছাড়িয়ে কোনও উঁচু বেদীতে বসাবে না । কবিতা হয়তো এখন আর সরস্বতীর পূজার জন্য পুষ্প নয়, এখন কবিতা নদীর তরঙ্গে ছুঁড়ে দেওয়া তামার পয়সার মতো, হারিয়ে যাওয়াই তার নিয়তি । ❑

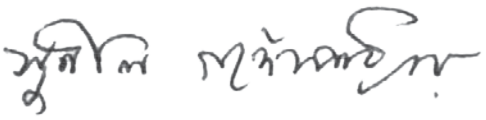

Appreciating the legend – a humble attempt

- Nandini Basu

When Satyajit Ray made the brilliant documentary on Gurudev, he titled it just "Rabindranath" because he felt that the greatness of Tagore could not be encompassed by any other title. I suppose that the problem which everyone faces when writing on Tagore is that he is so multifaceted that words fall short in describing his sheer genius. In this article, I have tried to string together some aspects of Tagore that I have found interesting.

The power of Tagore's writing was felt across continents and among all sections of people. Susan Owen, the mother of the famous war poet Wilfred Owen, wrote to Tagore - "the day he said goodbye to me…he, my poet son, said those wonderful words of yours beginning with 'when I go from hence, let this be my parting word.' When his pocket book came back home-I found these words written in his dear writing with your name beneath." (The line was from The Gitanjali, verse 96)

This power of writing is also evident when on the 15th of July, 1942 Janusz Korczak produced 'The Post Office' with 'his children' ignoring SS orders forbidding Jews to perform works by Aryan authors. When asked after the performance why he had chosen the play, Korczak declared that the play reinstated the fact that "eventually one had to learn to accept serenely the angel of death." It will be noteworthy to mention here that the Tagore Shraddh ceremony began with a song composed by the deceased poet which he himself had intended to sing in the role of the fakir at a new production of ' The Post Office' after Amal's death.

The other aspect of Tagore is his versatility. "The sheer volume and diversity of Tagore's oeuvre in a creative life of over sixty years is enough to make one gasp." (Krishna Dutt and Andrew Robinson) There are twenty-eight large volumes consisting of Tagore's poetry, drama, operas, short stories, novels, essays and diaries and a similar number of (slimmer) volumes of letters. His songs number two and a half thousand (all set to music by him), his paintings and drawings over two thousand!

Like pop stars, some of Tagore's works were shrouded in controversy. To many Bengalis, Tagore's ideas were too westernized. In the Bengali language paper of the Calcutta University's matriculation exam of 1914, there was a passage from Rabindranath. The examinee was asked to re-write the passage in 'chaste and elegant' Bengali!

While appreciating certain aspects of British rule, Tagore was a patriot who believed in India's spiritual values and was a part of the freedom movement. His genius was evident during the Anti-partition movement in Bengal in 1905 when, at his instance, people tied rakhis on each other symbolizing the unbroken spirit of the land. Tagore's patriotic songs resounded everywhere and perhaps his finest hour was when he renounced his knighthood in 1919 in protest against the Jallianwallah Bagh massacre.

To a large extent, the greatness of Tagore's words come from their sheer simplicity and universality. Yeats' comments on the Gitanjali hold true for all of Tagore's works. "What we admire in the Gitanjali, is that it is not encumbered with mythology." It is not necessary to know the background of Tagore's works to admire and appreciate their beauty. Yeats had also written that the Gitanjali is "the work of a supreme culture, yet they appear as much as the growth of the common soil."

Above all, the strength and power of Tagore's works come from his courage to face and uphold the truth. Rabindranath had once written to his niece, Indira, "In my life, I may have done many things that are unworthy with or without knowing but in my poetry, I have never uttered anything false; it is the sanctuary for the deepest truths I know."

When words do come from such depths of truth, it is no wonder that Tagore's power is felt so overwhelmingly even today. As Darwin's granddaughter told a friend after meeting Tagore, "I can now imagine a powerful and gentle Christ, which I never could before." ❑

ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা প্রভু তোমার পানে

- ভাস্বতী ঘোষ (সেনগুপ্ত)

"রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা যে শুধু সুরের জন্যই তা ভালবাসেন তা মনে হয় না, তাঁরা কবির গানের কথার মধ্যেও হারিয়ে যেতে ভালবাসেন। কথায়, সুরে মিশে সে গান তখন কি শিল্পী কি শ্রোতার অন্তর্মনের কথা হয়ে ওঠে -- "

শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র

আমার বাল্যকালে প্রতি রবিবার সকালে রেডিওতে "রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার আসর" অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হোত ও সেইসময় শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র শেখাতেন। প্রতি সপ্তাহে আমি ঐ গান শেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম এবং ঐভাবে বেশ কিছু গান শিখেছি।

তারও আগের স্মৃতিতে মনে পড়ে আমার বাবা আমার ছোট ভাইকে ঘুম পাড়াচ্ছেন "জনগণমন" গানটি গেয়ে -- শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে পায়চারি করতে করতে সম্পূর্ণ গানটি গাইছেন, তাঁর চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রুধারা গাল বেয়ে পড়ছে , মাঝে মাঝে গলাও রুদ্ধ হয়ে আসছে। এই গানটির প্রিয় পংক্তিগুলি "রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব -উদয়গিরি ভালে" -- বার বার গাইছেন। সেই গান শুনতে শুনতে আমাদের সকলেরই সম্পূর্ণ কবিতাটি মুখস্থ হয়ে গেল। ঐ বয়সে রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন ভাল লাগত তা বিশ্লেষণ করতে পারব না, কিন্তু গানগুলি নিঃসন্দেহে আমাকে আকর্ষণ করত সেই বয়স থেকেই।

আরেকটি অভিজ্ঞতা যা আমার জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে এক বিশেষ স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল , সেটি এখানে উল্লেখ করি। আমার বিদ্যালয় জীবন কেটেছে জামশেদপুরে। আমার ছোটবেলায় জামশেদপুরের বাঙ্গালী সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক দিকে অগ্রণী ছিলেন। তাই সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান লেগে থাকত এবং স্বনামধন্য শিল্পীরা এসে অনুষ্ঠান করতেন। মামনি (শ্রীমতী রেবা লালা) ও মেশো (৺শ্রী অমর লালা) আমাকে ঐসব বড় বড় শিল্পীদের অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন। প্রথম সারিতে বসে সকলকে চাক্ষুস দেখার ও তাদের মর্মস্পর্শী গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে মামনি ও মেশোর চেষ্টায় ও ঈশ্বরের করুণায়। সর্বপ্রথম যে গানটি আমাকে চমক লাগায় সেটি শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া – "সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান"-- তার আগে স্কুলের প্রার্থনার জন্য অনেকগুলি গান শিখেছিলাম , তার মধ্যে এই গানটিও ছিল। কিন্তু সেদিন ওনার দীপ্তকণ্ঠের পরিষ্কার উচ্চারণে ও আবেগে গানটি অন্য মাত্রা পেল। এর পর আরো অনেক গান উনি গাইলেন। প্রত্যেকটি অনবদ্য। তবুও ঐ প্রথম গানটি শোনার সময় আমার যে রোমাঞ্চ ও শিহরণ জেগেছিল তা আজও ভুলতে পারি নি। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরও আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত ঐ স্থানেই বসে ছিলাম বহুক্ষণ। পরবর্তীকালে ৺শ্রী সুবিনয় রায় , ৺শ্রী সাগর সেন , ৺শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় , ৺শ্রী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় , শ্রীমতী কমলা বসু এবং আরো বহু গুণী শিল্পীদের গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে , আর সেই সব অভিজ্ঞতা আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবাসা ও ভাল লাগার পথে সাহায্য করেছে।

আমাদের স্কুলের গানের শিক্ষিকা ছিলেন ৺শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায় (আমাদের মীরাদি)। তাঁর কাছেও পূজা পর্যায়ের বেশ কিছু গান , ব্রহ্মসঙ্গীত ও প্রার্থনাসঙ্গীত শিখেছি। তাঁর কাছে আমি ঋণী। মিষ্টুনীদি (ডঃ সুদক্ষিণা দাস) আমাকে "চণ্ডালিকা"র গান শিখিয়েছেন। এছাড়া পরবর্তীকালে আমার পিসতুতো দাদা (শ্রী দুর্গাচরণ মজুমদার) আমার একান্ত অনুরোধে কয়েকটি গান আমাকে শিখিয়েছেন। বর্তমানে তিনি বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের শিক্ষক। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

"সংসারে লাভ-ক্ষতি, কলহ-কোলাহল, ঈর্ষা-ক্ষুদ্রতা এত বেশী যে ভাল লাগার অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা কতটুকুই বা ঘটে আর হয়ত তাই জন্য রবীন্দ্রনাথের গান শিল্পী গাইতে ভালবাসেন ও শ্রোতারা শুনতে ভালবাসেন। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও এতে উভয়েরই ঘটে চিত্তশুদ্ধি। কত ভাবে, কত ভঙ্গিতে, কত আভাসে-ইঙ্গিতে কবি তাঁর ভাব-ভাবনাগুলিকে গানে, কথায় প্রকাশ করে গেছেন, সে কথা ভেবে দেখলে বিস্ময় জাগে, চমক লাগে" -- শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র। রবীন্দ্রসঙ্গীতের একই গান যা ছোটবেলায় গেয়ে যে অনুভূতি হয়েছে, বয়সের সাথে সাথে ও পরিস্থিতির সাথে তার অর্থ নতুন রূপে ধরা দিয়েছে। যেমন "পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে" -- এই গানটির এক নতুন তাৎপর্য পেলাম আমার দিদি অসময়ে চলে যাবার পর। "যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া" -- এই যাওয়ার আকুলতা কতটা আর সেটি কতখানি আকাঙ্খিত তা বোঝা যায় যখন গাওয়া হয় – "বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে, রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে, যাবার লাগি মন তারি উদাসে"। আবার আরেকটি গানের লাইন আমাকে নতুন কোরে নাড়া দিল – "তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই" -- সেই অবস্থাতেই "মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কুপ", অথবা "ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে, অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে" (শেষ নাহি যে)। এই লাইনটি আমাকে মনে করিয়ে দেয় –

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"।

(অর্থ -- এই আত্মা জন্মরহিত শাশ্বত ও পুরাতন। শরীরকে হনন করিলেও ইনি নিহত হন না।)

রবীন্দ্রনাথের গান কখন যে নির্দ্দিষ্ট পর্যায়ের বাঁধ ভেঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তা আমরা সবসময় উপলব্ধি করতে পারি না তবুও বলব পূজা পর্যায়ের গান আমাকে খুব বেশী রকম আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার পূজা; মন্ত্রোচ্চারণের থেকে অনেক সহজে আমি এই গানে আত্মনিয়োগ করতে পারি। জীবনে নানান পরিস্থিতিতে যখনই পথ হারিয়ে ফেলে দিশাহারা

মনে হয়েছে , তখনই এই গান আমার পাথেয় হয়ে আমাকে সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করেছে। আবার একই গান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে , যেমন "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" কিম্বা "এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে" এই গানগুলি প্রেম পর্যায়ে বিন্যস্ত হলেও আমার কাছে এখন এগুলির অর্থ ভগবৎ প্রেম বা পূজা । রবীন্দ্রনাথের গানের অর্থ বোঝার জন্য উপলব্ধির প্রয়োজন । আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বা শুনতে থাকলে এই উপলব্ধিতে পৌঁছানো যায় বলে আমার ধারণা। আমার বাবার কাছে একসময় শুনেছিলাম কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন দেবর্ষি , তাঁর লেখা , কবিতা বা গান যে পড়ে অথবা শোনে , তার আর নতুন করে বেদ , উপনিষদ পড়ার প্রয়োজন হয়না । এখন যখন ব্রহ্মসঙ্গীত বা পূজা পর্যায়ের গানগুলি শুনি অথবা গাই , তখন বাবার কথাটি ধ্রুব সত্যি বলে মনে হয় ।

আরও কয়েকটি গান যেগুলি আমাকে বিস্মিত করে চমক লাগায় , সেগুলি হল – "বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা", "মহাবিশ্বে মহাকাশে" -- এগুলিতে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের একটি ছবি আমার মানসচক্ষে ধরা দেয় অথবা "তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু , হারায় না কভু অনু পরমাণু" -- (অল্প লইয়া থাকি তাই) এটি কবির বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রকাশ বলে মনে হয় ।

আনন্দময় মুহূর্তে ঈশ্বরকে স্মরণ করি কিনা তা বলা মুস্কিল , কিন্তু উদাস মনে , ব্যথিত চিত্তে , কিংবা বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দিকে মন ধায় আর সেই সময় রবীন্দ্রসঙ্গীতই আমার পূজা, আমার আকুতি ।

দু বছর আগে দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়ে পা ভেঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম । অপারেশন তখনো হয় নি, তাই যন্ত্রণায় কাতর । যতই মনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি কিছুতেই পারছি না । সেই সময় রাত্রে ঘুমের ওষুধ, ব্যথার ওষুধ কিছুই কাজ করছে না -- হঠাৎ একটি গান মনে পড়ে গেল – "আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে"। গানটি গুনগুন করতে থাকলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মন অনেকটা শান্ত হল ও এই ধরণের গান একের পর এক মনে পড়তে লাগল – "সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি", "ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি"? "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি"। ধীরে ধীরে দুর্ঘটনার অন্য আরেকটি দিকও আমার কাছে পরিস্কার হল । এইরকম অনেক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা আমাকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকে ধাবিত করে আর রবীন্দ্রসঙ্গীত এগুলির স্বরূপ দেখাতে সাহায্য করে । বলা যায় একে অন্যের পরিপূরক । এখনো পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতই পথের দিশারী হয়ে আমাকে পথ চলার আনন্দ দিয়ে চলেছে । তাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে চাই –

রবীন্দ্রসঙ্গীতই "আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি"। ❑

ラビンドラナート・タゴール生誕150年

日付：2011年6月11日(土)
場所：タワー・ホール船堀、5階

興味がある方と参加したい方お早めに連絡をお願い致します:

神戸朋子	043-252-1589
ムカルジ・カラビ	090-6513-8850
ゴーシュ・ビシュワ	080-5640-2087

150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore

Celebrations on: June 11th (Saturday), 2011
Venue: *Tower Hall Funabori* (5F, Small Hall)

Interested participants please contact as early as possible:

Bhaswati Ghosh	044-511-1299
Sudipta Roy Choudhury	090-7230-6940
Samudra Duttagupta	090-6529-1959

রবীন্দ্রসাহিত্যের জাপানি অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু স্মৃতি

- কল্যাণ দাশগুপ্ত

দীর্ঘ দু-দশক জাপান প্রবাস পেরিয়ে আমার জীবনের আরও আঠারো বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেটে গিয়েছে। বয়েসটা তো থেমে নেই, যেখানে গিয়ে ছুঁয়েছে তার বৈশিষ্ট্যই হল চর্বিতচর্বণ, চলতি মতে জাবর কাটা। এখন আর বিশেষ কোনও পরিস্থিতির তাড়নায় নয়, অকারণেই মনে হুড়োহুড়ি করে ঢুকে পড়ে ফেলে আসা পথের স্মৃতি। ভাগ্য ভাল, এর মধ্যে আনন্দময় স্মৃতিও বেশ কিছু আছে। তাদেরই একটি ক্রমেই-এগিয়ে-চলা বর্তমানের প্রবেশদ্বারে ধাক্কা দিচ্ছে কিছুকাল হল। অঞ্জলি পত্রিকার আশকারায় তারই থেকে দু-চার কথা নিবেদন করতে বসেছি।

সেটা ছিল ১৯৭৫ সাল। গ্রীষ্মকালে প্রতি বছরেরই মত টোকিও গাইকোকুগো-দাইগাকু (ইংরিজি নাম Tokyo University of Foreign Studies) আয়োজন করেছেন একটি বিদেশী ভাষা দ্রুত প্রশিক্ষণের -- অতি অল্প সময়ে ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা। আমি এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, কেননা সেবার শেখানো হয়েছিল আ মরি বাংলা ভাষা।

ছাত্র সংখ্যা কত ছিল ? মনে নেই, তবে দশের বেশি তো হবেই। সপ্তাহে বোধকরি চার দিন ক্লাস, প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘন্টা। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে কখনও ক্লান্তির চিহ্ন দেখিনি, বরং গভীর কৌতূহলই চোখে পড়েছিল একেবারে শেষ অবধি।

পড়িয়েছিলেন অধ্যাপক ৎসুয়োশি নারা। কোর্স যখন সাঙ্গ হল, আমাকে ডেকে তিনি জানালেন ছাত্রদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাংলা সাহিত্য পাঠে এবং তার জাপানি অনুবাদে উৎসাহী। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাদের কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি কিনা।

আমি তো না-ভেবে-চিন্তে রাজি হয়ে গেলাম। প্রথম কী পড়া হবে ? আমি সুপারিশ করে বসলাম রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ। ভেবে দেখুন ব্যাপারটা ! মাস দুয়েক বাংলা শিখে সরাসরি কী, না ক্ষুধিত পাষাণ ! নির্বাচনের কারণ দুটি ছিল।

প্রথমত গল্পটি সম্পর্কে আমার পক্ষপাতিত্ব। ক্ষুধিত পাষাণের সমকক্ষ ছোটগল্প পৃথিবীতে আর কটি আছে জানা নেই, কিন্তু যদি খুঁজে পেতে একটিও না মেলে, আমি তাতে আশ্চর্য হব না। বছর আষ্টেক আগে এটির একটি অনবদ্য ইংরিজি অনুবাদ বেরিয়েছে। পাওয়া যাবে অনুবাদক অমিতাভ ঘোষের The Imam and the Indian(ISBN 81-7530-0582) প্রবন্ধ সঙ্কলনটিতে। আমি অনুবাদটি আমেরিকায় আমার পরিচিত একাধিক ইংরিজি সাহিত্যের অধ্যাপককে পড়িয়েছি, তাঁদের সাধুবাদ আমাকে আনন্দ দিয়েছে।

দ্বিতীয় কারণটি হল এই যে ১৯৭৫-এ টোকিয়োয় নিজের ইচ্ছা মতো বাংলা গল্প, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব ছিল। আমার দৃষ্টি সব সময়েই ছিল নারা সেনসেই-এর বইয়ের তাকের দিকে, সেখানে বিরাজ করত অখণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী। তারই থেকে ক্ষুধিত পাষাণ কপি করা হয়েছিল জাপানি ছাত্র-অনুবাদকদের জন্য।

আমার ধারণা বাংলা থেকে অন্য কোনও ভাষায় অনুবাদ যে কত দুরূহ তা এ কাজে হাত না দিলে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অনুবাদ ব্যাপারটিই সহজসাধ্য নয়, কিন্তু জাপানি থেকে যাঁরা ইংরিজিতে অনুবাদ করেন, অন্তত তাঁদের সহায়তায় হাজারও অভিধান ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। এখানে বাংলা পুস্তক-ভাণ্ডারের দৈন্য অপরিসীম। এ হেন পরিস্থিতিতে গ্রীষ্মের ছাত্রেরা যে মাঝপথে হাল ছেড়ে না দিয়ে কী করে অসীম উৎসাহে অনুবাদ শেষ করেছিলেন আজও তা আমার অজ্ঞাত। কিন্তু অনুবাদ শেষ হয়েছিল, এবং সাগ্রহে তা পাঠ করার লোকেরও অভাব হয় নি।

একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করার লোভ সামলাতে পারছি না। মূল গল্পে পাচ্ছি : হঠাৎ গুমোট ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটি বাতাস দিল -- শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল।

জাপানি অনুবাদে দাঁড়িয়েছিল:

突然蒸すような暑気を破って一陣の風が吹き抜けましたーシュスタ川の穏やかな水面が妖精の髪のようにさざ波立ち、夕闇に蔽われたすべての森が一瞬間、いっせいにさらさらと音を立てて、まるで悪夢から目覚めたようになりました。

লিখিত জাপানির সঙ্গে পাঠকদের অনেকেরই হয়তো পরিচয় নেই, কিন্তু অনুবাদ কেমন দাঁড়িয়েছিল তার আভাস আর কী উপায়ে আপনাদের দেওয়া যেত ?

অনুবাদে একটি শব্দে হোঁচট খেতে হয়েছিল। শব্দটি জাপানিতে না থাকায় অনুবাদকেরা মূল ফরাসি থেকে ইংরিজিতে আমদানি এ -শব্দটির কাতাকানায় লিপ্যন্তরিত জাপানি প্রতিশব্দটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। আমি এতে আপত্তি জানিয়েছিলাম, আমার ইচ্ছা ছিল ক্ষুধিত পাষাণের জাপানি অনুবাদে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ জাপানি ভাষার নিজস্ব শব্দভাণ্ডার থেকে চয়িত হবে। শেষ অবধি শব্দটি সৃষ্টি করতে হয়েছিল জাপানিতে।

ক্ষুধিত পাষাণের পাশাপাশি আরও কিছু অনুবাদ চলছিল। আমারই অনুরোধে একই সময়ে সম্মিলিত অনুবাদ হয় "দুঃসময়" কবিতার। তাছাড়া ছিল ডাকঘর নাটক। ডাকঘরের অনুবাদক ছিলেন মাসায়ুকি ওওনিশি। তার নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপিটি আমি তাঁর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলাম। আজও সেটিকে সযত্নে রক্ষা করছি।

এই সময়ে প্রধানত তামোৎসু নাগাইয়ের উৎসাহে বাংলা ভাষার ছাত্রছাত্রীরা নতুন একটি সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনে উদ্যোগী হন। ঠিক হয়, পত্রিকাটির বিষয়বস্তু হবে ভারতীয় সাহিত্যের জাপানি অনুবাদ। এটিকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নয়, যথেষ্ট সংখ্যক লেখা জমলে তবেই প্রকাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, প্রথম

থেকে এ-ই ছিল পরিকল্পনা। যতদূর মনে পড়ে, অধ্যাপক নারা-ই এটির নামকরণ করেন ''কল্যাণী''।

কল্যাণী এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে কিনা ঠিক জানিনা, কিন্তু এতে বাংলা সাহিত্যের যে-সব অনুবাদ অথবা ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক যে-সব প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে, আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে তা অতি উচ্চ মানের। আমার কিছু কিছু জাপানি বন্ধুর বাংলা ভাষার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই, তাঁদের আমি কল্যাণীতে প্রকাশিত অনুবাদ পড়িয়েছি। তাঁরা সকলেই অনুবাদের প্রশংসা করেছেন। এখানে একটি কথা বিশেষত উল্লেখ্য। ঠিক কোন বছর থেকে মনে করতে পারছি না, বোধহয় আটের দশকের মাঝামাঝি জাপানের কোনও একটি প্রকাশক রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে চয়ন করে গল্প, কবিতা ইত্যাদি জাপানিতে অনুবাদ করান, এবং সেই অনুবাদ ছাপিয়ে বহু খণ্ডে বিস্তৃত সুদৃশ্য এক সঙ্কলন বার করেন। জাপানিতে অনুবাদ কিন্তু এ-সঙ্কলনটিতে সব সময়ে সরাসরি বাংলা থেকে হয় নি, পূর্ব প্রকাশিত ইংরিজি অনুবাদ থেকেও হয়েছিল। এমনই একটি ইংরিজি থেকে জাপানিতে অনুবাদিত ছোটগল্প এবং তার পাশাপাশি কল্যাণীতে প্রকাশিত সরাসরি বাংলা থেকে জাপানিতে সেই গল্পেরই অনুবাদ আমি আমার অন্তরঙ্গ কতিপয় বিদগ্ধ জাপানি বন্ধুকে পড়িয়েছিলাম। তাঁরা সকলেই রায় দিয়েছিলেন, কল্যাণীর অনুবাদ সর্বাংশে শ্রেয়।

কল্যাণীর প্রথম সংখ্যাটি হাতে লিখে কপি করানো হয়েছিল। তারপর কয়েক সংখ্যা থেকেই পত্রিকাটি ছাপার অক্ষরে বেরোতে শুরু করে। দ্বিতীয় সংখ্যাটি আমার সংগ্রহে নেই, কিন্তু তৃতীয়টি আছে। এটিতে সঙ্কলিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রের প্রতি, চঞ্চলা, সমুদ্র, দেউল, কন্টকের কথা, অচল স্মৃতি, ক্ষুদ্র আমি, ও মুক্তির জাপানি অনুবাদ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সংখ্যায় কলকাতার উপর লেখা মাসায়ুকি ওওনিশির একটি ভারি সুন্দর প্রবন্ধ বার হয়েছিল।

সপ্তম সংখ্যায় পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের ধুলামন্দির, শিশুতীর্থ, জগৎ পারাবারের তীরে, পুরোনো বট, ও নদী কাব্যের অনুবাদ। এর মধ্যে শিশুতীর্থ অনুবাদের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল অনুবাদক মাসায়ুকি ওওনিশির একটি মনোজ্ঞ আলোচনা।

তামোৎসু নাগাইয়ের প্রসঙ্গ আগেই উঠেছে এ-লেখায়। কল্যাণীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর অনুবাদে পথের পাঁচালী পরে পুস্তকাকারে বার হয়।

এক সময়ে আমি বঙ্গসাহিত্য পাঠচক্রের (মূল জাপানিতে বেংগারু বুনগাকু দোকুশোকাই) বৈঠকে নিয়মিত হাজিরা দিয়েছি, কিন্তু পরে বোধহয় কল্যাণীতে সদস্যদের একক অনুবাদই প্রকাশিত হয়েছে, বৈঠকে জড়ো হওয়ার আর প্রয়োজন হয় নি। তবে সদস্যদের কারও কারও সঙ্গে পরেও প্রায়ই দেখা হয়েছে আমার, কারও সঙ্গে কদাচিৎ। শেষোক্তদের মধ্যে ছিলেন তামোৎসু। তাঁর সঙ্গে অনেক কাল পরে একবার দেখা হয়েছিল কানদা অঞ্চলে এক সন্ধ্যায়। তার পর চক্রের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আমারই বাড়িতে। আমাকে বিদায় দিতে এসেছিলেন তিনি। আমার তখন জাপান ছেড়ে যাবার দিন আগত।

কে জানত তামোৎসু আমাকে নয়, আমিই সেদিন তামোৎসুকে বিদায় দিয়েছিলাম চিরদিনের জন্য।

আমেরিকা প্রবাসে বছর পাঁচেক কাটলে একদিন ভোর সকালে ফোন বেজে উঠল : ওদিকে দোকুশোকাইয়ের সদস্য কাজুহিরো ওয়াতানাবে। তিনিই জানালেন, তামোৎসু আর নেই।

এখনও তামোৎসুর চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ছোটখাট আত্মভোলা মানুষটি। মনে পড়ে বাংলাদেশে তোলা একটি ছবিতে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন। আমার বিশ্বাস এ-ছবিতেই ফুটে উঠেছিল প্রতিভাবান এই মানুষটির সত্য পরিচয়। ❑

বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য)

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সন্ধানে

- শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক অসাধারণ গুণগত পরিবর্তন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় এবং বিংশ শতাব্দীতে পরিপূর্ণতা অর্জন করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের দরবারে প্রথম সসম্মান স্বীকৃতি অর্জন করে বলা যায়। সাহিত্য ও ভাষার এই অগ্রগতিকে পরস্পরের সম্পূরক হিসেবেই দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে সব ভাষাবিদ্ , লেখক ও সাহিত্যিক - বিশেষত কাব্য-সাহিত্যিক এই পরিবর্তনের পুরোধা ছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগই অল্প-বিস্তর "রবীন্দ্র-বলয়ের" অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। যাঁদের সাহিত্যসৃষ্টিতে স্বকীয়তার ছাপ স্পষ্টতর তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অগ্রগণ্য বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের মত নজরুলেরও বিচরণ সাহিত্য ও সঙ্গীতের বহুতর সরণিতে। নজরুল ছাড়া অন্য কোনও বাঙ্গালী সাহিত্য ও সঙ্গীতস্রষ্টা এত বিচিত্র পথে রবীন্দ্রনাথের সহগামী বোধহয় হতে পারেন নি। এ কথা অনুধাবন করেই হয়ত রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে এক বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহের চক্ষে দেখতেন।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল, আপাতদৃষ্টিতে এই দুই কবি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ। বয়েসের হিসেবে দু জন দুই প্রজন্মের। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১-তে , নজরুলের ১৮৯৯। একজন সুপরিচিত, অভিজাত, সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের সন্তান ; অন্যজন অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্র পরিবারের "অভাগা", যাঁর ডাকনাম দুখুমিয়া ! তাই নজরুলের সাহিত্য প্রতিভার ব্যাপ্তি ও গভীরতা , তাঁর উদার সমাজ-সচেতনতা এবং বিদ্রোহী রাজনৈতিক ভূমিকা বিশেষভাবে বিস্ময়কর।

প্রসঙ্গত এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে নজরুলের সাহিত্যজীবনের বিস্তৃতি মাত্র দুই দশকের মত , রবীন্দ্রনাথের ছয় দশকেরও বেশী। নজরুলের এই বহুমুখী প্রতিভা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন চারিত্রিক দৃঢ়তাকে রবীন্দ্রনাথ সস্নেহ এবং সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ও অভিবাদন জানিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। নজরুলও এই সর্বজন-শ্রদ্ধেয় মানুষটিকে গুরুর আসনে বসিয়ে শুধু তাঁর সাহিত্যই নয়, তাঁর জীবন-দর্শনের থেকেও অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। এই প্রবন্ধে আমি স্বল্প পরিসরে এই দুই বাঙ্গালী মনীষীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু তথ্য নিবেদন করতে চেষ্টা করছি।

এই দুই বাঙ্গালী কবি দেশ ও সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি এবং চিন্তাধারার দ্বারা একদিকে যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি জীর্ণ-পুরাতনকে বদলে যুগোপযোগী , নুতন এবং কুসংস্কারমুক্ত চিন্তাধারা নিয়ে আসার কাজেও তাঁরা ছিলেন সচেতন এবং উদ্যোগী। এই দিক থেকে তাঁরা একই পথের পথিক। তরুণ বয়সে শিল্পস্রষ্টা, ভাবুক-কবি রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনদর্শন এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন – "না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে / মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে / কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে / মাগিছে তেমনি সুর। কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা / কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা / বিদায়ের আগে দু-চারিটা কথা / রেখে যাব সুমধুর ।।" কবিসুলভ সহজ-সুন্দর, কিন্তু গভীর আকাঙ্খা। বাঙ্গালীমাত্রই মনে প্রাণে জানবেন রবীন্দ্রনাথ এই প্রকাশের ব্যথা মেটাবার প্রতিশ্রুতি তাঁর বিশাল সাহিত্য-সৃষ্টিতে, চিঠিপত্রে, এমন কি তাঁর দৈনন্দিনের কথোপকথনের মাধ্যমে কতটা পালন করে গেছেন।

অন্যদিকে যুবক নজরুলের কঠোর জীবনসংগ্রাম তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছে তার থেকে তিনি হয়ে উঠেছেন বিদ্রোহী। তাঁর জীবনদর্শন তিনি জানালেন বিপ্লবীর ভাষায় – "মহাবিদ্রোহী রণ ক্লান্ত / আমি সেই দিন হব শান্ত / যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না। অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ - ভীম রণভূমে রণিবে না ।।" সংবেদনশীল বাঙ্গালী নজরুলের এই প্রতিশ্রুতিরও উৎস এবং তাৎপর্য বুঝতে পারবেন।

দীর্ঘ কর্মব্যস্ত জীবনে রবীন্দ্রনাথকে বহুবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। তিনি ভাবুক কবি-সাহিত্যিকের ভূমিকার বাইরে এসে দেশের প্রতি এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি তার নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে বার বার অগ্রণী হয়েছেন। নজরুল রাজনীতির জগতের এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলেন, তাই তাঁর বিপ্লবী জীবনদর্শন তাঁর রাজনৈতিক কাজ কর্মের পরিপূরকই ছিল।

আসল প্রসঙ্গে আসা যাক্। ঠিক কখন রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের প্রথম সাক্ষাত হয় তা নিয়ে মতের বিভিন্নতা আছে , তবে তরুণ বয়সে নজরুল রবীন্দ্রনাথের গান এবং কবিতা সভা-সমিতিতে গাইতেন বা আবৃত্তি করতেন, এ কথা সমসাময়িক অনেকে বলেছেন। ১৩২৮ (১৯২১) সালের তেসরা আষাঢ় নজরুলের প্রথম বিয়ে হয় কুমিল্লার নার্গিস আসার খানম নামের এক মহিলার সঙ্গে। এই বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুই লাইন – "জগতের পুরোহিত --তুমি যে জগত মাঝারে / এক চায় একেরে পাইতে / দুই চায় এক হইবারে " -- ব্যবহার করা হয়েছিল দেখা যায়।

কবি সত্যেন দত্ত রবীন্দ্রনাথকে বর্ণনা করেছিলেন "বঙ্গের

মাথার মনি, ভারতের বৈজয়ন্ত হার" বলে । তিনি সারাদেশে "গুরুদেব" বলে পরিচিত , তাই সুদূর গ্রামের ছেলে নজরুলও যে তাঁর ভক্ত হবেন এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও যে এই অজানা কবিযশোপ্রার্থীর কবিতার সঙ্গে শুধু পরিচিতই ছিলেন তাই না , তাঁর গুণগ্রাহীও ছিলেন তার খবর পাওয়া যায় সত্যেন দত্তের সঙ্গে নজরুলের প্রথম দিকের পরিচয়ের একটি বর্ণনায় । সত্যেন দত্ত কলকাতায় তাঁর নিজের এবং নজরুলের বন্ধু গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে নজরুলকে জানান যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে নজরুল সম্বন্ধে খবর নিয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে তিনি নজরুলের "আশা" কবিতাটি (যার শেষের স্তবকটি এই রকম –"বনের ফাঁকে দুষ্টু তুমি / আসবে যাবে নয়না চুমি / সেই সে কথা লিখছে হোথা / দিগ্বলয়ের অরুণ লেখা" ।) পড়ে এর মধ্যে ফারসি কবি হাফেজের "Mysticism"এর ছোঁয়া পেয়েছেন। এই কবিতাটি "প্রবাসী" পত্রিকার ১৩২৬ (১৯১৯) এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল । নজরুল স্বভাবতই এই অপ্রত্যাশিত সুখবরে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন ।

নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতাটি শুধু বাংলাই নয় বিশ্বসাহিত্যেও এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে বলা যায় । ইংরেজ কবি টমাস গ্রে যেমন "এলিজি রিটেন্ ইন্ আ কান্ট্রি চার্চইয়ার্ড" নামের একটা কবিতার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন , নজরুলও যদি শুধু "বিদ্রোহী" কবিতাটিই লিখে যেতেন, তাহলেও বাংলা সাহিত্যে তিনি হয়ত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন ।

এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় "মোসলেম ভারত" নামের একটি পত্রিকায় , ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে । কিন্তু এর আলোড়নসৃষ্টিকারী আত্মপ্রকাশ ঘটে "বিজলী " পত্রিকার জানুয়ারী ১৯২২ এর সংখ্যায় এর দ্বিতীয় মুদ্রণে । শোনা যায় শুধু এই কবিতাটি পড়ার জন্য দলে দলে মানুষ "বিজলী " অফিসে ভিড় করেছিল পত্রিকাটি কিনতে ! এর আগে ১৯২১এর শেষের দিকে ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন । শহীদুল্লাহ সাহেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় করাতে গিয়ে বলেন যে ট্রেনে শান্তিনিকেতন আসার পথে নজরুল গীতাঞ্জলির গানগুলি একটার পর একটা তাঁকে গেয়ে শুনিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ সহাস্য সকৌতুকে এই তথ্যটি শোনেন এবং নজরুলকে বলেন তাঁর নিজের একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে । নজরুল বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর "আগমনী " কবিতাটি আবৃত্তি করেন । বিশ্বভারতীর অতিথি হিসেবে এই দুই রবীন্দ্র-ভক্ত শান্তিনিকেতনে দিন-দুই কাটিয়েছিলেন , এবং হয়ত আরও এক-আধবার গুরুদেবের সাথে তাঁদের সাক্ষাতের সুযোগ হয়ে থাকবে ।

এই চাক্ষুস পরিচয়ের সূত্র ধরেই বোধহয় নজরুল তাঁর "বিদ্রোহী" কবিতাটি "বিজলী" পত্রিকায় প্রকাশিত হবার দু-এক দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে নিজ কণ্ঠে তা পড়ে শোনানোর জন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে হাজির হন এবং কবিতাটি পড়ে শোনান । প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা জানান, এবং তাঁর ভবিষ্যত সাফল্য কামনা করেন ।

১৯২২এর অগাষ্ট মাসে নজরুল "ধূমকেতু" নামে একটি অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা চালু করেন । রবীন্দ্রনাথের কাছে চেয়ে-পাঠানো আশীর্বাণী আসে এই চিঠিতে ।

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু,

"আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু / আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু / দূর্দিনের এই দুর্গশিরে / উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন । অলক্ষণের তিলকলেখা / রাতের ভালে হোক না লেখা । জাগিয়ে দে রে চমক মেরে / আছে যারা অর্ধচেতন ।"

এই বাণীটি নজরুল ধূমকেতুর শুধু প্রথম সংখ্যাতেই নয়, প্রতিটি সংখ্যায় ছাপতেন । এই পত্রিকাটি ছিল নজরুলের সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত বিপ্লবী চিন্তার ধারক এবং প্রচারমাধ্যম । রবীন্দ্রনাথ তাই একে আশীর্বাদ জানাতে দ্বিধা করেন নি । মজার ব্যাপার হল যে ধূমকেতু পর্ব এখানেই শেষ নয় । একে কেন্দ্র করে ১৯২৩এর জানুয়ারী মাসে রাজদ্রোহীতার অভিযোগে নজরুলের এক বছর জেল হয় । জেলখানার নানাবিধ অব্যবস্থা এবং তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে হুগলি জেলে স্থানান্তরিত করার হুকুমনামার প্রতিবাদে নজরুল অনশন শুরু করেন । শিলংএ বসে এই খবর পেয়ে বিচলিত রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে টেলিগ্রাম পাঠান অনশন বন্ধ করার উপরোধ জানিয়ে এই ভাষায় – "give up your hunger strike , our literature claims you."

টেলিগ্রামটি অবশ্য নজরুলের হাতে পৌঁছায় নি কারণ তাঁকে ইতিমধ্যেই হুগলি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষ একজন রাজদ্রোহীকে পাঠানো টেলিগ্রাম নিয়ে মাথা ঘামাতে উদ্যোগী হবেন না এটাই স্বাভাবিক !

কিন্তু নজরুলের এই প্রথম জেলজীবন তাঁর কাছে নিশ্চয় অবিস্মরণীয় হয়ে ছিল অন্য এক অভাবিত ঘটনায় । ১৯২৩এর ফেব্রুয়ারী মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাটিকা "বসন্ত" নজরুলকে উৎসর্গ করেন । প্রাণবন্ত, উচ্ছল যুবক নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় বসন্তের মূর্ত প্রতীক মনে করেই "বসন্ত" নামের রচনাটি তাঁর নামে উৎসর্গ করে থাকবেন । উল্লেখ্য, জীবনে আরও একবার রবীন্দ্রনাথ বসন্তের প্রতীক "ঋতুরাজ" বলে যাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি ছিলেন জওহরলাল নেহেরু ।

তেইশ বছর বয়সের তরুণ কবিকে ষাটোর্ধ নোবেলবিজয়ী কবি-সম্রাট তাঁর নবতম সাহিত্যসৃষ্টি সস্নেহে উপহার দিচ্ছেন এটা নজর-কাড়া ঘটনা বটেই । উৎসর্গের লিপিটুকুও তাৎপর্যপূর্ণ – "শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু" । নজরুল-সুহৃৎ পবিত্র গাঙ্গুলীও রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ছিলেন । তাঁরই মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ "বসন্ত"এর একটি কপি নিজের হাতে লেখা উৎসর্গ-লিপি সমেত পাঠান আলিপুর জেলে । পবিত্র গাঙ্গুলী নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের এই "কবি" সম্বোধন নজরুলের "কবি-স্বীকৃতি" বলে বর্ণনা করেছেন । নজরুলের তরুণ বয়সের এই অসামান্য খ্যাতির অন্যতম ফলশ্রুতি হয়েছিল ঈর্ষান্বিতদের নিন্দাবাদ । তাঁর নানা কবিতার স্থূল প্যারোডি কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত প্রায়ই । রবীন্দ্রনাথকেও এই ধরণের নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে , এমন কি তাঁর পরিণত বয়সেও । হয়ত তাই তিনি নজরুলকে সর্বজন সমক্ষে এই কবি-স্বীকৃতি দেন নিন্দুকদের প্রতি প্রচ্ছন্ন সাবধান বাণী হিসেবে ।

পবিত্র গাঙ্গুলী বইটি নজরুলকে পৌঁছে দিতে গিয়ে নজরুলের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিমূঢ় হয়ে যান । নজরুল বইটি বুকে ধরে উল্লাসে এমন নৃত্য করতে শুরু করেন যে জেলের অনেক কর্মচারী কি ব্যাপার দেখতে দৌড়ে আসেন ! নজরুল পরে এ কথাও বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের ওই সস্নেহ উৎসর্গবাণী তাঁকে জেলজীবনের দুঃখ-জ্বালা সহ্য করতে সাহায্য করেছিল । অনেকে মনে করেন যে নজরুল তাঁর বিখ্যাত কবিতা "আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে" র অনুপ্রেরণাও এই বাণী থেকে পেয়েছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনও বই নিজের পারিবারিক-বলয়ের বাইরে কাউকে উৎসর্গ করেন । এর পরে যাঁদের তিনি অন্যান্য বই উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র , দেশনায়ক নেতাজী সুভাষ , অধ্যাপক সত্যেন বসু প্রমুখ দিক্‌পালেরা ।

১৯২৫ সালে নজরুলের রাজনৈতিক গুরু-স্থানীয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মারা যান । তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ পার্টির বাম-ঘেঁষা একটি গোষ্ঠী শ্রমিক-স্বরাজ পার্টি নাম নিয়ে "লাঙ্গল" নামে একটি পত্রিকা চালু করেন নজরুলের পরিচালনায় । আবারও নজরুল রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হন আশীর্বাণীর আব্দার নিয়ে । রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিরাশ করেন না, লিখে পাঠান – "জাগো, জাগো বলরাম -- ধর তব মরুভাঙ্গা হল / প্রাণ দাও, শক্তি দাও / স্তব্ধ কর ব্যর্থ কোলাহল ।।" এই পত্রিকাটি পরে নাম পাল্টে "গণবাণী" নামে বেশ কয়েক বছর চলেছিল এবং নজরুলের সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল ।

ইতিমধ্যে ১৯২৪ সালে নজরুলের বিয়ে হয় কুমিল্লারই আরেক কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তর সঙ্গে । এঁর মা বিরজাসুন্দরী দেবীকে নজরুল "গুরু-মা" বলে সম্ভাষণ করতেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে "মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)র শ্রীচরণারবিন্দে --" নামের শ্রদ্ধাবেগাপ্লুত কবিতাটি রচনা করেছিলেন ১৯২৬ সালে ।

সাহিত্য এবং সঙ্গীতসাধনায় নজরুলের বিশ এবং ত্রিশের দশক অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটে ঠিকই, কিন্তু অর্থকষ্ট এবং দারিদ্র তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে । একদিকে প্রকাশকদের প্রায়শ-বঞ্চনা, অন্যদিকে বন্ধুবান্ধবের নিঃস্বার্থ বদান্যতা ছিল নজরুলের দৈনন্দিন জীবনের পাথেয় স্বরূপ । এই নিত্য অর্থকষ্ট থেকে কিছুটা মুক্তি দেওয়ার অভিপ্রায়েই তাঁর বন্ধু মহম্মদ নাসিরউদ্দিন নজরুলকে তাঁর বহুল-প্রচলিত "সওগাত" পত্রিকায় নিয়মিত বেতনের একটা সাংবাদিকতার কাজ দেন ১৯২৫ সালে । এই পত্রিকায় ইতিপূর্বেই নজরুল তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশ করেছেন । সাম্প্রদায়িকতামুক্ত উদার সামাজিক চিন্তার প্রসারে এবং বাংলার নারীজাগরণের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটির অবদান অবিস্মরণীয় । বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, কামিনী রায় এবং মানকুমারী বসুর মত মুক্তমনা মহিলা সাহিত্যিকেরা এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন । নাসিরউদ্দিন সাহেবের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথও "পথের সাথী" নামে একটি সুন্দর এবং অর্থবহ কবিতা এই পত্রিকার জন্য লিখেছিলেন । তিনি পত্রিকাটির "সওগাত" ("উপহার") নামকরণ নাসিরউদ্দিন সাহেবের সুরুচির পরিচয় বলে প্রশংসা করেছিলেন ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের পত্রবিনিময় নিয়মিত চলতে থাকে, এবং কখনও-সখনও দেখা-সাক্ষাতও । ১৯২৮ সালে নজরুল তাঁর কবিতাসংগ্রহ "সঞ্চিতা" প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে – "বিশ্বকবিসম্রাট শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী শ্রী চরণারবিন্দেষু" ।

১৯২৯ সালে কলকাতায় ৩০ বছরের যুবক নজরুলকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হয় "সওগত" পত্রিকা গোষ্ঠীর উদ্যোগে এবং বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে । সাহিত্যিক এবং ব্যারিস্টার এস্ ওয়াজেদ আলী সম্বর্ধনা লিপিটি পাঠ করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না , কিন্তু তাঁর সম্মতি এতে ছিল । (নেতাজী) সুভাষ চন্দ্র নিজে উপস্থিত থেকে নজরুলকে অভিনন্দন জানান ।

১৯৩০এর দশকে নজরুল কলকাতার মঞ্চ-নাটক এবং সিনেমার জগতে প্রবেশ করেন বিভিন্ন ভূমিকায় । কখনও চিত্রনাট্য লেখায়, কখনও সঙ্গীত পরিচালক এবং গীতিকার হিসেবে, কখনও বা অভিনয়ে । ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথের "গোরা" উপন্যাস সিনেমার পর্দায় আসে , সঙ্গীত পরিচালক নজরুল । কথিত আছে যে বিশ্বভারতীর কয়েকজনের আপত্তি সত্ত্বেও নজরুল এই দায়িত্ব পান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় ।

১৯৩০ সালে নজরুলের শিশুপুত্র বুলবুল মারা যায় । অর্থকষ্টের সঙ্গে এই শোকও নজরুলের সৃজনীশক্তিকে দমাতে পারে নি । তিনি অসুস্থ শিশুর সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে কবি হাফেজের ফারসি রচনার বাংলা অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছিলেন । ১৯৩১ সালে "বর্ষবাণী" পত্রিকার সম্পাদক জাহানারা বেগম নজরুলকে কিছুদিন বিশ্রাম দেওয়ার জন্য দার্জিলিং নিয়ে যান । ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর পরিবারের কয়েকজন সমেত দার্জিলিংএ ছিলেন । নজরুল কবির সঙ্গে দেখা করতে যান কয়েকবার । প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন যে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ নজরুলের সান্নিধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তেন । তিনি নিজে এবং তাঁর বহু গানের সুরকার ভাইপো দীনেন্দ্রনাথ নজরুলের সঙ্গে সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন । নজরুলের আরবীয় এবং পারসিক সঙ্গীতধারার সাথে পরিচিতি ছিল । এদের সঙ্গে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনায় এই তিন সঙ্গীতসাধক দার্জিলিংএর মনোরম পরিবেশে মেতে উঠেছিলেন হয়ত । রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখেন , কিন্তু নজরুল বোধহয় আর কখনও শান্তিনিকেতন গিয়ে উঠতে পারেন নি ।

সাংবাদিক নজরুল তাঁর সব পত্রিকাকেই রবীন্দ্রনাথের স্পর্শধন্য করতে চেয়েছেন । ১৯৩৫ সালে "নাগরিক" পত্রিকার জন্য উপরোধ পৌঁছল অসুস্থ কবির কাছে । তিনি বয়স এবং অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন এমন একটি স্নেহমাখা চিঠিতে যে আবেগাপ্লুত নজরুল "তীর্থপথিক" নামে একটি কবিতার মাধ্যমে কবির কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলেন । কবিতাটির প্রথম দুই লাইন এই রকম – "হে কবি, হে ঋষি অন্তর্যামী / আমায় করিও ক্ষমা । পর্বতসম শত দোষত্রুটি ও চরণে হল জমা ।।"

নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই সুরসিক মানুষ ছিলেন এ কথা তাঁদের লেখা এবং কথোপকথনের মধ্যে দেখা যায় । তাই নজরুল তাঁর গুরুদেবটিকে শুধু যে শ্রদ্ধা নিবেদনই করতেন তা নয়, অনেক সময় তাঁকে নিয়ে তামাশা করতেও ছাড়তেন না । একবার নজরুলের কানে এল যে রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন "সাহেব" অতিথিদের সঙ্গে

খাওয়া দাওয়া করেছেন। নজরুল লিখলেন "কালোতে ধলোতে মিলেছে ভাল / মন্দ-মধুর হওয়া। আমি দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন ডিনার খাওয়া।" ইংরেজ শাসকের জেলখানা ব্যবহারের ঘটা দেখে নজরুল লিখলেন "তোমারই জেলে পালিছ ঠেলে / তুমি ধন্য ধন্য হে"। আরেকবার নজরুল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। প্রথা মত পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে বলে উঠলেন নিজেরই একটি কবিতার প্যারোডি করে "দে গুরুর পা ধুইয়ে" !

১৯৩০এর শেষার্ধ বাংলা, ভারত তথা সারা বিশ্বের রাজনৈতিক জগতের এক উত্তাল সময়। ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি শুরু হয় এই সময় থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি যা আগেই শুরু হয়েছিল ইউরোপ এবং জাপানে, তার করাল ছায়া বাংলা ও ভারতেও পড়তে শুরু করে এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগের সম্ভাবনাও আলোচিত হতে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথের শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে মানসিক উদ্বেগও বাড়তে থাকে। তিনি হিন্দু-মুসলমানের এই ক্রমবর্ধমান বিভেদ যে জাতির চরম বিপদের কারণ হবে এটা বুঝে রাজনৈতিক নেতাদের এবং দেশের সাধারণ মানুষকে সাবধান করার চেষ্টা করেন বিভিন্নভাবে। ত্রিশের দশকেই তিনি "কালান্তর" গ্রন্থে মুসলমান প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করেন; রচনা করেন তাঁর "মুসলমানীর গল্প" নামের বিখ্যাত ছোট গল্পটি।

নজরুল ইতিমধ্যে কিছুটা আর্থিক সাচ্ছল্য অর্জন করেছেন, এবং সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীত ও অভিনয়ের জগতে জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ১৯৩০এর দশক নজরুলের সাহিত্য জীবনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ সময় বলা যায়। তাঁর অনেক লেখাতেই তিনি হিন্দু-মুসলিম বিভেদের বিরুদ্ধে লিখেছেন এবং এর কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর উদার জীবনদর্শন এবং ধর্মীয় সহনশীলতার বার্তা এক দিকে যেমন তাঁকে সুশীল সমাজে জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল, অন্য দিকে তেমনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে, রক্ষণশীল সমাজ তাঁকে নিষ্ঠুর সমালোচনায় জর্জরিত করে তুলেছিল। তিনি এক সময় এই ধরণের মনোবৃত্তিকেই "জাতের নামে বজ্জাতি" বলে তিরস্কার করেছিলেন।

১৯৩৮ সালে নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে যান। তাঁর চিকিৎসার জন্য নজরুলকে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে হয়। তিনি নিজেও নানা ভাবে শারীরিক অস্বস্তি ভোগ করছিলেন। তাঁর কথায় অসংলগ্নতা এবং জড়তা লক্ষ্য করছিলেন বন্ধু-বান্ধবরা, কিন্তু তিনি এগুলি গ্রাহ্য না করে পারিবারিক কর্তব্য পালনে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

১৯৪১ সালে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অশীতিতম জন্মদিন পালন করেন এবং মানবজাতির, মনুষ্যত্বের প্রতি তাঁর চিরন্তন বিশ্বাস জানিয়ে যান "সভ্যতার সঙ্কট" প্রবন্ধের মাধ্যমে। নজরুল কবির জন্মদিন ২৫শে বৈশাখে তাঁকে অভিনন্দন জানান "অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি" নামে একটি সুন্দর কবিতার মাধ্যমে, যার শুরুটি এই ভাবে – "চরণারবিন্দে লহ অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি / হে রবীন্দ্র, তব দীন ভক্ত এ কবির। অশীতি বার্ষিকী তব জন্ম উৎসবে / আসিয়াছি নিবেদিতে নীরব প্রণাম ।।"

২২শে শ্রাবণের মেঘলা দিনে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কর্মময় জীবনের অবসান হয়। নজরুল প্রায় পিতৃহারা হয়ে যান। তাঁর অনুজপ্রতিম বন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রপতি আবু সৈয়দ চৌধুরী নজরুলকে শোকে মুহ্যমান এবং বাক্যহারা অবস্থায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। নজরুল ওই দিনেই তাঁর রবীন্দ্রপ্রয়াণের প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন "রবিহারা" কবিতার মাধ্যমে। অল ইন্ডিয়া রেডিওর আমন্ত্রণে নজরুল কবিতাটি সারা বাংলার শ্রোতাদের জন্য আবৃত্তি করেন। এর পর আরও দুটি কবিতা নজরুল সদ্যপ্রয়াত রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন যেগুলির নাম "সালাম অস্তরবি" এবং "ঘুমাইতে দাও ক্লান্ত রবিরে"।

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে যায়। এর পরের অধ্যায় অবশ্যই আরও করুণ। নির্বাক, মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় কবি দীর্ঘ ৩৪ বছর কাটিয়ে ১৯৭৬ সালে মারা যান।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দুই দশকের সম্পর্ক ছিন্ন হয় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে। কিন্তু তাঁর নিজের জীবনের যে করুণ পরিণতি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে নেমে আসে তা ছিল নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। ধর্মীয় এবং সামাজিক সকল কুসংস্কারের ঊর্ধে থেকে এই অসমসাহসী মানুষটি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী এবং সমস্ত বঞ্চিত সর্বহারা মানুষের নিতান্ত আপনজন। এই বিচারে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন বলা যায়।

(লেখকের বক্তব্য -- আমি সাহিত্যিক নই, ভাষাবিদ্ নই, এমন কি সাহিত্যের ছাত্রও নই। আমার পেশা অর্থনীতির অধ্যাপনা। বাংলা আমার মাতৃভাষা বটে , কিন্তু আমি চার দশকের ওপর বাংলার বাইরে বসবাস করছি। তাই দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ভাষার ব্যবহারও আমার সীমিত। তা সত্ত্বেও যে এই প্রবন্ধটি লেখার উচ্চাকাঙ্খা হল তার কৈফিয়ত এই যে আমি রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের ভক্ত। এঁদের জীবনদর্শন এবং সাহিত্য অনেক বাংলা ভাষাভাষীর মত আমাকেও আনন্দ এবং শান্তি দেয়। তাই এঁদের সম্বন্ধে গুণীজনের লেখা হাতে এলে তা সংগ্রহ করে রাখার একটা অভ্যাস অনেক দিন ধরেই আছে। সেই সব সংগ্রহের ওপর এবং নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করেই এই প্রবন্ধটি লিখলাম। পাঠকদের মধ্যে অনেকেই আমার চেয়ে এই দুই কবির সম্বন্ধে বেশী জানবেন , আমি তাঁদের কাছে মার্জনা চাইছি।) ❑

গানের রবীন্দ্রনাথ

- ডঃ অনিতা চৌধুরী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১-তে। আগামী বছরে তাঁর সার্ধশতবার্ষিক জন্ম জয়ন্তীতে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আমার বাল্যবয়সে স্কুলে, পাড়ার ক্লাবে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবির কবিতা আবৃত্তি করে, নাচে, গানে, নৃত্যনাট্যে কবির রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটল। পরে গরমের ছুটির দীর্ঘ অবসরে বাড়ীতে বাবার ও দাদার নিজস্ব লাইব্রেরীতে কবির ও অন্যান্যদের লেখা পড়ে তাঁর অন্য অন্য রূপের পরিচিতি বিস্মিত করল। তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলি পড়ে মনে হল, তিনি শুধু গল্প লিখে গেলেই পারতেন। দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি , গীতিকার, নাট্যকার, ছোটগল্প লেখক নন, তিনি ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকারও ; আর কত রকমের প্রবন্ধ -- সাহিত্যচিন্তা, স্বদেশভাবনা, ধর্মচিন্তা, শিক্ষাভাবনা, বিশ্বহিত ও শান্তি, দেশের কৃষক ও সাধারণ মানুষ, সমবায় প্রথা, হস্তশিল্প ইত্যাদি। কি চমৎকার পত্রলিখন – "ছিন্নপত্র" তুলনাহীন, দেশ-বিদেশের ভ্রমণ কাহিনীতে কত বিশ্লেষণ। তাঁর এই নানা দিকে প্রতিভার বিচ্ছুরণ যেন এক পলকাটা হীরের সঙ্গেই তুলনীয়। কিন্তু সবথেকে যা বেশী মুগ্ধ ও আপ্লুত করে তা তাঁর অতুলনীয় গান -- রবীন্দ্রসঙ্গীত। আর হৃদয়ের গভীরে ছুঁয়ে যায় পূজা পর্যায়ের গানগুলি।

ঠাকুরবাড়ীর পরিবেশে সঙ্গীতচর্চা ছিল। ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার পণ্ডিত যদুভট্ট তাঁর গুরু ছিলেন। সেখানে শেখা "ধ্রুপদ" গানের ভিত্তিতে পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুন নতুন গান রচনা করেছেন অনেক নমনীয়ভাবে। খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পারও ব্যবহার করেছেন গানে। পাঞ্জাবী টপ্পা ও নিধুবাবুর টপ্পার ধাঁচেও গান লিখেছেন। "কে বসিলে হৃদয়াসনে, ভুবনেশ্বর প্রভু" পাঞ্জাবী টপ্পার মতো হলেও তাতে নিজস্বতা ও নমনীয়তা লক্ষ্যনীয়।

বার বছর বয়সে, হিমালয়ের নির্জনে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে কেটেছে তাঁর বাল্যকালের কিছু সময়। ধ্যান, সঙ্গীত, উপনিষদ নিত্যসঙ্গী ছিল সেখানে -- উত্তরকালের "ব্রহ্মসঙ্গীত" তারই ফসল।

সারা ভারতের বিভিন্ন ভাষার সুর ও ভাব তাঁর সঙ্গীতে স্বকীয়তায় হাজির হয়েছে। ভজনের সুর, পাঞ্জাবী, তমিল, কন্নড়, গুজরাটি গানের সুর ও সকল কিছু নিয়ে নতুনভাবে গান তৈরী হয়েছে, যেগুলিকে বলা হয় "ভাঙ্গা গান" -- যেমন , "বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী " (তামিল)।

বিদেশী গানের সুর নিয়ে খুব অল্পবয়সেই গান রচনা করেন। স্কটিশ গানের সুরে "পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়", "ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে, বহে কিবা মৃদু বায়"। ১৮৭৯ - ৮০তে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে যান আইন পড়তে। সেই সময় শোনা ওখানকার নানা গানের সুর বা তার ছায়া পড়েছে ফিরে এসে "বাল্মিকী প্রতিভা", "কালমৃগয়া" ইত্যাদি নাটকের গানে ও অন্যান্য অনেক গানেও।

১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীর শিলাইদহ এস্টেটের দেখাশোনার দায়িত্ব পান পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। ওখানে থাকার সময় খুব নিকট থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষ, কৃষকের সংস্পর্শে এসেছেন। তখন তাঁদের সুখ-দুঃখ যেমন জেনেছেন, তেমনি মাটির কাছাকাছি লোকসঙ্গীতের সুরও তার মন ভরিয়ে দিয়েছে। শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে গগন হরকরা, ফকির ফিকিরচাঁদ ও সুনাউল্লা বাউল এসে গান শুনিয়ে যেত কবিকে। শান্তিনিকেতনে নবনীদাস বাউলের গানও কবিকে আনন্দ দিত। লালন ফকিরের গানও শুনেছেন পদ্মার ধারের মানুষের কাছে। এছাড়া ভাটিয়ালী, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, সারিগান -- এগুলিও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন অসংখ্য স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন এই সব সুর নিয়ে এবং জনসাধারণের হৃদয়ের কাছে পৌঁছে যায় তার উন্মাদনা। "আপনজনে ছাড়বে তোরে", "তা বলে ভাবনা করা চলবে না", "ও আমার সোনার বাংলা , আমি তোমায় ভালবাসি" ইত্যাদি।

"তাল" নিয়েও কবি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ও তিন চার রকমের নতুন তাল তৈরী করেছেন।

সারা জীবন ধরে বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ -- সেগুলিকে কতগুলি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে , যেমন ১) পূজা (ব্রহ্মসঙ্গীত সহ) ২) প্রকৃতি ৩) প্রেম ৪) স্বদেশ ৫) নাট্যগীতি ৬) কাব্যগীতি ৭) কীর্ত্তনাঙ্গ ৮) বিবিধ ৯) রাগাশ্রয়ী গান।

তবে একেবারে পরিস্কার ভাগ করা সম্ভব নয় -- অনেক সময় পূজার গান ও প্রেম পর্যায়ের গানের মধ্যে তফাৎ করা যায় না। কবি ঈশ্বরকে কখনও বলেছেন "জীবন-দেবতা", "পরাণ-বধূ", কখনও অচিন পাখির মতো, কখনও রহস্যাবৃত ঘোমটা পরা নারী, কখনও বা দারুণ দীপ্ত পুরুষ। সমস্ত ধর্মের নির্য্যাস নিয়ে নিজের মতো করে এক আড়ম্বরহীন নিবিড় আনন্দময় ঈশ্বরপ্রেম জন্ম নিয়েছে তাঁর মাঝে -- পূজার গানে গানে তারই প্রকাশ। যেমন, "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি"।

সমস্ত মানবজাতি এক অহিংস, শান্তিপূর্ণ সৌভ্রাত্রসূত্রে গাঁথা পড়ুক এও আছে গানে -- শান্তিনিকেতন আর বিশ্বভারতীর ভিত্তিও তাই – "যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্"।

"আজি শুভদিনে পিতার ভবনে" ব্রহ্মসঙ্গীত পূজা পর্যায়েই স্থান পায়। প্রকৃতি পর্যায়ে কবি সব ঋতু নিয়েই গান লিখেছেন – "নাই রস নাই, দারুণ দহনবেলা" (গ্রীষ্ম), "আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে" (শরৎ), "হিমের রাতের ওই গগনের দীপগুলিরে"

(হেমন্ত), "এলো যে শীতের বেলা" (শীত), "বসন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল" (বসন্ত) । কিন্তু সব থেকে বেশী গান লিখেছেন কবি বর্ষার --তাঁর প্রিয় ঋতুর – "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচে রে" কিম্বা "আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি মম জল-ছলো-ছলো আঁখি মেঘে মেঘে" ।

প্রেম পর্যায়েও বহু গান রয়েছে বর্ষার গানের মতোই প্রাণ ভরিয়ে দেবার, যেমন -- এই "উদাসী হাওয়ার পথে পথে" , "সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া" । স্বদেশ পর্যায়ের উদ্দীপনার গান – "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে" , "ও আমার দেশের মাটি" , "আমার সোনার বাংলা" আজ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। আমাদের ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে" কবির রচনা ।

নাট্যগীতির গানগুলিও আলাদাভাবে জনপ্রিয় । "ন্যায়অন্যায় জানি নে, জানি নে" (শ্যামা), "আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা (রাজা)" । কাব্যগীতির বেশীরভাগ গান সুগীত ও সকলের পছন্দের "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি" , "প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায় ফাগুন মাসে" , "খাঁচার পাখি ছিল" ইত্যাদি ।

কবি কীর্তনাঙ্গ গানগুলি রচনা করেন কীর্ত্তন গানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। অনেক গানে দোহার পর্যন্ত রেখেছেন – "ভালবেসে, সখী, নিভৃত যতনে" , "সখী, বহে গেল বেলা" ।

এছাড়া বহু গান রয়েছে নানা অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে । যেমন – "সদা থাকো আনন্দে" (বিয়ে উপলক্ষ্যে) , "হে নূতন, দেখা দিক আর-বার" (জন্মদিন), "তপের তাপের বাঁধন কাটুক" (বর্ষামঙ্গল), বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি । বিভিন্ন রাগাশ্রয়ী গানকেও অনেকে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ফেলেছেন । যেমন, "যতবার আলো জ্বালাতে চাই" (রাগ কামোদ), "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই" (রাগ কাফি)।

প্রথমে রবীন্দ্রসঙ্গীত শান্তিনিকেতন, ব্রাহ্ম সমাজ ও কলকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন, বিশেষতঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাখীবন্ধন, কংগ্রেসমেলার সময় থেকেই সাধারণ্যে বরণীয় হল রবীন্দ্রসঙ্গীত । সুগায়ক পঙ্কজ মল্লিক মহাশয় চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করে আরও বাড়িয়ে দিলেন তার জনপ্রিয়তা ।

অত্যন্ত শুদ্ধ উচ্চারণে, প্রকৃত সুর আরোপে, ভাষা ও ভাবের লীলায় সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত ঋদ্ধ । সেইসব বজায় রেখে গানের সুরে, কথায় ও ভাবে সকলকে ভাসিয়ে দিতে সুগায়ক ও গায়িকাদের অবদানও কম নয় -- শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সাগর সেন, সুবিনয় রায়, দেবব্রত বিশ্বাস, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, ঋতু গুহ, পূর্বা দাম, বনানী সেনগুপ্ত, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, রমা মণ্ডল, প্রমিতা মল্লিক, মোহন সিং, অনিরুদ্ধ বিশ্বাস, আশীষ ভট্টাচার্য্য, রণ গুহঠাকুরতা ও আরও অনেকেই সেই ধারা বয়ে নিয়ে চলেছেন । ওপার বাংলায়ও রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা প্রবল জোয়ারে চলেছে। ইউরোপ-আমেরিকাতেও রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার চাহিদা বাড়ছে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গায়ক-গায়িকারা নিয়মিত নিমন্ত্রণ পান সেখানে । "আজি হতে শতবর্ষ পরে"-তে কবির মনে অনিশ্চয়তা ছিল ও আকুলতা ছিল "তবু মনে রেখো"-তে ।

কিন্তু হে কবি, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, আনন্দে-মিলনে-বিরহে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালেই প্লাবিত হয়ে চলেছি সার্ধশতবর্ষ ধরে । ❑

রবীন্দ্রমানসের মানসীরা

- সুদীপ্তা রায়চৌধুরী

"প্রিয়ারে তব যে নাহি জানে / জানে সে তারে তোমার গানে / আপন চেতনায়" । তাঁর প্রিয়ার যে ছায়া বর্ষা মেঘের আকাশে ক্ষণে ক্ষণে ওঠে ভেসে, যে প্রিয়ার "আঁচল দোলে নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে" -- তারই পরিপূর্ণ অবয়ব গড়ে তোলার লোভ সম্বরণ করাটা রবীন্দ্র অনুরাগীদের পক্ষে বেশ শক্ত । রবীন্দ্র অনুরাগীদের অন্যতম একজন হয়ে সেই কবি মানসীকে অল্প অল্প করে মূর্ত্ত করার প্রয়াসে আমি মেঘমালা ।

জল খেয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেয় মেঘমালা । ২২শে শ্রাবণ উপলক্ষে রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত আজকের এই আলোচনা-সভার বিষয়বস্তু হল "নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা"-- যাতে আলোচিত হবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, পূজারী রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ, গীতিকার ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ, চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি । এমন একটা সভায় নানান প্রাজ্ঞজনের মধ্যে মেঘমালাকে নিতান্তই অর্বাচীন ভাবাটা অন্যায় নয়, তবুও সে আমন্ত্রণ পায় নবাগতা সাহিত্যিক হিসাবে । দক্ষিণ কলকাতায় বড় হয়ে ওঠা মেঘমালার প্রথম বন্ধু ছিল "সঞ্চয়িতা" -- বাবা দিয়েছিলেন । বলেছিলেন, "দেখো, সারা জীবন তোমার বন্ধু হয়ে থাকবে ।" কি আশ্চর্য্য ! তারপর থেকে অল্প অল্প করে ঢুকে পড়ে রবীন্দ্রচর্চার জগতে । নিজের অজান্তেই সুচরিতা বা লাবণ্যর আদলেই তৈরী হয়ে যায় মেঘমালার ব্যক্তিত্ব । পড়ার টেবিলের সামনে রাখা রবীন্দ্রনাথের সেই বিশাল ছবির সেই বক্ষবিদারণ দৃষ্টি মেঘমালার ভয়ঙ্কর এক দুর্বলতা । সেই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কতবার বলেছে সে "বৃষ্টিভেজা যে ফুলহার / শ্রাবণ সাঁঝে তব প্রিয়ার / বেনীটি ছিল ঘেরি, / গন্ধ তারি স্বপ্নসম / লাগিছে মনে, যেন সে মম / বিগত জনমেরই ।"

উন্মুখ শ্রোতাদের সামনে মেঘমালা বলে চলে -- রবীন্দ্রকাব্যে নারীরা বার বার এসেছে অসাধারণ মনন শক্তি ও বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্যের অধিকারিনী হয়ে । সেই মানসীর গলায় আত্মপ্রত্যয়ের সুর – "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার / কেন নাহি দিবে অধিকার / হে বিধাতা, নত করি মাথা / পথপ্রান্তে কেন রব জাগি / ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশা পূরণের লাগি / দৈবাগত দিনে ? / শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? / কেন নিজে নাহি লব চিনে সার্থকের পথ ?" হয়তো কবির অভিপ্রেত ছিল যে সেই মানসী প্রতিমা বলুক, "যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণি -- / আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী / বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন, / সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন ক্ষীণদীপ্তি গোধুলিতে ?" সেই একই আত্মপ্রত্যয়ের সুর শোনা যায় চিত্রাঙ্গদার কন্ঠে – "নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী, / পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্দ্ধে সে নহি নহি, / হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি / যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে / সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে / পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে ।" "পলাতকা" কাব্যগ্রন্থের মুক্তি কবিতার সেই নারী -- যার জীবন মানেই বিড়ম্বনা, তারও উপলব্ধি হল – "আমি নারী, আমি মহীয়সী, / আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী, / আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা, / মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা ।"

"শেষের কবিতার" "অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমা রাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত । --- ড্রইং রুমে এ মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দেয়না । লাবণ্যকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয়, সে সঙ্গে আছে মননের শক্তি । -- আর এইটেই অমিতকে এত করে আকর্ষণ করেছে । লাবণ্যর মুখে অমিত এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যা ওর শান্ত হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল ।"

"গোরা" উপন্যাসের গোরা "শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য, যে প্রগলভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখভঙ্গিতে তার আভাসমাত্র কোথায় ! তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহে প্রকাশিত, কিন্তু নম্রতা আর লজ্জার দ্বারা কি সুন্দর কি কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে । -- ভ্রুযুগলের উপর ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ ।" গোরার অনুভূতিতে -- ভারতের নারী প্রকৃতি সুচরিতা মূর্ত্তিতে তার সামনে প্রকাশিত । "ভারতের গৃহকে পুণ্যে সৌন্দর্যে ও প্রেমে মধুর ও পবিত্র করার জন্যই ইঁহার আবির্ভাব । গোরার কাছে নারী যখন অত্যন্ত ছায়াময় ছিল তখন দেশ সম্বন্ধে তাহার যে কর্তব্যবোধ ছিল তাহাতে কি একটা অভাব ছিল । যেন শক্তি ছিল কিন্তু প্রাণ ছিলনা । যেন পেশী ছিল কিন্তু স্নায়ু ছিলনা ।" সুচরিতার সান্নিধ্যে এসে গোরা উপলব্ধি করে যে "নারীকে আমরা যতই দূর করিয়া ক্ষুদ্র করিয়া জানিয়াছি, আমাদের পৌরুষও ততই শীর্ণ হইয়া মরিয়াছে ।" -- তারপর বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে গোরা ও সুচরিতা দুজনেরই দেশাত্মবোধ, ধর্ম ও জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে উপলব্ধি পায় পরিপূর্ণতার রূপ ।

"শাপমোচন" গীতিনাট্যে কুশ্রী-দর্শন অরুণেশ্বরকে ত্যাগ করে ফিরে এসেছিল কমলিকা; তারপর দীর্ঘ বিচ্ছেদে বিরহের দাবদাহে বিদগ্ধ কমলিকার হৃদয় যখন সেই অসুন্দরের মধ্যেই খুঁজে পায় সুন্দরকে, তখন তার প্রেম পায় পূর্ণতা । নাটকের শেষ দৃশ্যে হাতের প্রদীপের আলোয় অরুণেশ্বরকে অবলোকন করে কমলিকা অস্ফুটে বলে ওঠে "প্রিয় আমার, প্রভু আমার, একি অপরূপ রূপ তোমার !" শাপমোচনের গল্পই হল অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে খুঁজে পাওয়া অর্থাৎ বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে অন্তরের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি । এক্ষেত্রে পাঠকগণের মনে হতেই পারে অরুণেশ্বরের অন্তরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার জন্য কমলিকার প্রদীপের আলোর কি দরকার ছিল ? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গানেরও উল্লেখ করা যেতে পারে – "চোখের আলোয়

দেখেছিলেম চোখের বাহিরে। অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহি রে।" তবে কি কবি শুধু নাটকের প্রয়োজনেই প্রদীপখানি ব্যবহার করেছিলেন ? আমরা ভেবে নিতেই পারি যে এই প্রদীপের আলো কমলিকার পূর্ণতাপ্রাপ্ত প্রেমের বিচ্ছুরিত আলোর রূপক -- যা অরুণেশ্বরের বাহ্যিক রূপকে ছাড়িয়ে তার অরূপকে দীপ্তিমান ও দৃশ্যমান করেছিল।

"রক্তকরবীর" অধ্যাপক চারপাশের হাটের মধ্যে নন্দিনীকে দেখেছিল যেন সুর বাঁধা তম্বুরা। ঈশানীপাড়ার নন্দিনী যক্ষপুরীতে এসে দেখেছিল এর চারপাশে কেবল ভাঙা মানুষ আর টুকরো মানুষের ভিড়, যারা কেবল রাগ করছে, সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে। নিজের সহজ ব্যক্তিত্বে তার মনে হয়েছিল এদের সবার দিকেই বাড়িয়ে দেওয়া যায় বন্ধুতার হাত। কুঁদফুলের মালা তাই এগিয়ে দিয়েছিল রাজার দিকেও। তারপর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সে বুঝতে পারে যে সকলের দিকেই নিজেকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভালোবাসার জন্যেই দাঁড়াতে হয় কারো কারো বিরুদ্ধেও। তাই যখন সে বলে ওঠে – "রাজা এইবার সময় হল --- আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই" -- তখনই পরিপূর্ণতা ঘটে তার ব্যক্তিত্বের।

ভালোবাসার সমস্যা নিয়ে তৈরী হয়েছিল "যোগাযোগ" উপন্যাস। একদিকে মধুসূদনের ক্লিন্ন আবেষ্ঠন, আর অন্যদিকে সেই সঙ্কীর্ণ আবেষ্ঠন থেকে বেরিয়ে আসার তাড়না কুমুদিনীর এবং ঘটনার গুরুতর মুহূর্তগুলিতে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে সুর। বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গেছে যখন, কুমু তখন তার এস্‌রাজ নিয়ে বাজায় ভুপালির সুর, দাদার সঙ্গে বিচ্ছেদের দিনগুলিতে বাজায় কানাড়া - মালকোষের আলাপ, স্বামীর সাথে বোঝাপড়ার রাতগুলিতে তাকে আওড়াতে হয় দাদার কাছে শেখা মীরাবাঈএর গান, অলঙ্কার যৌতুক নিয়ে আসা মধুসূদনের সামনে সুর বাঁধে, কেদারা থেকে পৌঁছে যায় ছায়ানটে, যে সুর শুনে মধুসূদনের মতো গানহীন মানুষের মনেও আসে বিহ্বলতা। কুমুদিনী যখনই বাজায় বা গায়, তার মনে হয় সমস্ত জীবন যেন ভরে গেল এক আলোয়, সেখানে সাংসারিক দুঃখ-অপমানের কোন জায়গা নেই। সমস্ত সঙ্কট মুহূর্তে সুরের মধ্যে যেন তার ত্রাণ মেলে। কুমুদিনীর দুঃখ এই জন্য নয় যে সে ভালোবাসা পেল না, বরং এইজন্যেই যে সে ভালোবাসতেই পারলো না। তার প্রেম পৌঁছোতে চেয়েছিল পূজায় আর পূজা চেয়েছিল প্রেমে পৌঁছোতে। মাঝখানে সেতু ছিল গান আর সুর। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। তাই মোতির মাকে একদিন কুমু তার সমস্ত আবেগ দিয়ে বলেছিল, "আজ দেখতে পাচ্ছি ভালোবাসতে পারাটাই সবচেয়ে দুর্লভ, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় ঘটে।"

যে সেতুটি কুমুদিনী তৈরি করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি, তারই আয়োজন নিয়ে ভরে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান, পূজার গান, গীতবিতানের পর্যায় ভাগ অনুযায়ী মাঝে মাঝে সেগুলিকে আলাদা করা কঠিন হয় পড়ে। "মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে, / মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে, / প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো, / হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে, / তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে" -- একি পূজা ? হয়তো তাই। একি প্রেম ? হয়তো তাও।

সাম্প্রতিক কালের থেকে অনেকখানি এগিয়ে কবি যে নারীমূর্তি কল্পনা করেছিলেন, তাঁর সার্ধশতবর্ষের দোরগোড়ায় এসেও সেই কল্পনার বাস্তবায়িত রূপ সমাজের সকল স্তরে বড় একটা চোখে পড়েনা। কবিসৃষ্ট এই নারীমূর্তি হল সেই-ই – "আঙিনায় যে আছে অপেক্ষা করে। তার পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর", খুবই নম্র তার ভূমিকা -- "আমার এ ঘর বহু যতন করে / ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে / আমারে যে জাগতে হবে / কি জানি সে আসবে কবে --- ।"

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে মেঘমালার আবেগাপ্লুত গলা ধরে এসেছিল। চলতে লাগল পরবর্তী বক্তাদের বক্তব্য পেশ করা। একটা অদ্ভুত ভালোলাগায় আবিষ্ট হয়ে বসে রইল মেঘমালা, -- টুকরো টুকরো কথা কানে ভেসে আসতে লাগল – "রবীন্দ্রনাথের গান নিজেকে রচনা করে তোলবার গান। এ এক বিরামহীন আত্মজাগরণের আত্মদীক্ষার গান। দীক্ষার এই বেদী থেকে প্রতিদিনের আত্মচরিতের দিকে তাকিয়ে দেখি -- দেখি এমন কোন পদ্ম গড়ে ওঠেনি আমার স্বভাবের মধ্যে যেখানে এসে পা রাখবেন শ্রী, সৌন্দর্য" --- ইত্যাদি।

সাহিত্যসভার শেষে সভাগৃহ ছেড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে মেঘমালা রবীন্দ্রসদনের বাঁধানো রাস্তা ধরে। বেশ ক্লান্ত লাগছে। বিকেল পেরিয়ে গেলেও আলোটুকু রয়ে গেছে এখনও। রাস্তার ধারের দেবদারু গাছগুলিতে হালকা হাওয়ার ছোঁওয়া। দৃষ্টি চলে যায় সামনের চাতালে বসে থাকা অনেক মানুষের মধ্যে। ভেসে আসছে মিষ্টি খোলা গলার গান – "মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে / মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে / প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো" -- কোন প্রেমিক বন্ধুর সান্নিধ্যে বসে তার বান্ধবী তার সমস্ত হৃদয় উজাড় করে গাইছে। বিকেলের নরম আলোর প্রেক্ষাপটে এই সুন্দর ছবিটি মনের মধ্যে একেবারে নাড়া দিয়ে গেল। হৃদয়ের বাষ্পাচ্ছাসে গলার কাছে একটা হাল্কা ব্যথার অনুভূতি, মন কেমন করতে থাকে মেঘমালার -- তার নিজের সেই একান্ত আপন প্রবাসী বন্ধুটির জন্য মনের মধ্যে বেজে চলে সুর, "আজি গোধুলি লগনে এই বাদল গগনে / তার চরণধ্বনি আমি হৃদয়ে গনি।" এবার বুঝি চোখের কোণ ছাপিয়ে শুরু হবে প্লাবন। মেঘমালা মনে মনে না বলে পারল না যে – "কবি তুমি আরও শত শত বছর ধরে আমাদের মাঝে থেকো, থেকো জীবনের নিবিড়তম মুহূর্তগুলিতে -- কথা ও সুরের ভাণ্ডার নিয়ে।" ❑

অচেনা রবীন্দ্রনাথ

- কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত

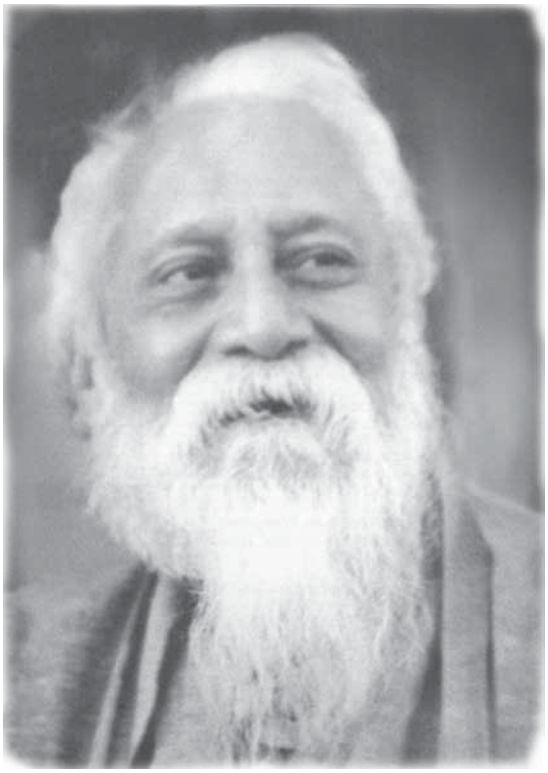

রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই আমাদের অচেনা ?

আমরা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি, বাংলা সাহিত্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাই, রবীন্দ্র সাহিত্যে অবগাহন করে মনে-প্রাণে অসীম তৃপ্তি পাই, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ তো পরম আপনজন। তাঁকে নতুন করে চিনতে হবে কেন ? তবু, আমরা কি বলতে পারি রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে চিনেছি ?

যতবার তাঁর সাহিত্যে ডুবে যাই ততবারই কি তাঁর নতুন পরিচয় পাই না ?

আমার রবীন্দ্রনাথ

আমি তাঁকে ও তাঁর শান্তিনিকেতনকে কতটুকু চিনেছি -- কতটা চেনা এখনও বাকি, সেই প্রসঙ্গে অল্প কিছু বলতে চাই। আমার জন্ম শান্তিনিকেতনে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৩শে বৈশাখ তারিখে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায় ৭০। আমার মাতামহ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী তাঁর অত্যন্ত আপনজন। আমরা ভাইবোনেরা জন্মেছি ক্ষিতিমোহনের গুরুপল্লীর খড়ের চালের বাড়িতে। বাড়িটার দেওয়াল মাটির। উঠোন গোবর দিয়ে সযত্নে নিকোনো। সেই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন। অনেক সময় হেঁটেই আসতেন। দূর থেকে সুপুরুষটির দেখা পেলে আমরা সানন্দে তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করতাম। দক্ষিণের বারান্দায় দাদামশাইয়ের সঙ্গে তাঁর কত কি কথা হত। বিষয়বস্তু সেদিনের বালকের অবোধ্য। শুনেছি আমার জন্মের পর তিনি এসেছিলেন নবজাতককে দেখতে, আমাকে দর্শনপ্রার্থী হতে হয় নি। শৈশব ও বাল্যবয়সের বেশ কিছু স্মৃতি আমার সারা জীবনের সম্পদ। তিনি যে একজন যুগপুরুষ সে কথাতো বুঝি নি -- বুঝবার বয়সও হয়নি তখন।

সেদিনের মানুষ রবীন্দ্রনাথ

উত্তরায়ণের কোনও না কোনও বাড়িতে তিনি থেকেছেন -- কখনও উদয়ন, কখনও শ্যামলী, কখনও পুনশ্চ, কখনও উদীচী। যে বাড়িতেই থেকেছেন একটি বিশেষ ঘরে বসে সারাদিন কত কি যে লিখে চলতেন, কেন লিখতেন কিছুই বুঝিনি। আমাদের কাছে তিনি নিতান্ত আপনার মানুষ, তার বেশি কিছু নয়। সবাই তাঁকে গুরুদেব বলেন। আমরাও গুরুদেবই বলতাম। কেন বলতাম সেকথা তো বুঝি নি। তাঁর লেখার ঘরের বাইরে কোনও প্রহরী নজরদারী করতেন না। আমাদের জন্য দ্বার ছিল অবারিত। এ ব্যাপারে মানুষ রবীন্দ্রনাথের সাগ্রহ প্রশ্রয়ের পরিচয় পেতাম এবং সেই কাঁচা বয়সে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারতাম তিনিও আমাদের সাহচর্য চান। আমরাও তাঁর সাহিত্যের রসদ -- তাঁর সাহিত্যের অনুপ্রেরণা।

আমার আগ্রহ

অল্প বয়সে স্ট্যাম্প জমাবার আগ্রহ ছিল। দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় প্রতিদিন তাঁর কাছে চিঠি আসত। ডাকঘরে চিঠি সর্টিং-এর সময় দাঁড়িয়ে থাকতাম। জেনে নিতাম বিদেশ থেকে আমাদের গুরুদেবের নামে কটা চিঠি এল। ডাকঘর থেকে উত্তরায়ণের পথ সামান্যই। ডাকপিওনের পিছনে পিছনে পৌঁছে যেতাম রবীন্দ্রনাথের কাছে। স্ট্যাম্প তো পেতামই -- উপরি পাওনা লজেন্স বা টফি। মহানন্দে ফিরে আসতাম। তাঁর সাহিত্যচর্চায় বিঘ্ন ঘটাতাম না। খাওয়ার ব্যাপারে তিনি বেশ সৌখিন ছিলেন। প্রাতঃরাশের জন্য নানারকমের সুস্বাদু খাবার এসে যেত নির্দিষ্ট সময়ে। সময়টি জানা ছিল। আমার মত আরও কিছু হ্যাংলা বালক জুটে যেত। নানারকম খাবারের মধ্যে তিনি একটি বা দুটি তুলে নিতেন। বাকি খাবারের ভাগ পেতাম। আমাদের খাইয়ে তিনি নিজেও যেন তৃপ্তি পেতেন -- দাড়িগোঁফের আড়ালে স্মিত হাসি ঠিক চেনা যেত।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শান্তিনিকেতনে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকত। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় পাঠভবনকে ঘিরেই তো সেদিনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শুরু সেই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর একে একে এল শিক্ষাভবন (কলেজ), কলাভবন, সঙ্গীতভবন, চীনাভবন, হিন্দিভবন। পাঠভবন স্কুলের ছাত্ররা তিনভাগে বিভক্ত -- শিশু বিভাগ, মধ্যবিভাগ , আদ্যবিভাগ। প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন সম্পাদক ও একজন সম্পাদিকা নির্বাচিত হতেন। সেই শিশু বয়সেই আমরা গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্বাচনের স্বাদ পেয়েছি। স্বাধীনতা ও তৎপরবর্তী গণতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র তখনও অনেক দূরে। প্রত্যেক বিভাগের সম্পাদক ও সম্পাদিকা ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে

লেখা সংগ্রহ করতেন এবং সেগুলির মূল্যায়নও করতেন। অবশ্য এজন্য প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন শিক্ষক এই কাজে সাহায্য করতেন। মনোনীত লেখা মাসে একটি সাহিত্য সভায় পড়া হত। কেউ গান গাইতেন, কেউ আবৃত্তি করতেন, কেউ পড়তেন স্বরচিত কবিতা ও রচনা। এরপর থাকত সাধারণের বক্তব্য। সভায় উপস্থিত যে কেউ সভায় পঠিত রচনা, কবিতা বা গানের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতে পারতেন। প্রত্যেক সভায় একজন সভাপতি থাকতেন। সবশেষে সভাপতির বক্তব্য। আমাদের ছুটি থাকত বুধবার (রবিবার নয়)। বৃহস্পতিবার কর্মারম্ভ। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একেকটি বিভাগের সভা হত। সভার নোটিশ আশ্রমের সবার বাড়িতে গিয়ে সকলের সই করিয়ে নিয়ে আসা হত। এছাড়া একটি বিশেষ দেওয়ালের সাথে গাঁথা বোর্ডে চক দিয়ে লিখে সভার কথা আগাম জানানো হত। সেই নোটিশ কারও নজর এড়াতে পারে, সেজন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রমের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে আসতাম। অবশ্যই তখন আশ্রম এত বড় ছিল না। তবে বাড়ি বাড়ি নোটিশ দেখাতে দুটো দিন লাগতই। সব বাড়ি ঘুরতে মোট পাঁচ ছয় মাইল হাঁটতে হত। সাহিত্য সভায় সাধারণের বক্তব্য ও সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে ক্ষুদে লেখকরা সমালোচনা হজম করতে শিখত, সমালোচনা করতেও শিখত। অল্পবয়স থেকে সাহিত্য রচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে বুনিয়াদ পাকা হত। তিন বিভাগের সাহিত্য সভা মাসের তিনটি মঙ্গলবারে হত। চতুর্থ মঙ্গলবারে সাহিত্যিকদের সাহিত্য সভা, পাঠভবন ছাড়া অন্যান্য বিভাগের (শিক্ষাভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, চীনাভবন, হিন্দিভবন) ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য সভা হত। আমাদের পাঠভবনে ছাত্রাবস্থায় (গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে) মহাশ্বেতা দেবী ছোটগল্পে হাত পাকাচ্ছেন। নবকান্ত বরুয়া তখন বাংলায় কবিতা লিখতেন। এমনি একটি সভায় হীরেন দত্ত সভাপতিত্ব করছিলেন। তিনি আমাদের প্রিয় অধ্যাপক ও সুসাহিত্যিক। হীরেনদা নবকান্তকে বলেছিলেন -- মধুসূদন দত্ত ইংরেজী সাহিত্যে ছাপ ফেলতে পারেননি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে নতুন জোয়ার আনতে পেরেছিলেন। তাঁর মাতৃভাষা বাংলাভাষা আজ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। নবকান্ত প্রতিভাবান। তিনি যদি অহমিয়া ভাষায় কাব্য রচনা করেন, হয়তো অহমিয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে। নবকান্ত বরুয়া এরপর অহমিয়া ভাষায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হয়ে পদ্মভূষণে ভূষিত হয়েছিলেন। এই উপলক্ষে কলকাতায় তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনার আগে তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁকে আমি সেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে গুরুঋণ শোধের সুযোগ নিতে বলি। তিনি সংবর্ধনা সভায় হীরেনদা-র কথা বলেছিলেন। খবরের কাগজে সে খবর ছাপা হয়েছিল। তখনও হীরেনদা জীবিত। তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন।

সাহিত্য সভা ছাড়াও প্রায়ই অনুষ্ঠিত হত নাটক বা নৃত্যনাট্য। রঙ্গমঞ্চের একপাশে রবীন্দ্রনাথ বসতেন। পিছনে গানের দল বসত। অনুষ্ঠানের আগে প্রায় একমাস মহড়া চলত উত্তরায়ণে। মহড়ায় রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে উপস্থিত থাকতেন। আমরা তো থাকতামই। এছাড়া প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের ডাক পেয়ে আশ্রমের সকলে উদয়নের হল ঘরে জড়ো হতাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন লেখা পড়ে শোনাতেন। আমরাই তাঁর রচনার প্রথম শ্রোতা। এরপর রবীন্দ্রনাথ সেদিনের উঠতি গায়ক গায়িকাদের নাম করে গান গাইতে বলতেন। সেদিনের কিশোরী মোহরদি (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়), বাচ্চুদি (নীলিমা সেন) ও আরও অনেকেই গান শোনাতেন। তখন তাঁর সুরের কাণ্ডারী দীনু ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের রচনা শুনে কিছু বুঝতাম কি ? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া কঠিন। কিছু বোঝা ও না বোঝার মধ্যেও প্রাণটা কানায় কানায় ভরে উঠত।

শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মের দাবদাহ

শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা কতটা ওঠে সেটা তাঁরাই বুঝবেন যাঁরা সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে থেকেছেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর জন্মোৎসব ২৫শে বৈশাখের পরিবর্তে ১লা বৈশাখ পালন করা হত। জন্মদিনে তিনি প্রিয় ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি চাইতেন, কিন্তু তাঁদের গরমে কষ্ট পেতে দিতেন না। গ্রীষ্মকালে জলের নিতান্তই অভাব। তখনও গভীর নলকূপের সন্ধান মেলেনি। গ্রীষ্মকালে প্রায় সব কুয়ো শুকিয়ে যেত। আজকের মত কল খুললেই জলের কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আমরা সবাই কুয়োপারে স্নান করতাম। খাওয়ার জল কুয়োপার থেকে টেনে আনতাম। শিক্ষকরাও তাই করতেন। বেতন পেতেন সামান্যই, চাকর রাখার সাধ্য ছিল না। তবু তাঁরা পরম আনন্দে আর্থিক অভাবের মধ্যে দিন কাটাতেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ২০ বছর পর তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীর সময় গভীর নলকূপের সন্ধান মিলল। সেদিনের বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাশ শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র। স্বাধীন ভারতে তিনিই সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি। সেদিনের পাঞ্জাবের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কায়রোঁর যোগ্যতার খ্যাতি থাকলেও কিছু অনাচারের বদনাম হয়। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের নির্দ্দেশে সুধীদাই অভিযোগ অনুসন্ধান করেন, এবং কায়রোঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এহেন খ্যাতিমান সুধীরঞ্জন দাশ সেই ১৯৬১তে আমার মত নিতান্ত নগণ্য মানুষকেও আলাদা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে গভীর নলকূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। চিঠিতে তাঁর আন্তরিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যাবে জলের সন্ধান শান্তিনিকেতনের উন্নয়নে কতটা আবশ্যিক ছিল।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মদিন

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে ১লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনে তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হচ্ছিল। অনুষ্ঠানটি উত্তরায়ণ চত্বরে উদয়নের সামনে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান শেষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্যরচিত "সভ্যতার সংকট" পড়তে উঠলেন। অল্প পরেই তিনি উত্তেজিত ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পুস্তিকাটির শেষ অংশ তাঁর হয়ে পড়ে দিলেন আমার দাদামশাই ক্ষিতিমোহন। সভ্যতার সংকটের সব কথা কি সেদিন বুঝেছিলাম ? অনেক কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিলাম সামনে ঘোর দুর্দিন। আজ সভ্যতার যে নতুন সংকট দেখতে পাচ্ছি তার খবর রবীন্দ্রনাথ পাননি। কিন্তু ঋষির দূরদৃষ্টিতে তিনি আগামী যুগের ঘোর সংকটের পূর্বাভাস অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং বিশ্ববাসীকে সাবধান করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বিদায়

রবীন্দ্রনাথের বিয়োগ ব্যথায় সারা ভারতবর্ষ যখন মুহ্যমান তখন এই ঘটনা আমাদের মত বালকের মনে কতটা রেখাপাত করেছিল ? নিতান্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের জন্য আমাদের গুরুদেবকে কলকাতায় যেতেই হবে, আশ্রমবাসীদের মনে অজানা সংশয়। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪১এর জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে

চলে গেলেন। সমস্ত আশ্রমবাসী উত্তরায়ন থেকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। অনিশ্চিতের আশংকার প্রতিফলন পড়েছে তাদের চোখে মুখে। শান্তিনিকেতন ছাড়বার আগে তাঁর প্রিয় আশ্রম ঘুরে দেখবেন -- গাড়ী চলেছে ধীর গতিতে। আশ্রমবাসীদের মনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তাঁদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে -- রবীন্দ্রনাথের চোখও একটু যেন ছল্‌ছলে। তখন বোলপুর ও শান্তিনিকেতনের মাঝামাঝি ভুবনডাঙ্গা গ্রামের কাছে একটা বড় জেনারেটার বসানো হচ্ছে, উদ্দেশ্য সন্ধ্যা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের রাস্তায় আলো জ্বলবে। শান্তিনিকেতনবাসীরা তখন বিজলি বাতির কথা ভাবতেও পারেন না। আমাদের পাঠভবনের পাঠ লন্ঠনের আলোয়, তাও একটা লন্ঠনে একাধিক ভাইবোন পড়েছি। রাস্তায় আলো দেওয়ার জন্য ইলেকট্রিক পোস্ট বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। পোস্টগুলির দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন নতুন আলো আসছে -- পুরোনো আলো নিভবে। তাঁর মন কি বলছিল -- এই যাত্রাই শেষ যাত্রা ? পথের দুপাশে আমরা দাঁড়িয়ে, অনেকেরই চোখে জল। শান্তিনিকেতনের কিছু প্রশাসনিক পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমার দাদামশাই রবীন্দ্রনাথকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। রবীন্দ্রনাথের উত্তর -- পাখি ডানা মেলে দিয়েছে, সে ডানাতে আর জল লাগাতে বলবেন না।

১৫ দিন পর পরম দুঃসংবাদ নিয়ে সেদিনের ইংরেজী শিক্ষক ক্ষিরিশ চন্দ্র রায় এলেন। প্রায় ১ ঘন্টা তিনি ও আমার মাতামহ নিঃশব্দে বসে রইলেন। তারপর শান্তিনিকেতনে আশু করণীয় কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়। কলকাতা থেকে দুটি ভস্মাধারে তাঁর দেহভস্ম নিয়ে যখন আশ্রমে ঢোকা হল তখন আরও একবার রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আশ্রমিকেরা। ভস্মাধারটি উদয়নে তাঁর বহু ব্যবহৃত চেয়ারে রাখা হল। ওই চেয়ারের অন্য পাশে রাখা হল তাঁর "শূন্য কেদারা" কবিতাটি। তাঁর মরদেহ তো পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর অমর প্রাণ আজও আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তিনি আমাদের কাছেই আছেন। যতদিন বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে ততদিন রবীন্দ্রনাথ অমর। তাঁর জন্মের পর ১৫০ বছর পেরিয়ে এলাম --মৃত্যুর পরেও ৭০ বছর হতে চললো, তবু তাঁর লেখা একটুও পুরোনো হয়নি। তাঁর মানুষের ধর্ম আজও আমাদের একই ভাবে টানে। ❑

শান্তিনিকেতন কী –

এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে কেবল আমার চোখে দেখার সম্বন্ধ নয়, একে আমার জীবনের সাধনা দিয়ে পেয়েছি -- সেইজন্যে এইখানে আমি সকল তীর্থের ফল লাভ করি।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম চৌধুরীকে লেখা চিঠি)

মনস্তত্ত্ববিদদের গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ঈশিতা সান্যাল

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমস্ত বাঙালীর গর্ব, ভারতবর্ষের গর্ব -- সারা বিশ্বের এক চিরপরিচিত নাম। তাঁর কীর্তির মধ্যেই তিনি চিরজীবি। তিনি ছিলেন দূরদ্রষ্টা। মৃত্যুর আগেই বলে গিয়েছেন আজি হতে শতবর্ষ পরে কি হতে পারে। বিজ্ঞান যখন দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে তখন আমাদের পিছনে ফেলে আসা ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস সবই পুরানো হয়ে যাচ্ছে , যে সব বৈজ্ঞানিক সত্যকে আমরা চিরন্তন মনে করতাম তার অনেক কিছুই আজ ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু তবু আজও তাঁর শতবর্ষ আগে লেখা গান ও কবিতাগুলির মধ্যে আমরা আমাদের আজকের অনুভূতির প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

তিনি পরিচিত লেখকরূপে, তিনি পরিচিত কবিরূপে। তাঁর গান বাঙালির কন্ঠ থেকে কোনওদিন মুছে যাবে না। তিনি পরিচিত চিত্রকররূপে। তিনি পরিচিত শিক্ষাব্যবস্থার এক নতুন প্রয়াসের পথপ্রদর্শকরূপে। প্রায় প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মনের না বলা কথা খুঁজে পায় তাঁর লেখায়। যে দুঃখ, যে বেদনা কাউকে জানানো যায় না, বোঝানো যায় না -- তাও যেন কোন অদৃশ্য যাদুতে তাঁর লেখনীতে ধরা দিয়েছে। আমি জানিনা পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ আছেন কিনা যিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের কোনও না কোনও গল্পে বা কবিতায় তার নিজের মনের নিবিড় অনুভূতির মিল খুঁজে পান নি।

কোন মন্ত্রশক্তির যাদুতে তিনি মানুষের মন এমনভাবে পড়তে পারতেন জানি না। মনস্তত্ত্ববিদদের তিনি এব্যাপারে হার মানিয়ে দিতে পারেন সহজেই। সব মানুষের মনের গোপন গভীর কোণে ঢুকবার পথ তাঁর জানা ছিল। তাইতো তিনি বিশ্বকবি। সেই অধিকারেই তিনি মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের পথপ্রদর্শক, তাদের গুরু। মানসিক রোগে ভুগছে যে সব মানুষ তাদের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায় আত্মবিশ্বাসের অভাব। নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তারা গুটিয়ে নেয় নিজেদের। ঘরের মধ্যে নিজেদের করে ফেলে বন্দী। নতুন কোন কাজ শুরু করার আগে আশঙ্কায়, আতঙ্কে (anxiety, tension) তারা দিন কাটায়। প্রতি মুহূর্তে তারা সফল না হবার ভয়ে (Fear of Failure) জর্জরিত থাকে। সাইকোলজিষ্ট তাকে ভয়ের অন্ধকার থেকে বের করে সঠিক পথের রাস্তা দেখায়, তার জীবনে আবার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। শতবর্ষ আগে ঠিক এই কথাই কবিগুরু গেয়েছেন – "নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে। যদি পণ করে থাকিস, সে পণ তোমার রবেই রবে। ওরে মন, হবেই হবে ।। পাষাণ-সমান আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে, আছে যারা বোবার মতন তারও কথা কবেই কবে।" আজকের মনস্তত্ত্ববিদেরা হতাশার বেড়াজাল ভেঙে মুক্তির আলোয় বেড়ানোর যে পরামর্শ দেন, তার মূল মর্মবাণী আমরা এই গানের মধ্যেই খুঁজে পাই।

ভয়, ভাবনা আমাদের জীবনের সঙ্গী। কিন্তু যখন মানুষের এই ভয় ভাবনা তার স্বাভাবিক জীবন যাপনের পথে বাধা হয়ে পড়ে--যখন মানুষ ক্রমশ ভীত হয়ে পড়ে, অলীক আশংকায় অস্থির হয়ে ওঠাগত হয়ে পড়ে -- তখন যেন শতবর্ষ আগের চিরনূতন কবিগুরু এসে পথ দেখান আমাদের।

"আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না ।।
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে --
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না ।।
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে --
সহজ পথে চলব ভেবে পড়ব না, পাঁকের পরে পড়ব না ।।
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে --
বিপদ যদি এসে পড়ে, সরব না, ঘরের কোণে সরব না।"

হতাশায়, অবসাদে ভোগে মানুষ। নিজের উপর বিশ্বাস হারায়। যেন সে আর কোনও জীবন যুদ্ধে জিততে পারবে না -- যেন সে এই পৃথিবীতে যুদ্ধ করে ক্লান্ত, শ্রান্ত। হেরে গিয়ে হতাশায় জর্জর অবসাদে ছেয়ে থাকে তার সারা শরীর, চোখের পাতা। যেন সে তার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কোনও কাজে আর সে শক্তি বা স্ফূর্তি খুঁজে পায় না। অবসাদে সে চোখ বোজে -- চোখ বুজে বাইরের বিশ্ব থেকে যেন সে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়। বাস্তবের সম্মুখীন হতে সে অপারগ। কবিগুরু এই তামসিক মানসিক অবসাদ দূর করতে এই আহ্বান জানিয়েছেন।

"হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয় ।।
জয়ী প্রাণ, চির প্রাণ , জয়ীরে আনন্দগান
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম, জয়ী জ্যোতির্ময় রে
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, মেল চোখ, অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক হোক অভ্যুদয় রে ।।"

তার আহ্বানে বাস্তব জীবনকে চোখ খুলে দেখে, বাস্তবের সম্মুখীন হতে, অবসাদ দূর করতে ভরসা পায় অনেকেই।

হতাশা বিষাদ থেকে আমরা নিয়ে যেতে চাই মানসিক রোগীকে আনন্দের দিকে। এক আনন্দধারা তার জীবনে বইয়ে দিতে চাই যার স্পর্শে দূর হবে হতাশা, দুঃখ। যার যাদুর স্পর্শে মনোবল ফিরে পেয়ে সে সফল হবে -- তবেইতো তার মানবজীবন হবে পূর্ণ।

তাইতো তিনি বলেছেন ---

"যদি দুঃখ দহিতে হয় তবু নাহি ভয় নাহি ভয়
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু নাহি ভয় নাহি ভয়
যদি মৃত্যু নিকট হয় তবু নাহি ভয় নাহি ভয়
জয় জয় ব্রহ্মের জয়
মোরা আনন্দ মাঝে মন আজি করিব সমর্পণ
জয় জয় আনন্দময়
সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে আনন্দ নিকেতন
জয় জয় আনন্দময়।

আনন্দ চিত্ত মাঝে আনন্দ সর্বকাজে
আনন্দ সর্বকালে দুঃখে বিপদজালে
আনন্দ সর্বলোকে মৃত্যু বিরহশোকে
জয় জয় আনন্দময়।"

তিনি সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন নিজেদের সঙ্কোচমুক্ত করতে অথবা সংকটের কল্পনা করে ম্রিয়মান না হতে –

"সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরই অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধর,
নিজেরে কর জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো দুর্জনেরে হানো,
নিজের দীন নিঃসহায় যেন কভু না জেনো।"

তিনি যেন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে চেয়েছিলেন দুঃখ, হতাশা, আশঙ্কা, ভয়, ভাবনা। তিনি যেন চেয়েছিলেন সারা পৃথিবীর মানুষ মানসিকভাবে সুস্থ হোক। কোনও মানুষ যেন ছুটে চলার গতিতে পড়ে না যায় -- যেন কেউ পিছিয়ে না পড়ে। যেন কোনও মানুষ এ সংসারে অবসাদে চোখ বন্ধ করে জড়পদার্থ হয়ে কাটিয়ে না দেয়। তার যাদুমন্ত্রে তিনি প্রত্যেক মানুষের প্রাণে আনতে চেয়েছিলেন খুশী -- দুঃখ ভয় ভাবনা দূরে ঠেলে। চলুন আজ সেই মহাপ্রাণ মনস্তত্ত্ব গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অদৃশ্য ছোঁয়ায় পৌঁছে যাই খুশীর রাজ্যে।

"প্রাণে খুশীর তুফান উঠেছে
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে।।
দুঃখকে আজ কঠিন বলে জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে।
হেথায় কারো ঠাঁই হবে না মনে ছিল এই ভাবনা
দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে।
যতন করে আপনাকে যে রেখেছিলেম ধুয়ে মেজে,
আনন্দে সে ধুলায় লুটেছে।।"

প্রত্যেক মানুষ যেন খুশীর জোয়ারে ভাসতে পারে, দুঃখ-বিপদ সহ্য করার শক্তি যেন তার মধ্যে গড়ে ওঠে, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস যেন কোনও মানুষ না হারায় -- এই হোল মনস্তত্ত্ববিদদের মন্ত্র। এই মন্ত্রেই তারা দীক্ষিত করেন মানসিক ভারসাম্য হারানো রোগীদের। বিপদে মানুষ কারোর কাছে এমনকি ঈশ্বরের কাছেও যেন সাহায্য প্রার্থী না হয়। যেন মানুষের নিজের মনে সেই শক্তি থাকে যার জোরে সে কঠিন থেকে কঠিনতম কাজ অনায়াসে করতে পারে; বিপদের আশঙ্কায় যেন ভেঙ্গে না পড়ে, শক্ত হাতে হাল ধরে সে নিজেই যেন বিপদের সম্মুখীন হতে পারে -- এই হবে সুস্থ মানুষের ছবি। তাই তিনি তাঁর গানে প্রার্থনা জানিয়েছেন –

"বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা --
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে - ব্যথিত চিত্তে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে --
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা --
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে তোমার মুখ লইব চিনে --
দুখের রাতে নিখিল ধরা যে দিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।।"

এই ঋষিতুল্য মানুষটিকে সমস্ত মনোরোগী এবং মনস্তত্ত্ববিদদের পক্ষ থেকে জানাই আমার শতকোটি প্রণাম। ❑

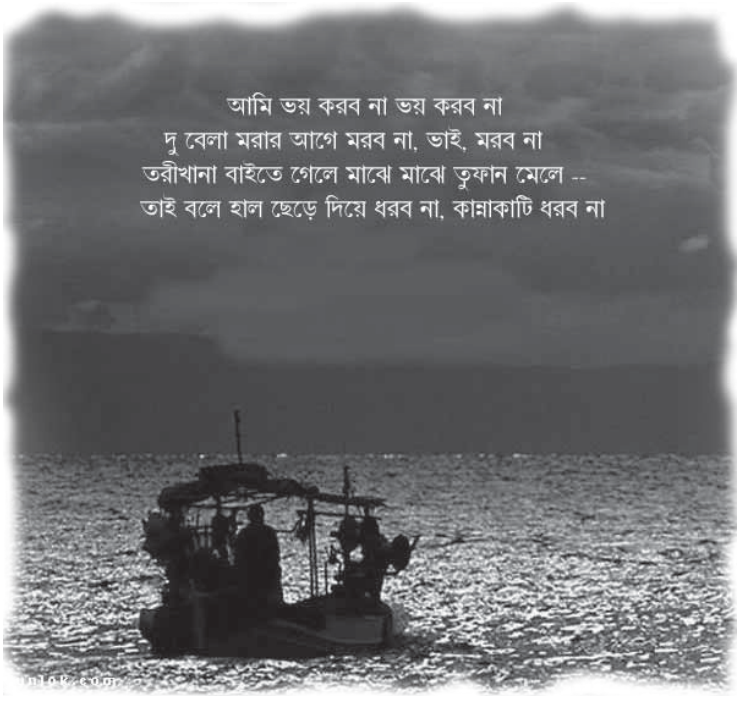

জাপানে রবীন্দ্রনাথ

- কিওকো নিওয়া

আমার এক ছাত্রী যে আমার কাছে হিন্দী ভাষা শিখছে, কয়েক মাস আগে এসে বলল ট্যাগোর নামের একজন কবির রচনা সে পড়েছে এবং জানতে চাইল উনি ভারতীয় কিনা। ছাত্রীটি আরও বলল, কবিতাগুলো তার খুব ভাল লেগেছে এবং সেগুলো প্রেমের কবিতা কিনা জানতে চাইল। সে পড়েছে গীতাঞ্জলির অনুবাদ। তা শুনে আমি একদিকে যেমন খুশি হয়েছি, অন্য দিকে মনটা একটু খারাপও হয়েছে।

খুশি হয়েছি কারণ একজন তরুণী ছাত্রী কারোর সুপারিশ ছাড়াই হঠাৎ গীতাঞ্জলি পড়েছে এবং তার ভালও লেগেছে। আর মনটা খারাপ হয়েছে এই কারণে যে তার আগে সে একবারও রবীন্দ্রনাথের নাম শোনে নি। জানতও না রবীন্দ্রনাথ বাংলার বা বিশ্বের কত বড় কবি।

এ হচ্ছে আমাদের দেশের বাস্তবতা। বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের নাম জানেন বিখ্যাত কবি হিসেবে, বা কেউ কেউ জানেন তিনি কয়েকবার জাপানে এসেছিলেন আর জাপানের সঙ্গে তাঁর কিছু সম্পর্কও ছিল। কিন্তু তরুণ-তরুণীরা এসব কিছুই জানে না।

সে যাই হোক, আমি ছাত্রীটিকে গীতাঞ্জলি আরও কয়েকবার পড়তে বলেছি। রবীন্দ্রনাথের লেখা অন্য বইয়ের কথাও বলেছি। গীতাঞ্জলির সহজ অভিব্যক্তির অজস্র ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু বলি নি। কারণ সে নিজে কবিতাগুলো পড়তে পড়তে আরও কিছু আবিষ্কার করবে, সেই আশা করছি। তবে এ ব্যাপারে অসুবিধাও আছে কিছু। ছাত্রীটি জানায়, রবীন্দ্রনাথের গল্প- কবিতার জাপানী অনুবাদের ভাষা অনেক পুরোনো বলে তার মনে হয়েছে। সে জন্যে ভাল করে বুঝতে পারছে না। আসলে অনুবাদগুলো উৎকৃষ্ট মানের এবং নির্ভুল হলেও পঞ্চাশ বছর আগের কাজ। তাই অনুবাদের ভাষা বা অভিব্যক্তি বর্তমান প্রজন্মের বেশ পুরোনোই লাগে। আমার মনে হয় সহজ-সরল আধুনিক জাপানী ভাষায় অনুবাদ থাকলে ভাল হত।

জাপানে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে ১২ খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্যি বিরাট এবং গর্ব করার মতোই কাজ। তবে সেসব বইয়ের দাম অনেক, তাই কিনতে ঐ ছাত্রী একটু ইতস্ততঃ করছিল। তাছাড়া রচনাবলীর গীতাঞ্জলি তো ইংরেজী গীতাঞ্জলির জাপানী অনুবাদ। তবে ছাত্রীটি যে অনুবাদ পড়েছে, সেটা অন্ততঃ বাংলা ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে। এই ছিল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার একজন ছাত্রীর কথা।

আরেক বার একজন সাহিত্যপ্রেমী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন রবীন্দ্রনাথকে জাপানী কবিদের মধ্যে কার সাথে তুলনা করা যেতে পারে ? উত্তর দিলাম, রবীন্দ্রনাথের মত কবি আমাদের দেশে অতীতেও ছিলেন না, বর্তমানেও নেই। বলেছি যে "গেঞ্জি মনোগাতারি"-র রচয়িতার মত মস্ত এবং বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক যেমন বিশ্বের কোনো দেশে সহজে পাওয়া যায় না, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মত কবি বিশ্বের সব জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন না।

আমার এই উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনা বারবার পড়েও এর বিশেষত্ব অনুধাবন করতে পারেন নি। বাঙালীর ইতিহাসে বা সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় ? লোকজন তাঁকে বা তাঁর রচনাকে কতটা ভালবাসেন ? এসব বোঝার জন্যই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ জাপানী কবিদের মধ্যে কার সাথে তুলনীয় ? আমার মনে হল, শুধু অনুবাদ নয়, জাপানে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করে তুলতে হলে আরও কিছু করা দরকার।

তবে অবশ্যই এমন নয় যে জাপানে এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনও কাজ হয় নি। প্রায় একশ বছর আগে থেকেই কিছু না কিছু কাজ হয়ে আসছে। তবু এখনও অনেক কিছু করা বাকি এবং করা দরকারও। আগামী বছর রবীন্দ্রনাথের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই বাকি কাজের কিছুটা হলেও করবো, আমার তাই ইচ্ছা। তরুণী ছাত্রী আর একটু বয়স্ক সাহিত্যপ্রেমী, দুজনেই বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতার জাপানী অনুবাদের বইগুলো যদি ছোটখাট এবং হাল্কা হয়, তাহলে তাঁরা খুব উপকৃত হবেন। কারণ হাল্কা বই সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে অথবা যে কোনও জায়গায় বসে পড়া সম্ভব। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ তো শুধু গবেষক বা সাহিত্যিক যাঁরা গ্রন্থাগার বা পাঠকক্ষে বসে বই পড়েন, তাঁদের জন্যেই নন। সাধারণ জাপানী পাঠকদেরও রবীন্দ্রনাথের সুন্দর, সহজ ও গভীর অর্থবহ কবিতা এবং গল্পের আস্বাদ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া আমাদেরই দায়িত্ব।

অন্তর থেকে আশা করছি আমাদের দেশের উৎসাহী পাঠকরাও একদিন রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে পারবেন। হয়ত এমন দিন আসবে যখন দেখব এদেশের ট্রেনে, বাসে ও পার্কে বসে নানা বয়সের লোক রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ছেন। ❑

গল্পের নাম রবীন্দ্রনাথ

- নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট মনীষীদের জীবন চর্চা নানাভাবে আমাদের প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিপুল ভুবনের পাশাপাশি তাঁর চলা-ফেরা, হাতের লেখা, পোশাক পরিচ্ছদ, ব্যক্তিগত জীবন -- সব কিছুই গভীরভাবে প্রাণিত করেছে আমাদের। রবীন্দ্রনাথকে আজও আমরা বিস্ময় ও শ্রদ্ধার যে নির্বিকল্প আসনে প্রতিষ্ঠা করে রেখেছি তার একটা মূল কারণ, রূপে-গুণে, মেধায়-মননে, ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় সম্পৃক্ত এমন একটি আদর্শ ব্যক্তিত্বই হয়তো আমরা দেখতে চেয়েছি বরাবর।

জীবন স্মৃতি, ছেলেবেলা বা আত্মপরিচয়-এর মতো আত্মকথনমূলক রচনা ছাড়াও অসংখ্য চিঠিপত্রে, ভ্রমণকথায় ছড়িয়ে আছে "মানবের লোকালয়ে", "সুখে-দুঃখে", "লাজে-ভয়ে", "জয়ে-পরাজয়ে" ঋদ্ধ রবীন্দ্রনাথের জীবনের বহু উপাখ্যান। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত রয়েছে। ইংরেজিতে এই ধরণের গল্পের একটা চালু নাম হল "অ্যানেকডোট"। এই প্রবন্ধে যে সব কাহিনী সংকলিত হয়েছে তার প্রতিটি কোথাও-না-কোথাও প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় এই সব কাহিনী বিশেষ প্রকাশিত হয় নি। তাই আমাদের জানার প্রায় সুযোগ নেই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকে ঘিড়ে গড়ে-ওঠা এই-সব কাহিনীগুলির বিষয়ে কি মতামত পোষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে গড়ে ওঠা অজস্র কাহিনীর মধ্যে থেকে আমার ভাল লাগা কিছু গল্প নিয়েই এই লেখা --

সহজ পাঠ

অভিজিৎ একান্ত সচিব অনিল চন্দ ও রানী চন্দের ছেলে। চার বছরের ছোট্ট এই ছেলেটি প্রায় ঘুরে-ফিরে আসে তার গুরুদেব-দাদুর কাছে। একদিন গুরুদেবের গা ঘেঁষে দাঁড়াল অভিজিৎ। বলল, "জান, তোমার সব কবিতা আমি মুখস্ত করে ফেলেছি।" রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তাহলে তোমার জন্য আবার আমায় নতুন করে কবিতা লিখতে হবে দেখছি।" এর পর অভিজিৎ গুরুদেবের কোলে হাঁটুটা তুলে দিয়ে বলল, "আজ কোন্ কবিতাটা শিখেছি ? শোন -- পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল বন্দী শিখের দল -- / সুহিদ্‌গঞ্জে রক্তবরণ / হইল ধরণীতল।"

রবীন্দ্রনাথের "প্রাণাতীত দান" কবিতায় পাঠানের "পাঠা" আর রক্তবরণের "রক্ত" -- এ দুটো শব্দই বোধগম্য হয়েছিল অভিজিতের। তাই অভিজিৎ বলল, "এর মানে কি জান দাদু ? পাঁঠাগুলিকে বেঁধে নিয়ে এল -- কাটল, আর রক্ত -- রক্ত।" ছোট্ট হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে চোখ ছানাবড়া করে সেই ভয়ঙ্কর অবস্থাটাই বুঝিয়ে দিল অভিজিত তার গুরুদেব-দাদুকে। প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। বললেন, "তাই তো গো -- এমন মানে তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও জানে না গো !"

(সূত্র : রানী চন্দ, গুরুদেব, বিশ্বভারতী, কলকাতা : ১৩৬৯)

নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে

১৯৪০-এর সেপ্টেম্বর। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ। মংপু থেকে অচেতন কবিকে কলকাতায় নিয়ে এলেন মৈত্রেয়ী দেবী। কবির সেবার দায়িত্ব পড়ল মৈত্রেয়ীর উপরই। রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা করছেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। কঠিন স্বরে তিনি মৈত্রেয়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, "রবীন্দ্রনাথের বাঁধানো দাঁত খুলে নেওয়া হয় নি কেন ?" মৈত্রেয়ী বললেন, "খুলেছি, পরিষ্কার করে আবার পরিয়ে দিয়েছি।" বিধানচন্দ্র শাসনের সুরে বললেন, "পরালে কেন ? তুমি জানো না অচৈতন্য মানুষের শরীরে এ -সব রাখতেই নেই।"

ভুল বুঝে মৈত্রেয়ী অচেতন রবীন্দ্রনাথের বাঁধানো দাঁতজোড়া খুলে নিলেন। জ্ঞান ফিরতেই রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন তাঁর দাঁত উধাও। বললেন, "আমার কথা কেড়ে নিয়ে গেল কে ? রবীন্দ্রনাথকে বাক্যহারা করে কার এত সাহস ?"

(সূত্র - মৈত্রেয়ী দেবী, স্বর্গের কাছাকাছি, কলকাতা - প্রাইমা পাবলিকেশন্‌স্, ১৯৮১)

প্রাণের পরে চলে গেল কে

একবার রবীন্দ্রনাথের বিয়ের একটি সম্বন্ধ এল। রবীন্দ্রনাথ গেলেন মেয়ে দেখতে। ধনী ঘরের মেয়ে। সেই সময় সাত লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী। মেয়ের বাড়ি যেতেই দুটি অল্প বয়সী মেয়ে এসে বসলেন। একজন নিতান্তই সাদাসিধে, জড়ভরত, অন্যজন পরমা সুন্দরী চট্‌পটে আর স্মার্ট। বিশুদ্ধ তার ইংরিজি উচ্চারণ। দ্বিতীয় জনকে ভাল লেগে গেল রবীন্দ্রনাথের। ভাবলেন, এবার মেয়েটাকে ভাগ্য করে পেলে হয়।

সেই সময় ঘরে ঢুকলেন গৃহকর্তা। বয়স হয়েছে। সৌখিন মানুষ। জড়ভরত মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন "হেয়ার ইজ মাই ডটার" অর্থাৎ "এই আমার মেয়ে।" আর পরমা সুন্দরীটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "হেয়ার ইজ মাই ওয়াইফ, ইনি আমার স্ত্রী।" রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ভঙ্গ হল। সে বিয়ে আর হয় নি।

পরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বিয়েটা হলে নিতান্ত মন্দ হত না, কেননা পত্নীর সুবাদে সাত লাখ টাকার মালিক হলে বিশ্বভারতীর অর্থকষ্টে তাঁকে আর জর্জরিত হতে হত না। অবশ্য তার একটি ভয়ঙ্কর দিকও রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মেয়েটি বিয়ের দু বছরের মাথায় বিধবা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তাই ভাবি ভালই হয়েছে, কারণ স্ত্রী বিধবা হলে আবার প্রাণ রাখা শক্ত।"

(সূত্র; মৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা; প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ১৩৫০)

দুঃসহ কৌতুক

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের ডানপিটে ছাত্র প্রমথনাথ বিশী। অঙ্কের পরীক্ষা। অঙ্কের শিক্ষক নগেন আইচ। দশটার জায়গায় বারটা অঙ্ক করে প্রমথ ভাবলেন ১০০ নম্বরে ১২০ পাওয়ার মত দুরূহ সমস্যার সমাধান মাষ্টারমশাই করবেন

কীভাবে !

বিকেলে ভূগোল পরীক্ষার দ্রাঘিমা আর বিষুবরেখার আপেক্ষিক সম্বন্ধ বিচারে ব্যস্ত প্রমথ। হঠাৎ হাজির নগেন আইচ। হাতে প্রমথ-র অঙ্ক খাতাটি। প্রমথ ভাবলেন, ১০০য় ১২০ দেওয়ার ধাঁধাঁ-র কোনো সমাধান না পেয়ে মাষ্টারমশাই এসেছেন ছাত্রকে অভিনন্দন জানাতে। কিন্তু গম্ভীর গলায় নগেন আইচ জিজ্ঞেস করলেন, "একি করেছ ?" প্রমথ জানতে চাইলেন কোনো ভুল হয়েছে কিনা।

নগেন আইচ বললেন, "ভুলের কথা হচ্ছে না। ভুল ছাড়া তুমি কি করবে। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় এটা কী ?" দশটির জায়গায় বারটি অঙ্ক করে, তার সবকটির ভুল উত্তর দিয়ে শেষ পৃষ্ঠায় প্রমথ একটি কবিতাও লিখেছিলেন।

কাণ্ড দেখে কয়েকজন শিক্ষক এসে জুটলেন। নগেন আইচ এই ভয়ঙ্কর বিষয়টি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে অঙ্কের খাতায় স্বরচিত কবিতা লেখার মত গুরুতর অপরাধের কোনো যথাযোগ্য শাস্তি খুঁজে পেলেন না। অতএব অঙ্ক খাতা গেল শান্তিনিকেতনের সুপ্রিম কোর্ট -- মহামান্য গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের হাতে।

গুরুদেব খাতাটা আগাগোড়া দেখলেন। বললেন, "নগেন, অঙ্কগুলো তো হয় নি দেখাই যাচ্ছে।, কিন্তু যাই বল বাপু, কবিতাটা কিন্তু বেশ হয়েছ। আহা, কি সরল স্বীকারোক্তি ও আন্তরিকতা। শোনো না –

হে হরি, হে দয়াময়
কিছু মার্ক দিও আমায়
তোমার শরণাগত
নহি সতত
শুধু এই পরীক্ষার সময় -- !

রবীন্দ্রনাথ আরো বললেন, ওর বয়সের কথা ছেড়ে দাও। এমন কজন প্রবীণ ভক্ত কবি আছে যে প্রশ্নপত্রের দশটি অঙ্কের উদ্যত খাঁড়ার সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে আত্মনিবেদন করতে পারে। ওকে অঙ্ক কষাতে চেষ্টা কর -- তা বলে কবিতা লেখায় বাধা দিয়ো না।"

অতএব গুরুদেবের রায়ে বেকসুর খালাস হলেন প্রমথ। শিক্ষক নগেন আইচ প্রমথর অঙ্কের খাতা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন , "নাও, এখন থেকে অবাধে কবিতা লিখে যাও, কেউ বাধা দেবে না "

(সূত্র; প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, কলকাতা -- বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৫১)

তোমার পরশ আমার মাঝে

শান্তিনিকেতনে পরীক্ষার সময় একবার একটি মেয়ে এসে রবীন্দ্রনাথকে বলল, "আজ বাংলা পরীক্ষা, আমার কলমে একবারটি লিখে দিন আপনি তাহলে অনেক নম্বর পাব আমি।" রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে কলমটি দিয়ে লিখতে লিখতে বললেন, "তুই তো জানিস নে পরীক্ষায় আমি কোনোদিন পাশ করি নি। আমার হাতে লিখিয়ে শুধু চটিয়ে দিলি পরীক্ষা সরস্বতীকে।" মেয়েটি বলল, "অন্য বিষয়ের দিন তো কলম দিই নি, বাংলার দিনে দিয়েছি। আপনি যে বাংলা খুব ভাল জানেন।" রবীন্দ্রনাথ খুব মজা পেলেন। কলমটা ফেরৎ দিয়ে মেয়েটিকে স্নেহের সঙ্গে বললেন, "তবু ভাল যে বাংলা অন্তত জানি, না রে ? নইলে কি হত আমার ?"

(সূত্র -- নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ছোটদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু বসু ও অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত, নানাজনের রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, পুনশ্চ, ২০০৩)

নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে

১৯১৬। প্রথমবার জাপান ভ্রমণে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। টোকিয়ো স্টেশনে তাঁকে দেখতে ঐতিহাসিক ভিড়। কবি আসার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই টোকিয়োর স্টেশন মাস্টারের ঘরে বাবার কোলে চড়ে একটি কাঠের স্তম্ভে মালা পরিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনার মহড়া দিয়েছে তিন বছরের ছোট্ট মেয়ে আকিকো। আকিকোর বাবা য়াসুরোকু সোয়েজিমা ছিলেন জাপানে রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সদস্য। নির্দ্দিষ্ট দিনে টোকিয়ো স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলেন রবীন্দ্রনাথ। তেরো বছরের দিদির কোলে চড়ে তিন বছরের আকিকো রবীন্দ্রনাথকে পরিয়ে দিল একটি মালা। সে

১৯২৯ সালে জাপানে রবীন্দ্রনাথ। ফুলের তোড়া হাতে কবির বাঁদিকে আকিকো সোয়েজিমা। এই আকিকোই ১৯১৬ সালে ৩ বছর বয়সে মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের গলায়।

বারই আকিকোর জন্য জাপানি তুলি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিলেন একটি কবিতা –

নবীন শিশুর কোলে
জাপান নবীন
পাঠাইল বরমাল্যখানি
প্রাচীন কবির মুখে
প্রাচীন ভারত
পাঠাইল আশীর্ব্বাদবাণী।

(সূত্র -- কাজুও আজুমা, জাপান ও রবীন্দ্রনাথ; শতবর্ষের বিনিময়, কলকাতা; এন.ই. পাবলিশার্স ২০০৪)

(নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গল্পের নাম রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থ থেকে সংকলিত) ❑

শান্তিনিকেতনে পবিত্র-পরিবার -
১২১ বৎসর আগেকার একটি দৃশ্য

- মাসাইয়ুকি উসুদা

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্মৃতিও স্বাভাবিকভাবে অতীতে, আরও অতীতের দিকে, অবশেষে অল্পবয়সের "স্মৃতিবনের উজ্জ্বল ঝাপসার" মধ্যে চলে যায়। আমার মনের গতিও এই সর্বজন প্রচলিত মধুর পথে প্রবেশ করেছে। কিছু প্রবীণ, কিছু বিগত, কিছু লুপ্ত বিষয় বা ঘটনা সম্বন্ধে বলা এখন আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় ও আনন্দদায়ক হয়েছে বটে।

শান্তিনিকেতন নিয়ে কিছু লিখবেন – "অঞ্জলির" সম্পাদক রঞ্জনবাবু-র প্রস্তাবে একটু ভাবতে হয়েছে। আজকের দিনের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে একজন বিদেশী লিখলে তেমন মজার লেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ বর্তমান প্রজন্মের বাঙালীরা বোধহয় জানেন না সেই পুরোনো দিনের শান্তিনিকেতনের ছবি আঁকতে পারলে কেমন হয়!

যাইহোক, এই প্রবন্ধে যে বিবরণটি দিতে চলেছি, তা কিন্তু আমার নিজের নয়। একজনের লেখা বই থেকে উদ্ধৃত করব। ১৯৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করা আমার পি.এইচডি প্রবন্ধের বিষয় ছিল বরিশালের স্বদেশী যুগের জননেতা অশ্বিনী কুমার দত্তের জীবন-সমীক্ষা। গবেষণার সময় একটি বই হাতে পেয়েছিলাম। সেটা দ্বিখণ্ডে প্রকাশিত একজন গৃহবধূর জীবন-চিত্র। মহিলাটি অখ্যাতনামা। ইহলোকে বিশেষ কিছু কীর্তি রেখে যান নি। তা সত্ত্বেও তাঁর স্বামী তাঁর জীবন-কাহিনী লিখেছিলেন কেন? মহিলাটির স্বামী নিজের ভাষায় একথা বলেছেন – "বঙ্গদেশে অন্য কোনও ব্যক্তি নিজের গৃহিণীর জীবন-চিত্র লিখেছেন বলিয়া জানি না। এই দুঃসাহসের কার্য্য শুধু আমিই করিলাম"[১]

এই বইটির লেখক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, আর যাঁর জীবন-চরিত্র স্বামীর হাতে লেখা হয়েছে, তিনি মনোরমা গুহঠাকুরতা। বইটির নাম "মনোরমার জীবন-চিত্র"। এর প্রথম খণ্ড ১৯১৪ সালে আর দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়। প্রায় চল্লিশ বছর আগে, সঠিক ভাবে বলতে গেলে ১৯৭২ সালে কলকাতার "অধ্যয়ন" থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির মধ্যে আজ থেকে ১২১ বছর আগেকার শান্তিনিকেতনের যে বিবরণ আছে, তা থেকে উদ্ধৃত করার আগে গুহঠাকুরতাদের কাহিনী ও কথা প্রসঙ্গে একটু বলতে চাই।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (১৮৫৮-১৯১৯) স্বদেশী যুগের খ্যাতনামা জননেতা। বাখেরগঞ্জ জেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম বানারিপাড়ায় (অনেকেই বিকৃত করে বানরীপাড়া বলে উল্লেখ করে)[২] তাঁর পৈত্রিক নিবাস।

যৌবনে ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শে এসে তিনি সেই ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রচারক হন। পরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে হিন্দুধর্মের সাধনপথে ফিরে আসেন। ১২৮৩ সালের বসন্তে (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) ১৮ বছর বয়সের মনোরঞ্জন ও ১২ বছর বয়সের মনোরমার বিয়ে হয়। মনোরমার পিতা কালীকুমার তাঁর ব্রাহ্মণভক্তি ও বদান্যতার জন্য "দাতা কালীকুমার" নামে তখনকার বিক্রমপুরের হিন্দু সমাজে পরিচিত ছিলেন। লোকেরা মুখে মুখে "কলিতে কালীকুমার" বলে সম্মান প্রকাশ করত। মনোরঞ্জন তাঁর হাতের রত্ন মনোরমা সম্বন্ধে এমন লিখেছিলেন – "যিনি দেখিতে রূপসী ছিলেন না, বাক্যে পটু ছিলেন না, কার্য্যেও সু-চতুরা ছিলেন না, এমন সাদাসিধে বাঙ্গালী ঘরের একটি মেয়ে[৩] ছিলেন।"

তবে মনোরঞ্জন মনোরমাকে অত ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন কেন? "মনোরমা-কে পাইয়া মনে করিতাম, আমার অপেক্ষা সুখী জগতে আর কেহই নাই। তুমি রাজা হও, বিদ্বান হও, আমার অপেক্ষা সুখী হইতে পারিবে না।"[৪] এমন লিখতে মনোরঞ্জন একটুও দ্বিধা অনুভব করেন নি। তিনি এখানে কিন্তু শ্রদ্ধার কথা বলছেন না, বলছেন ভালবাসার কথা। মনোরমার স্বভাবের মধ্যে যে অতি সরল স্বাভাবিক অমায়িকতা ছিল, তা তুলে ধরার ভঙ্গিটি মনোরঞ্জনের লক্ষণীয়। "মনোরমা বাল্যকাল হইতেই অল্পভাষিণী ছিলেন, কিন্তু অল্পভাষী লোকেরা অনেক সময়েই অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া থাকে, মনোরমা সেরূপ ছিলেন না। প্রফুল্লতা তাহাকে সর্ব্বদা সরস করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাঁহার অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি সর্ব্বদাই বিরাজিত ছিল।"[৫]

যাইহোক, মনোরমার চরিত্রে যতই আকর্ষণীয় দিক থাক না, শুধু সেই জন্যে মনোরঞ্জন নিজের স্ত্রীর জীবন-চরিত লেখার মত দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হন নি। মনোরমার আসল পরিচয় ছিল "ধ্যান-ধারণা সমাধির জীবন্ত সাক্ষী।"[৬]

মনোরঞ্জন মনোরমা উভয়ের গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে গুরু প্রদত্ত মন্ত্র-নাম জপ শুরু হয়ে যায় এবং মনোরমা অনতিবিলম্বে সমাধিস্থ হন। সমাধি হল সব সাধকের সর্বশেষ গন্তব্য, চূড়ান্ত কাম্য। কিন্তু মনোরমা সেই শেষ অবস্থায় বিনা চেষ্টাতেই পৌঁছান। এমনটি হল কি ভাবে? একটি সম্ভাব্য কারণ হয়ত এই যে পিতা কালীকুমার পর্যন্ত সব পূর্বপুরুষ যে পুণ্য কর্মফল অর্জন করেন, সেই সঞ্চিত ধন অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। অথবা স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যেমন লিখেছিলেন, সেই কারণটিও হয়ত অলক্ষ্যে কাজ করেছিল। তিনি লেখেন, "একটি কুলবধূ সংসারধর্ম করিয়া নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট ও অভাবের মধ্যে কেমন করিয়া ধর্মলাভ করিতে পারে, মনোরমা তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইতে আসিয়াছিলেন।"[৭]

সমাধি অবস্থাতেও বোধহয় ধাপে ধাপে উন্নতির সোপান থাকে। ক্রমশঃ মনোরমা ইচ্ছানুযায়ী সমাধিস্থ হতে পারার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। অবশেষে ২৪ বছর বয়সে "কামপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে"[৮] - এমন অবস্থাতে পৌঁছান। মনোরঞ্জন মনোরমার সমাধিস্থ অবস্থা স্বচক্ষে দেখে অনুভব করেন যে, স্ত্রী যেন নতুন জীবন পেয়েছেন। মনোরমার এর পরেও নিজের বাড়ীতে বাস করতে হলে তাঁর সাধন পথে বিঘ্ন ঘটবে -- এটা বুঝতে পারার পর মনোরঞ্জন তাঁকে স্বাধীনভাবে বসবাসের জন্য এমন কোথাও নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যেখানে তিনি নির্বিঘ্নে সাধন-ভজন অব্যাহত রাখতে পারবেন।

এর পর দেবীতুল্য মনোরমা-কে কেন্দ্র করে ছোট সন্তান-সন্ততি সহ এই পবিত্র-পরিবারের ভবঘুরে জীবন আরম্ভ হয়। পরে মনোরঞ্জনকে ধর্ম-প্রচারকের কাজ পরিত্যাগ করতে হয় এবং গুরু

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আদেশে এই পবিত্র-পরিবারকে পাঁচটি কঠিন ব্রত পালন করতে হয়, যেমন অর্থোপার্জনের চেষ্টা ত্যাগ করা, কারও কাছে কিছু না চাওয়া, কারও কাছে নিজেদের অভাব না জানানো ইত্যাদি।(১০)

মনোরমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় আত্মীয়স্বজনেরা তুমুল আপত্তি করলেন, তবু সেই পরিবারের আদরের ধন মনোরমা অবিচলিতভাবে স্বামীর সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করেন। মনোরমার ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবারের চলার পথ স্থির হল। আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে, মনোরমার সিদ্ধান্ত পতিব্রতা নারীর ঐতিহ্যগত আদর্শের প্রতিফলন। আসলে কিন্তু এর মধ্য দিয়ে লিঙ্গ নিরপেক্ষতা ভিত্তিক অতি আধুনিক সামাজিক সম্বন্ধ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। বাস্তবিকই মনোরমার এই সিদ্ধান্তে অন্তত যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একটি দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবার বেরিয়ে এল।(১১)

এ রচনায় এই পরিবারের শান্তিনিকেতনে গমনের যে কাহিনীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, সেটা ঘটেছিল মনোরমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পরার অনতিবিলম্বে। গ্রাম ছেড়ে বরিশালে থাকাকালীন মনোরমা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন লাখটিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার রায় বংশের কন্যা সুশীলা তাঁদের শান্তিনিকেতনে হাওয়া বদলের জন্য কিছুকাল গিয়ে থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। সুশীলা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধু।

গুরুঠাকুরতারা ১২৯৬ সালের ২৬শে আষাঢ় (৯/৬/১৮৮৯) থেকে ১৮ই শ্রাবণ (২/৮/১৮৮৯) পর্যন্ত, অর্থাৎ দেড় মাসের একটু অধিক সময় বোলপুরে ছিলেন।(১২) নিম্নে "মনোরমার জীবন-চিত্র" থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করব।

[বোলপুর যাত্রা] "কলিকাতায় দুই তিন দিন থাকিয়া আমরা বোলপুরে রওনা হইলাম। হাবড়ায় গিয়া জানিলাম, লুপ লাইনের গাড়ী এইমাত্র ছাড়িয়া গিয়াছে। বৈকালে গাড়ী আছে। সে গাড়ী সন্ধ্যার সময়ে বোলপুরে পৌঁছিবে। কি করি ! হাবড়ায় বসিয়া থাকা অথবা বাড়ীতে ফিরিয়া আসা অপেক্ষা একটি লোকাল ট্রেন ধরিয়া কোন্নগর পর্যন্ত যাওয়াই ভাল মনে করিলাম। সেখানে কোনো একটা দোকানে রান্না করিয়া খাইব ভাবিলাম। মহেশ্বর পাসার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ঘোষ বি.এ. আমাদিগকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তিনি কোন্নগর অবধি আমাদের সঙ্গে চলিলেন। সেখানে নামিয়া স্টেশনের কাছে একটা বাগানবাড়ী পাইলাম। মুদীর দোকানও কাছেই ছিল। সেই বাগানের মালীকে বলিয়া সেখানে খিচুড়ী রান্না করা হইল। বিকালের ট্রেন ধরিয়া সন্ধ্যাবেলা বোলপুর স্টেশনে পৌঁছিলাম। ঠাকুরবাবুদের আদেশানুসারে বোলপুর শান্তিনিকেতনের আশ্রমধারী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (ইনি এখন একজন বিখ্যাত বাংলা লেখক) মনোরমার জন্য স্টেশনে পাল্কী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা নির্দ্দিষ্ট ট্রেনে না পৌঁছানোয় বেহারাগণ স্টেশন হইতে ফিরিয়া যাওয়ার ফলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বোধহয় ভাবিয়াছিলেন যে আমাদের আসা হইল না। তাই তিনি আর স্টেশনে লোক পাঠান নাই। কাজেই আমরা কি করিব, কোথায় যাইব স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে একখানি গরুগাড়ী ভাড়া করা হইল। আমাদের নদী-নালার দেশের লোকেরা গরু-র গাড়ী কখনো চক্ষেও দেখে নাই, আমরাও জীবনে কখনো গরু-র গাড়ী চাপি নাই। গাড়ী কিছুদূর চলিতে না চলিতেই আমরা বমি করিতে লাগিলাম। ছেলেগুলি কাঁদিতে লাগিল। শেষে উপেন (উপেন্দ্রনাথ মজুমদার, সাং মহেশ্বর পাসা, খুলনা) ও আমি ছেলেদুটিকে সঙ্গে করিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। গোরু-র গাড়ীর মতন এমন সুখের বাহন আর নাই, হয় পেটের ভাত হজম করাইবে, না হয় উদ্গিরণ করাইবে। যাহা হউক, প্রায় এক ঘন্টার মধ্যেই আমরা শান্তিনিকেতনে পৌঁছিলাম। যে স্থানে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত, সে স্থানটির নাম ভুবনডাঙ্গা।" (১৩)

[প্রকাণ্ড মাঠ] "রাত্রে আশ্রমধারী মহাশয় আমাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, ক্লান্তিবশতঃ আমরা সুখে নিদ্রা গেলাম। প্রভাতে উঠিয়া আমরা ঘুরিয়া-ফিরিয়া আশ্রম দেখিতে বাহির হইলাম। বোলপুরে আসা সম্বন্ধে আমি যখন শ্রী শ্রী গুরুদেবের আদেশ চাহিয়াছিলাম, তখন আদেশ প্রদান করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "বোলপুর স্থানটি বেশ। খুব প্রকাণ্ড মাঠ আছে। সেদিকে তাকাইলে একটা অনন্তের ভাব প্রাণে জাগিয়া উঠে।" আজ বাহির হইয়াই তাঁহার সেই কথা স্মরণ হইল এবং তাঁহার কথিত ভাবটি হৃদয়ে অনুভব করিলাম। প্রকাণ্ড মাঠ; আমাদের দৃষ্টিব্যাপিকা রেখা উহার অর্দ্ধপথে নিবৃত্ত হইয়াছে। ছেলেদুটি মনের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া মাঠে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমাদের সকলের মনেই নূতন দেশে আসার নূতন আনন্দ জাগিয়া উঠিল।" (১৪)

[শান্তিনিকেতনের দৃশ্য] "ভুবনডাঙ্গা বোলপুর সাবডিভিশন হইতে দু মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। ডাঙ্গা-র অর্থ উচ্চভূমি, পশ্চিমে ইহাকে টাঁড় বলে। রায়পুরের সিংহ মহাশয়েরা এইসকল জমির স্বত্ত্বাধিকারী, সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (Mr. S.P.Sinha) মহাশয় এই পরিবারের উজ্জ্বল রত্ন। শান্তিনিকেতনের ছাদ হইতে সিংহ মহাশয়দিগের বাড়ী দেখা যায়। উক্ত সিংহ পরিবারের একজন কর্ত্তার সহিত প্রধান আচার্য মহাশয়ের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি তপস্যার জন্য এই ডাঙ্গাটির কতকাংশ মহর্ষিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে এই মাঠে দিনে ডাকাতি হইত; তখনও সপ্তপর্ণী বৃক্ষমূল খনন করিলে মানুষের মাথা পাওয়া যায়। দিব্য দোতলা প্রাসাদ, ঘরগুলিতে কার্পেট পাতা। আসবাব জিনিসপত্র সমস্তই ধনীজনোপযোগী। প্রাসাদের সঙ্গে সুন্দর বাগান, মাঝে মাঝে শাল বৃক্ষ। সেখানে যা কিছু আছে সমস্তই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝর্ ঝরে। অদূরে সপ্তপর্ণী বৃক্ষতলে মর্ম্মর রচিত বেদী। সেই বেদীতে বসিয়া মহর্ষি উপাসনা করিতেন। সেখান হইতে সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বতশ্রেণী নীলবর্ণ মেঘমালার ন্যায় প্রতিভাত হয়। সাধনের উপযুক্ত স্থান বটে।"] (১৫)

"আজকাল ভুবনডাঙ্গায় সে নির্জ্জনতা নাই। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং ছাত্র ও শিক্ষকগণে ভুবনডাঙ্গা পরিপূর্ণ; খেলাধূলা, গানবাদ্য, বক্তৃতা, অভিনয় ও অধ্যয়ন অধ্যাপনায় স্থানের অবস্থা অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তখন সেখানে একটি মাত্র ভবন ছিল "শান্তিনিকেতন"। কিন্তু এক্ষণ প্রকাণ্ড ও সুসজ্জিত ব্রাহ্মমন্দির উঠিয়াছে। রবিবাবুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অনেক ঘর-বাড়ী। তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটা বাড়ী উঠিয়াছে। আগে সেখানে গেলে মনে হইত যেন শুধু পরমার্থচিন্তার জন্যই এখানে আসা। এখন সেখানে গেলে অনেক কাজের কথা মনে আসে।" (১৬)

[দৈনন্দিন জীবন] "আশ্রমধারী অঘোরবাবু আমাদের সংসার পাতিয়া দিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম ছিল যে, যতদিন আমি শন্তিনিকেতনে সপরিবারে থাকিব, আমাদের সমস্ত সংসার খরচ ঠাকুরবাবুদের সরকার হইতে দেওয়া হইবে। আমাদের আবশ্যক মত অঘোরবাবু সমস্ত জিনিসপত্র জোগাড় করিয়া দিলেন। রান্না করার জন্য একটি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু দুই দিন তাহার রান্না খাইয়াই আমরা বুঝিলাম যে ইহার হাত হইতে মুক্তিলাভ না করিতে পারিলে রক্ষা নাই। কিন্তু তখন মনোরমার শরীর অসুস্থ,

কাজেই বাধ্য হইয়া আরও কিছুদিন তাহার কৃত ব্যঞ্জনরূপ পাচন সেবন করিতে হইল । তবে যথেষ্ট দুগ্ধ ছিল, এ জন্য আহারে অসুবিধা হইত না ।" (১৭)

[পায়চারি ও মেলামেশা] "আমরা ছেলেদের লইয়া সকাল-বিকাল বেড়াইতাম । কন্যাটিকে হিন্দুস্থানী ঝি কোলে করিয়া লইত। উপেন এবং আমি ছেলেদুটির হাত ধরিয়া মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া অনেক দূরে বেড়াইতে যাইতাম । ছেলেরা আমাদের হাত ছাড়িয়া দিয়া পাথর কুড়াইত এবং ছুটাছুটি করিত । ফিরিয়া স্নান করিয়া আমরা পারিবারিক উপাসনা করিতাম । অঘোরবাবু এবং কখনো-কখনো তাঁহার পত্নী আমাদের উপাসনায় যোগ দিতেন । বোলপুরের কয়েকটি ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন । ইঁহাদের মধ্যে শ্রী মহাপ্রভুর প্রিয়স্থান কুলীনগ্রামের বসু রামানন্দের সন্তান শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় একজন । ইনি বোলপুরের একজন প্রধান উকীল । ইঁহারা ব্রাহ্ম ধর্মানুরাগী ছিলেন এবং আমার সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন । যেদিন সময় ও সুবিধা হইত সেদিন মনোরমা ধ্যানে বসিতেন । অঘোরবাবু প্রভৃতির নিকট ইহা গোপন রাখার চেষ্টা হইত, তথাপি বেশী দিন গোপন থাকিল না ।"(১৮)

[প্রাসাদে বাসের প্রতি মনোরমার অনিচ্ছা] "শান্তিনিকেতনের দিব্য প্রাসাদে আমাদের বেশী দিন বাস করা হইল না । একদিন মনোরমা বলিলেন, "এ বাড়ী আমার ভাল লাগিতেছে না । এখানে বাস করিতে কেমন একটা ভাব মনে আসে, যাহা আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে মিশ খায় না ।" আমি বলিলাম, "এমন চমৎকার বাড়ীতে বাস করা আমাদের অবস্থার লোকের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়, বিশেষত স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি । এরূপ অবস্থায় এমন উৎকৃষ্ট প্রাসাদে বাস করিতে তোমার ইচ্ছা হইতেছে না কেন ?" মনোরমা আমার কথার উত্তরে বিশেষ কিছু বলিলেন না, তবে বুঝা গেল তাঁহার মনে কেমন একটা ভাব আসিয়াছে । যাহাহউক, এ বিষয় লইয়া সেদিন আর কোনো কথা হইল না, কেননা বোলপুরে থাকিতে হইলে এই বাড়ীতে থাকিতে হইবে, অন্য উপায় নাই ।" (১৯)

[উপযুক্ত কুটির আবিষ্কার] "ইহার পরে একদিন বিকাল বেলায় বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ দিকে অনেকটা দূরে চলিয়া গেলাম। সম্মুখেই একটি জলাশয় দেখিলাম। সেটি একটি উচ্চ বাঁধে বেষ্ঠিত দহ । দহটি বেশ বৃহৎ । বৈকালিক সমীর সঞ্চারে উহাতে বীচিমালা নৃত্য করিতেছে । চারিদিকে তালবৃক্ষের শ্রেণী । সেই শ্রেণীবদ্ধ তালবৃক্ষরাজি নীলাকাশে মস্তক তুলিয়া বীচিভঙ্গির সঙ্গে দহের জলে আপনাদের নৃত্যভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছে এবং মাথা নাড়িয়া অবিশ্রান্ত সোঁ সোঁ রবে একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছে। স্থানটি বেশ নির্জ্জন। দহের উত্তর তীরে একখানা খড়ো বাংলো পোড়ো ঘর হইয়া রহিয়াছে। ঘরের সম্মুখে পূর্ব্বদিকে উঠান । উঠানটি শ্রেণীবদ্ধ আমলকী বৃক্ষে ঘেরা । উহাকে আমলকী কুঞ্জ বলিলে ব্যর্থ নাম হয় না । এই স্থানটি মনোরমার বড়ই পছন্দ হইল । তিনি বলিলেন, যদি এই ঘরখানা আমাদের বাসের জন্য পাওয়া যায়, তবে ভাল হয় । আমি মনে মনে ভাবিলাম যে এরূপ প্রস্তাব শুনিলেও লোকেরা পরিহাস করিবে । এমন প্রাসাদ ছাড়িয়া সাধ করিয়া কোন ব্যক্তি কুটিরে বাস করিতে ইচ্ছা করে ! যাহা হউক, তখন মনোরমার প্রতি আমার এতটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তিনি যাহা কিছু ইচ্ছা করিবেন তাহা কল্যাণকর হইবে, কখনো অমঙ্গলজনক হইবে না । অতএব তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য মনে করিলাম । কিন্তু আমার মনে একটা আশংকা

জন্মিল--যদি বা এই বাড়ীতে বাস করার অনুমতি পাওয়া যায় (আমাদের শান্তিনিকেতনে বাসেরই কথা ছিল), তবু এরূপ নির্জ্জন স্থানে একেবারে সহায়সম্বলহীন হইয়া শিশু সন্তানগুলি লইয়া থাকা উচিত কি না । আমার একটু ভয়ের সঞ্চার হইল । সেকথা মনোরমাকে বলিলাম । শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া আশ্রমধারী অঘোরবাবুকে আমাদের প্রার্থনা জানাইলাম । তিনি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিলেন । তাঁহার মুখে শুনিলাম যে ঐ আমলকীকুঞ্জই মহর্ষি মহাশয়ের প্রথম সাধন-ভজনের স্থান । ইহা শুনিয়া ঐ স্থানটির উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল, এবং মনোরমা যে উৎকৃষ্ট স্থান মনোনীত করিয়াছেন তাহা বুঝিলাম ।"(২০)

[কুটিরে সুখে থাকা] "প্রাসাদ ছাড়িয়া আমরা কুটিরে আসিলাম । মূল্যবান পালঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয্যা পাতিলাম । মনোরমার মনের প্রফুল্লতা দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি যেন কেমন একটা বদ্ধ ভাবের মধ্য হইতে মুক্তি লাভ করিলেন । দহের জলে স্নান করিতে আমাদের বড়ই আনন্দ বোধ হইত । পাচক ব্রাহ্মণকে বিদায় করা হইল । মনোরমা দু বেলা স্বহস্তে রান্না করিতে লাগিলেন।(২১) আমরা প্রাণ ভরিয়া আহার করিয়া তৃপ্ত হইতে লাগিলাম । প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা সংক্ষেপে পারিবারিক উপাসনা করিতাম। তাহার পর বেড়াইয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করা হইত । খোসা ছাড়ান পানিফল দুই পয়সায় প্রায় এক মাস পাওয়া যাইত। উহা আমাদের জলযোগের একটা অঙ্গ হইল। খাঁটি দুগ্ধ তখন ষোল সের এক টাকায় মিলিত । মনে হয় আমাদের চারি সের দুগ্ধের বন্দোবস্ত ছিল । কখনো কখনো সুজির পায়েস অথবা মোহনভোগ দ্বারা আমরা জলযোগ করিতাম । মনোরমা যখন রান্না করিতেন, শ্রীমান উপেন ও আমি তখন কখনো গ্রন্থ পাঠ, কখনো ধর্মালোচনা করিয়া সময় কাটাইতাম । উপেন্দ্র সুকণ্ঠ গায়ক, তাঁহার মুখে ভগবানের নাম শুনিয়া আমরা বড়ই তৃপ্তি লাভ করিতাম । যখন আমাদের হিন্দুস্থানী ঝি গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিত, তখন উপেন ও আমি ছেলেদের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতাম। বেলা ১টার সময়ে প্রায় অধিকাংশ দিন মনোরমা ধ্যানে বসিতেন। চারিটার সময়ে আমি তাঁহার কানে অস্ফুট স্বরে

গুরুদত্ত নাম করিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতাম। পাঁচ-সাত বার নাম করিলেই তিনি একবার কান ফিরাইয়া নিতেন। মনে হইত যেন তাঁহার বাহ্যজগতে ফিরিতে ইচ্ছা নাই। তথাপি আমি পুনঃ পুনঃ নাম করিয়া তাঁহাকে অমৃতলোক হইতে এই অসার কোলাহলময় মর্ত্যলোকে লইয়া আসিতাম। এক এক দিন তাঁহাকে জাগাইবার সময়ে আমার মনে হইত, আমি মহাপাপ করিতেছি। প্রাণপণ করিয়া যে অবস্থার বিন্দুমাত্র আভাস লাভ করিতে পারি না, অন্যকে সাংসারিক কার্য্যের অনুরোধে সেই অবস্থা হইতে জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিতেছি। কিন্তু মনোরমা প্রতিদিনই ধ্যানে বসিবার সময় বলিতেন যে চারিটার সময় আমাকে উঠাইও। ধ্যান-ধারণার গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে পরিজনগণের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানও তাঁহার ক্রমশঃ গভীর হইতেছিল। একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, পূর্ব্বে যেমন উপাসনা করিতে বসিলেই তাঁহার সমাধি হইত, বাধা দিতে পারিতেন না, আজকাল সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন সমাধির ইচ্ছা না করিলে আর সমাধি হয় না। এ অবস্থাটি বরিশালে থাকিতেই হইয়াছে।

বিকাল চারিটার পরে মনোরমা ধ্যান হইতে উঠিয়া, সকলকে জলখাবার দিয়া নিজেও কিছু আহার করিলে আমরা সকলে মিলিয়া বেড়াইতে বাহির হইতাম সন্ধ্যের সময়ে উপাসনায় যোগ দিয়া তিনি আবার সংসার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপে কিছুদিন বেশ মনের আনন্দে কাটিল।"[২২]

[জ্যোতি-দর্শন) "একদিন আমি বোলপুর স্টেশনের দিকে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। রাস্তায় একটি শালবন। তখন বেলা ৮টা হইবে। আমি শালবনের শোভায় মুগ্ধ হইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। হঠাৎ শালবৃক্ষস্থ একটি দাঁড়কাকের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল, আর আমি চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। সেই কাকের দেহে যে কতই জ্যোতির বিকাশ হইয়াছে, সে জ্যোতি যে কি অপূর্ব জ্যোতি, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। এই সময় প্রবল বেগে আমার অন্তরে গুরুদত্ত নাম চলিতে লাগিল, চরাচর আনন্দময় হইয়া গেল, আমি সেই জ্যোতির সাগরে ডুবিয়া গেলাম। কাকটি যখন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া যাইতে লাগিল, আমি তাহাকে অনুসরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে যখন উড়িয়া সুদূরে চলিয়া গেল, পলকের জন্য আমি যেন সমস্ত অন্ধকার দেখিলাম। আরও কত রহিয়াছে, কিন্তু আর কাহারও মধ্যে আমার সেই জ্যোতিদর্শন হইল না। আমার মনে হইতে লাগিল যেন এই কাকের মধ্য দিয়া দয়াময় হরি আমাকে তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতির -- ব্রহ্মজ্যোতির আভাস দেখাইলেন। যাঁহারা দার্শনিক পণ্ডিত, তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, উহা আমার মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত ভ্রান্তিদর্শন, কিন্তু আমি এই দীর্ঘকাল আর একবার ঐ রূপ দর্শনের আশা করিয়া রহিয়াছি। কাক চলিয়া গেলে আমি যেন কি অমূল্য রত্ন হাতে পাইয়া হারাইলাম বোধ হইল। আর স্টেশনে যাওয়া হইল না, ফিরিয়া বাড়ী আসিলাম। তাহার পরের দিন আবার সেই দৃশ্য দর্শনের আশায় লালায়িত হইয়া সেইরূপ সময়ে সেই শালবনে গেলাম, শালবৃক্ষের ডালে ডালে অনেক কাক দেখিলাম, কিন্তু যে বস্তু দেখিতে গিয়াছিলাম তাহা আর দেখিলাম না।"[২৩]

[উপসংহার] : মনোরঞ্জন লিখেছেন -- বোলপুরে "মনোরমা সঙ্গে থাকাতে সকলেরই মন বিশেষ ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ ছিল।"(২৪) আসলে এই দৃশ্যের অবতারণা হয় ঊনিশ শতাব্দীর শেষে, যাকে হিন্দু পুনরুত্থানের যুগ বলা হয়। সেই যুগপ্রবাহেরই দৈনন্দিন চেহারা বলে মনে করি এই দৃশ্যকে। ভারতীয় সভ্যতার উন্নতির যুগে পাঠকবৃন্দ কি ভাববেন, জানার অপেক্ষায় রইলাম।❑

[পাদটীকা]

(১) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" দ্বিতীয় খণ্ড। (পুনঃপ্রকাশন) কলকাতা ১৯৭২, পৃ ২

(২) মনীন্দ্রকুমার ঘোষ, "সাময়িকী" কলকাতা ১৩৮৪, পৃ ১৩

(৩) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৯২

(৪) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" প্রথম খণ্ড, পৃ ৩

(৫) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" প্রথম খণ্ড, পৃ ২৯

(৬) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৯২

(৭) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" প্রথম খণ্ড, পৃ ৪

(৮) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৮৭

(৯) অশ্বিনী কুমার দত্ত ১৫ই ফাল্গুন ১৩২০ তারিখের পত্রে মনোরঞ্জনকে জানিয়েছেন, "যে দেবীর সঙ্গে তুমি গ্রথিত তাহার কথা মনে হইলে আর এক লোকে উপস্থিত হই।" একটু পরে এ কথাও লিখেছেন, "আমি তাঁহাকে দেবী লিখিলাম, তাহা কিন্তু তোমাদের আজকালকার ধরণের দেবী নহে।" (ঐ প্রথম খণ্ড, পৃ ৪)

(১০) ঐ প্রথম খণ্ড পৃ ১৮১

(১১) এক বিশেষ গণ্ডীর মধ্যস্থ লোকেরা মনোরমাকে গুরুবাক্যের জীবন্ত সাক্ষী আর গীতাতে যা বলা হয়েছে, সেই সব বাণীর প্রতিপন্নকারিনী রূপে সম্মান করতেন। তাদের চেতনার ভিতরে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টো আকার ধারণ করল। আসলে মনোরমার সমাধিতে গীতার তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু তারা ধরে নিলেন যে মনোরমার সমাধি গীতাবাক্যের মতই হয়েছে, তাই সে সত্য ও নির্ভরযোগ্য। মনোরঞ্জন হোক (ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত "গীতার প্রমাণ" দ্রষ্টব্য), ডন পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হোক (ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২১, ২৯-৩২, ৪৮-৫১, ১৭৫), এ যুগের প্রায় সব মনীষীদের মনোভঙ্গি অভিন্ন।

(১২) ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ ১২৭

(১৩) ঐ, পৃ ১১৭-- ১১৮

(১৪) ঐ, পৃ ১১৮

(১৫) ঐ, পৃ ১১৮ --১১৯

(১৬) ঐ, পৃ ১১৯

(১৭) ঐ, পৃ ১১৯--১২০

(১৮) ঐ, পৃ ১২০

(১৯) ঐ, পৃ ১২০-- ১২১

(২০) ঐ, পৃ ১২১ -- ১২২

(২১) মনোরমা গৃহকর্ম করার সময়েও আনন্দ অনুভব করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর স্বামী মনোরঞ্জন লিখেছেন, "নামানন্দ সর্ব্বদা বিষয়ানন্দের সঙ্গী ছিল। লুচী ভাজিতেছেন, লুচীগুলি ফুলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া বালিকার মতন আনন্দে অধীর হইতেছেন। তরকারী কুটিতেছেন, মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোনও কাজের মধ্যেই আনন্দের বিরাম নাই, কাজেই কোনও কাজেই বিরক্তি নাই।" (ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৯১)

(২২) ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ ১২২--১২৩

(২৩) ঐ, পৃ ১২৩--১২৪

(২৪) ঐ, পৃ ১২৬

আমার জীবনে -- আপনি, রবি ঠাকুর

- সুপর্ণা বসু

শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

রোজ সকালের ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা আর আনন্দবাজারের সঙ্গে; শনিবারের মাঝ-সকালের দ্বিতীয় কাপের সঙ্গে; মাইসোর রোডের বোসবাবুর মধ্যাহ্ন ভোজনের কিছুক্ষণ পরেই; সাড়ে চারটেয় "মধু মহলে"র গরম গরম সিঙাড়ার সঙ্গে; রাধুবাবুর দোকানের সান্ধ্য চা-কবিরাজি-আড্ডার সঙ্গে; জ্যোতিবাবুর আমলে সন্ধ্যেবেলায় লোডশেডিংয়ে মায়ের গলায় জর্জ মামার(বিশ্বাস) পছন্দের গানে -- আপনি রোজই ছিলেন বর্তমান। বাঙালির সর্বঘটে কাঁঠালিকলা, গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর মত আপনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন।

জ্ঞান হবার পর থেকে দেখছি সবুজ রঙের চুনকাম করা দেওয়ালে দাদু-দিদা-ঠাকুর্দা-ঠাকুমার ছবির পাশেই আপনার শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত সেপিয়া টোনের ছবি টাঙানো। শুধু আমাদের বাড়িতে নয় -- পাইকপাড়ার ছোটপিসি, কালিঘাটের নিশীথকাকু, ব্রহ্মপুরের নির্মলমামু, মৌলালির নমিতা মাসি, ডোভার লেনের ঊষা মাসিমা-- সকলের বাড়িতেই আপনার ছবি ছিল। আপনি তো পরিবারের একজন !

ইস্কুলে গিয়েও রেহাই নেই । যে আপনি ইস্কুলের ছকে বাঁধা পড়াশুনো পছন্দ করতেন না, সেই আপনার প্রবল-প্রতাপে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। "সহজ-পাঠ" যদি বা এড়ানো গেল, "ছেলেবেলা" এল। তারপর, আপনার প্রখ্যাত ছোটগল্পের তাড়নায় উচ্চ মাধ্যমিক অবধি আমরা ছাত্রছাত্রীরা আপনার কলমের অত্যাচারে জর্জরিত। একি সুবিচার, ঠাকুরমশাই ? লেখার সময়ে কি আপনি ভেবেছিলেন অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ বঙ্গসন্তানদের জীবনে আপনি কি বিপদ এনে দিচ্ছেন ?

ইস্কুলে আবার শুধু পড়াশুনো করে নিস্তার নেই। আমাদের ইস্কুলের আবার শান্তিনিকেতনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। বিকেলে সাদার্ণ এ্যাভিনিউ-তে পার্কে খেলতে আসার নাম করে "তাসের দেশ" এর রিহার্সালে আর শনিবারের গানের ক্লাসে উঁকিঝুঁকি মারা। শুধু "পঁচিশে" বৈশাখ আর "বাইশে" শ্রাবণ নম নম করে সেরে দেওয়া নয়। সারা বছরই আপনি কোনো না কোনো রূপে আছেনই। এক একটা ছবি ভেসে আসে, চলে যায় -- পাঁচ বছর বয়সে "চৈত্র-পবনে" গাইছি, তখন নার্সারিতে পড়ি। (কৃষ্ণা আন্টি পাশে হারমোনিয়ামে, দশভুজা হয়ে সামলাচ্ছেন সব দিক -- বেলো করছেন, আবার ছোট্ট গায়িকার মুখ মাইকের থেকে সরে গেলেই ঘুরিয়ে দিচ্ছেন -- আমার আবার ছোটবেলা থেকে মাইক-ফিটিং গলা কিনা !) ১১ বছর বয়সে Teachers Dayতে "ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া" সাজা -- এবার লীলা আন্টি পেছন থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে দর্শকদের মুখোমুখি আনছেন ! তারপর ১৩ বছর বয়সে সাপ্তাহিক assemblyতে দুরু দুরু বক্ষে কম্পিত হস্তে ভাঙা গলায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ থেকে পড়া, "Thou hast made me endless , such is thy pleasure." ১৬তে ক্লাশ টেনে পড়ি -- বেড়াতে গেছি স্কুলের সঙ্গে দিল্লী-আগ্রা-জয়পুর। সাত দিন গলা ফাটিয়ে হিন্দী ফিল্মি গান করেছি। ফিরে এসেই স্কুলে গানের প্রতিযোগিতা। গান গাইতে বসেছি -- পেছনে রেক্টর স্যার আর রত্না আন্টি বলাবলি করছেন, "দেখছেন মেয়েটা এই ক দিন দারুণ গাইল, একদম গলা বসেনি !" ব্যাস, ওমনি আমার "আকাশ জুড়ে শুনিনু" গাইতে গাইতে গলা ভেঙে গেল। আপনি আর আপনার গান কি আমায় কম বিপদে ফেলেছেন, স্যার ?

তবে হ্যাঁ, বিপদে ফেলেছেন যেমন, আবার ত্রাণকর্তার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়েছেন ঠিকই। প্রথমবার আমাকে যখন পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছিল, পাত্রের মা বললেন, "একটু হেঁটে দেখাও তো মা"। তখন না হোঁচট খেয়ে হাঁটলাম বটে, কিন্তু গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠছে অসন্তোষ আর অপমানের জ্বালা। তারপর তিনি যখন বললেন, "গান নিশ্চয়ই গাইতে পার ? গাও গাও।" তখন আপনার অমৃতের আস্বাদ নিয়ে গেয়ে উঠি,

"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিতচিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।"

প্রথম দর্শনে ও প্রথম শ্রবণে হবু শাশুড়ী করলেন reject, বাতিল। তারপর হাওড়া ব্রিজের তলা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। আমি অনেক পাত্রের / পাত্রপক্ষের দ্বারা খারিজ হয়ে অবশেষে সুপাত্রের এবং সুপাত্রপক্ষের গলায় ঝুলে কালাপানি পার হয়ে "এলেম নতুন দেশে"। বিভিন্ন সময়ে আপনার পূজার ছলে আপনাকে ভুলে থাকি বটেই , তবে আবার মনেও রাখি। আর হ্যাঁ, মনের গানই বলুন, লেখার হাতই বলুন, কি হাতের লেখাই বলুন -- সব কিছুর জন্যই আপনি মশাই সাংঘাতিক ভাবে দায়ী ! দুঃখে - সুখে - নেচে - গেয়ে - কবিতা পড়ে - শুয়ে - ঘুমিয়ে - চা খেয়ে - না খেয়ে - পড়িয়ে - গড়িয়ে - হেঁচে - কেশে - লোডশেডিংএ - পাত্রপক্ষের সামনে -- আপনাকে ছাড়া জীবন যেন কল্পনাই করতে পারি না। শুধু আমি নই, আমার মত শত সহস্র কোটি অসংখ্য লোকও পারে না -- আজও।

প্রণামান্তে –
একটি সাধারণ মেয়ে।

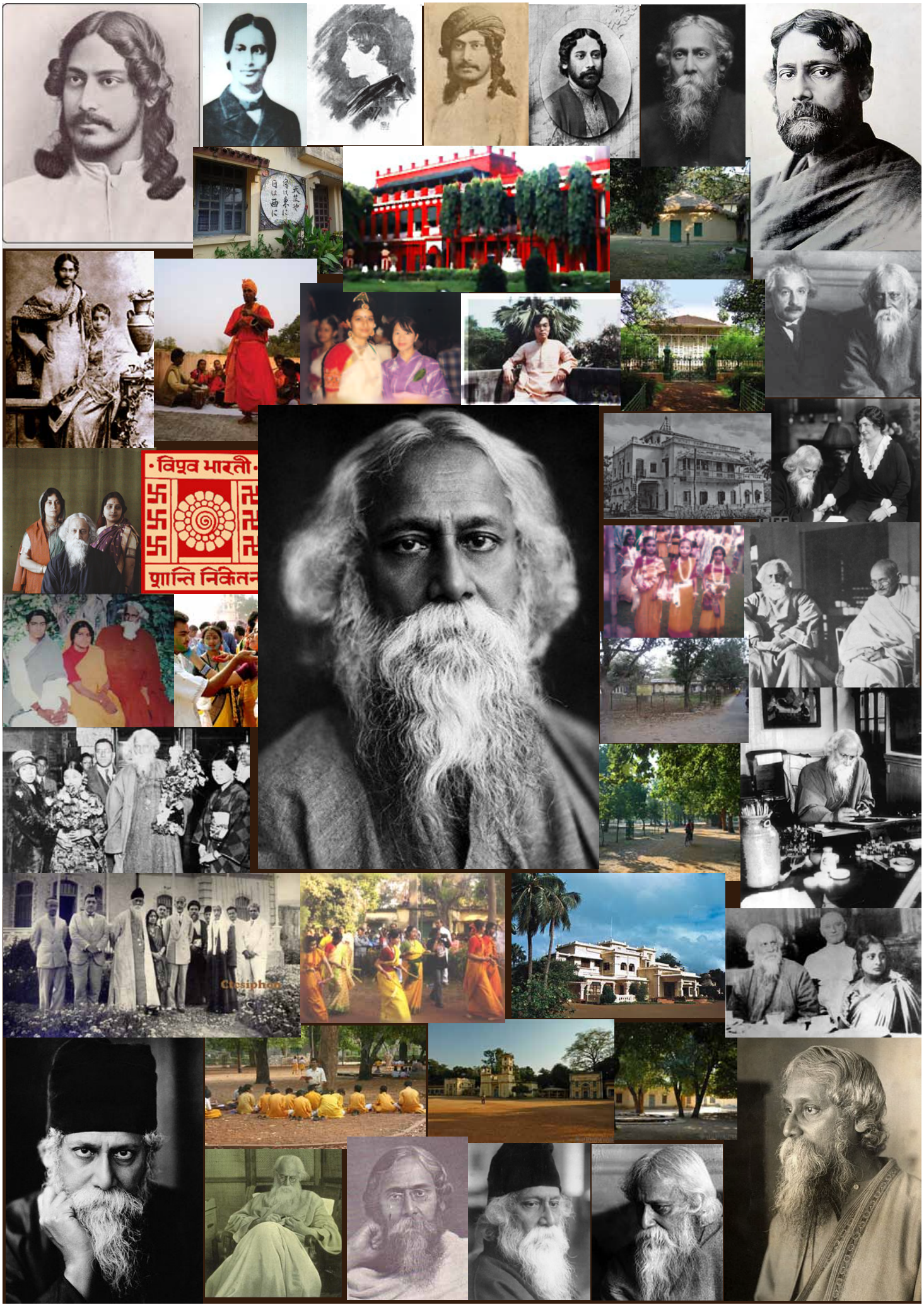
विश्व भारती
शान्ति निकेतन

স্মৃতিমাল্য

বিরাট সংসারের দায়িত্ব মাথায় নিয়েও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বদাই থাকতেন আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা এবং অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ সাধনের জন্য তাঁর মন খুঁজে ফিরতো নির্জন শান্ত পরিবেশ। একদিন পেয়ে যান উপযুক্ত স্থানের সন্ধান। ভ্রমণকালে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন দিগন্তবিস্তৃত ভুবনডাঙ্গার মাঠের ছাতিমতলায়। এই শান্ত পরিবেশটি ভালো লেগে যায় দেবেন্দ্রনাথের। সেখানে আশ্রম তৈরী কোরে নাম দেন শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনে মহর্ষি পেয়েছিলেন তাঁর প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি। পরবর্তীকালে সমস্ত জায়গাটিরই নাম হয় শান্তিনিকেতন।

এই শান্তিনিকেতনেই পিতার অনুমতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, ভারতের পুরাতন আশ্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে। সততা, নিষ্ঠা, মানসিক দৃঢ়তা এবং কয়েকজন স্বার্থলেশহীন দরদী মানুষের শুভেচ্ছা ও সহায়তায় যে প্রতিষ্ঠানের বীজ তিনি বপন করেন তা ক্রমে মহীরুহের আকার ধারণ করে এবং "বিশ্বভারতী" নামে সুপরিচিত হয়ে ওঠে পৃথিবীতে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী সম্পর্কে বলেছেন :

"আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে। তারা যদি অন্তরের মধ্যে কোনো বাধা না পায় তবে তাদের এই আসার দ্বারাতেই আপনি এখানে নবযুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরী হয়ে উঠবে। তীর্থযাত্রীরা যে ভক্তি নিয়ে আসে, যে সত্য দৃষ্টি নিয়ে আসে, তার দ্বারাই তাঁরা তীর্থস্থানকে সত্য করে তোলে। আমরা যারা এই আশ্রমে এসেছি, আমরা এখানে যে সত্যকে উপলব্ধি করব বলে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রত্যাশা করি, সেই শ্রদ্ধার দ্বারা, সেই প্রত্যাশার দ্বারাই সেই সত্য এখানে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে। আমরা এখানে কোন মন্ত্রের রূপ দেখব বলে নিয়ত প্রত্যাশা করব ? সে মন্ত্র হচ্ছে এই যে যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্, একটি নীড়, যেখানে বিশ্ব অবস্থান করবে। --- আজকের দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে মানুষ শুধু কোন বিশেষ জাতির অন্তর্গত না, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে সে মানুষ।"

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বমানবতার বাণী। ধীরে ধীরে বিশ্বভারতী পরিণত হয় বিশ্বমানবের এক তীর্থক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়েছেন জাপানিরাও। তাঁর জীবিত অবস্থাতেই শান্তিনিকেতনে জাপানিদের যাতায়াত শুরু হয় মূলত শিক্ষাগ্রহণ বা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। কবিগুরু নিজেও একাধিকবার জাপান ঘুরে গিয়েছেন। জাপানের সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং জাপানিদের অধ্যাবসায়, সৌজন্যবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ, সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ ও পরিশ্রম করার অসাধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে এর প্রশংসা করেছেন।

পরবর্তীকালে জাপান থেকে যাঁরা শান্তিনিকেতনে যান তাঁদের মধ্যে ৺সাইজি মাকিনো এবং শ্রী কাজুও আজুমার কথা বিশেষভাবেই মনে পড়ছে। শ্রী মাকিনো আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। শান্তিনিকেতনে "নিপ্পন ভবন" প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রী আজুমাও শারীরিক অসুস্থতায় বেশ কিছু বছর যাবৎ শয্যাশায়ী। এঁদের কারোর মুখ থেকে নতুন কোরে জানার সুযোগ নেই আশ্রমিক জীবনের অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা। এটা দুর্ভাগ্য বৈ আর কি হতে পারে। তবে বিগত তিন চার দশকে আরও বহু জাপানি শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের স্মৃতিচারণামূলক রচনা হাতে পাওয়ার সৌভাগ্য "অঞ্জলি"র হয়েছে। এরই একটি সংকলন দিয়ে সাজানো হয়েছে পরের কয়েকটি পাতা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে অঞ্জলির শ্রদ্ধার্ঘ্য এই স্মৃতিমাল্যখানি ।।

- রুমা গুপ্ত।

シャンティニケタンの追憶
Fond Memories of Shantiniketan

神戸朋子 Kambe Tomoko

1970年代に過したシャンティニケタンの月日は、なつかしい追憶の日々となっているが、今もなお色あせることなく、これからも決して消え失せることはないだろう。

それは、タゴールの思想に永遠の生命が脈打っているように、シャンティニケタンニも、その精神が脈々と流れているからである。

その当時は、テレビも普及しておらず、古きよき時代がまだ残っていた。

音楽が生活の中に浸透しており「金より歌」を愛する、ベンガル人の奥深い文化の力をまざまざと感じさせられた。

音楽は、人生になくてはならない、精神の糧となっていた。

夕方のお茶の持間には、あちこちの家でよくパーティーが催された。

友人や親族が集まって、詩の朗読や歌や踊りが披露され、親しい交流と生活を楽しむひとときがあった。

シャンティニケタンは、又美しい自然と静けさに充ち、魂の憩う処となっていた。

夏は緋色の火炎樹、雨季は乳白色のコドム、秋は芳しいシウリ、春は薄桃色のカンチヤン・・・・・と次から次へと巡る季節の花々が咲き匂い、早朝から夕べまで、さまざまな鳥の声が鳴り響いていた。この自然の中で行なわれていた教育も又、五感を通して学ぶものであった。

自然に充ちている形、色、香り、味、音はすべて宇宙の情感であり、これらを愛することは神を愛することである、という人生、世界肯定の全人教育の理想が息づいていた。

野外のマンゴーの木下で遊ぶ子供たちは、よそ見の必要はなく(むしろ余儀なくさせられる位だった)、まわりをながめながら、のびのびと学んでいた。

花と鳥と歌に充ちた世界に包まれていると、人だけではない様な生ある物たちの息吹が感じられ、宇宙の鼓動が伝わってくるようだった。

日本に於いては、タゴールはいまだに詩人としてしか知られていないが、私も当地へ行ってはじめてタゴールの歌に出会ったのである。

不思議な縁で、タゴールの直弟子シャンティデブ・ゴーシュ二出会い、タゴールの歌を学び始めた。タゴールは「現象の世界は順を追って消え去るが、残るものは詩と歌である」と述べているように、没後68年を経た今日も、人々の魂を慰め生きる力を与え続けている。

来年は生誕150周年を迎えるが、日本に於いては、今や無名に等しい状況にあることが、無念である。今日の自然破壊、憎悪、差別のうずまく混迷を深めた世界にあって、神・自然・人の調和と、民族、国境を越えるヒューマニズムの精神が、今こそ時空を越えて、日本のみならず全世界に福音をもたらすことを、祈ってやまない。

The days I spent in Shantiniketan back in the 1970s have already become fondly-remembered scenes but they still retain their vivid color, and I believe will never fade from my memory.

This is because, just like in his philosophy, Tagore's spirit solemnly lives on in the streets of Shantiniketan.

Television had not been popularized yet, and the "good old days" were still intact.

Music permeated throughout people's lives. I could vividly sense the profound cultural power of the Bengali people, people who love "song more than gold". Music had become food for the soul, a necessity for life.

Many houses hosted parties during the daily afternoon tea time.

Friends and relatives would congregate, reciting verses from poems, performing songs and dances enjoying the moments of each other's company and intimacy.

Shantiniketan, filled with beautiful serenity and nature, had become the resting place for the soul.

In Summer flaming red flowers, creamy white *kadam phool* during *Monsoon*, the fragrant *siuli phool* in the Fall, milky white *kanchan phool* during Spring... seasonal flowers bloom one after another, spreading their fragrance while various birds sang and chirped from early morning till sunset. The teachings given in this natural environment were ones that stimulated all of the five senses.

Variety of sounds, tastes, shapes, colors, and fragrances revealing all of universe's emotions, and to love these meant loving God; an all-round education that promoted life and this worldly ideal lived within these streets.

The children playing under the mango trees had no need to divert their attention (in fact they were kind of forced to) and grew up carefree while taking in their surroundings.

Being encompassed by a world filled with flowers, birds and song, I was able to sense the breath of living beings that were not human, and sense the pulse of the universe between each breath.

To this day, Tagore is known only as a poet in Japan and even I first encountered his songs for the first time when I visited the streets of Shantiniketan.

I started learning Tagore's songs through his direct pupil, Shantidev Ghosh, whom I was lucky to meet. Tagore stated, "The material world fades and disappear s in nothingness, but verses and lyrics last an eternity," and his words ring so true; his words continue to sooth and empower the souls of people even 68 years after his death.

My heart is filled with regret and resentment that Tagore is still obscure and nameless in Japan to this day, even with is 150th birth anniversary in sight. Especially in today's deeply chaotic world filled with destruction of nature, hatred, and discrimination, I pray that his humanistic spirit that submerges race, ethnicity and borders and calls for the harmony between God, nature, and humankind, can now, encompassing all of time and space, bring peace not only to Japan, but to the entire world. ❑

একজন জাপানী আশ্রমবাসীর কথা

- কাজুহিরো ওয়াতানাবে

এ কথা সবার জানা যে ভারতবর্ষ এবং জাপানের মধ্যে যোগাযোগের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরের বছর, অর্থাৎ ১৯০২-এ পঁচিশ বছর বয়সী জাপানী যুবক শিতোকু হোরি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম বিদেশী ছাত্র হিসাবে শান্তিনিকেতনে পড়তে শুরু করেন। তখন জাপানে শিন্তো ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেয়ার সরকারি নীতির অধীনে বৌদ্ধ ধর্ম সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিল। সেই পরিস্থিতিতে পুরোনো রাজধানী নারার এক বৌদ্ধ মঠের সন্তান শিতোকু হোরি মনে করলেন বৌদ্ধ ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে গেলে প্রথমে এই ধর্মের জন্মভূমি ভারতে গিয়ে এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে। সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা শেখার উদ্দেশ্যে তিনি মনীষী তেনশিন ওকাকুরার সফরসঙ্গী হয়ে কলকাতায় পাড়ি জমান এবং ১৯০২ সালে শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া শুরু করেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ পরের বছর লাহোরে এক দূর্ঘটনার পর টিটেনাসে আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রাণ হারান।

হোরির পর আরও অনেক জাপানী শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন। কেউ কেউ হোরির মত শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে , কেউ বা জাপান সংক্রান্ত নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য। রবীন্দ্রনাথ জুডো (তখনকার দিনে "জুজুৎসু" বলা হত)-র শিক্ষক হিসাবে শিন্‌যো তাকাগাকি-কে এবং জাপানী কায়দায় চা পরিবেশন করতে শেখানোর জন্য মাকিকো হোশি-কে আমন্ত্রণ করেন। তেনশিন ওকাকুরার প্রতিষ্ঠিত চিত্রশিল্প সংগঠনে যোগদানকারী যে কজন বিশিষ্ট শিল্পী তেনশিনের পরামর্শে ভারতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কাম্পো আরাই বেশ কয়েক দিন শান্তিনিকেতনে অবস্থান করে রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু সহ বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে ভারত ও জাপানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধিতে অবদান রাখেন।

হোরি, তাকাগাকি ও আরাই-এর মত আরও যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ৎসুশো বিয়োদো। বিয়োদো যখন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন নিয়ে লেখাপড়া করছিলেন, সেই ১৯২৪ সালে টোকিওতে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয় তাঁর। এর আট বছর পর তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষায় উন্নততর গবেষণার জন্য শান্তিনিকেতনে যান। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে বিশ্বভারতীতে একটি জাপান সম্বন্ধীয় শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর অনেক বছর পর ১৯৯৪ সালে বিয়োদো ও অধ্যাপক কাজুও আজুমাদের প্রচেষ্টা এবং বহু জাপানী নাগরিকের সহযোগিতায় সংগৃহিত অর্থ দিয়ে শান্তিনিকেতনে নির্মিত নিপ্পন ভবনের উদ্বোধন হয়।

এক্ষুনি যে নামটি উল্লেখ করলাম , সেই অধ্যাপক আজুমা সম্বন্ধে এই লেখার পাঠকদের নতুন করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয়। তিনি প্রচুর অনুবাদ ও লেখার মাধ্যমে জাপানীদের রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অধ্যাপক আজুমা ১৯৬৭ সাল থেকে চার বছর শান্তিনিকেতনে জাপানী ভাষা ও জাপানী সাহিত্য নিয়ে অধ্যাপনা করার পাশাপাশি বিশ্বকবিকে নিয়ে ব্যাপক গবেষণায় নিয়োজিত হন।

অধ্যাপক আজুমার মত আরও কয়েকজন জাপানী অধ্যাপক বিশ্বভারতীতে মূলত জাপানী ভাষার শিক্ষকতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন শিন্‌ইয়া কাসুগাই, যিনি তেনশিন ওকাকুরার সঙ্গে প্রিয়ংবদা দেবীর পত্র-বিনিময়ের ব্যাপারটি উদ্ঘাটন করেন, এবং তাৎসুও মোরিমোতো যিনি কৃষ্ণ কৃপালানির লেখা রবীন্দ্রনাথের জীবনী জাপানীতে অনুবাদ করেছেন।

তবে আজ যে ব্যক্তির কথা বিশেষভাবে তুলে ধরতে চাই, তিনি বিশ্বভারতীতে জাপানী অধ্যাপকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দিন সেই চাকরিতে ছিলেন। তাঁর নাম সাইজি মাকিনো।

অধ্যাপক মাকিনো ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৫ বছর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী ভাষা ও জাপানী সংস্কৃতি পড়িয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি শান্তিনিকেতনেই থেকে যান। এবছর গোড়ার দিকে হঠাৎ খবর আসে যে মিঃ মাকিনো জানুয়ারী মাসে ঝাড়খণ্ডে বৃক্ষ রোপণ অভিযানে অংশ নিয়ে সেখানে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হিসাবে ১৯৭৪ সালে চাকরিতে ঢুকলেও ভারতে তাঁর জীবন শুরু হয় আরও অনেক আগে -- ১৯৫৮ সালে , অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় তিনি ভারতে কাটিয়েছেন।

অধ্যাপক মাকিনো তাঁর মায়ের প্রভাবে জাপানের একজন বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা নিচিদাৎসু ফুজিই-র ভক্ত-তে পরিণত হন। ফুজিই ভারত সহ বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের অভিযান চালিয়েছিলেন। নিচিদাৎসু ফুজিই মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনেরও সমর্থক ছিলেন এবং তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। এই সম্পর্কটা সাইজি মাকিনো-কে ভারতে নিয়ে গেল। তিনি হিন্দুস্থানী-তামিলি সঙ্ঘের আমন্ত্রণে ১৯৫৮ সালে কলকাতায় যান। তখন তাঁর বয়স ৩৪ বছর। কলকাতা থেকে মহারাষ্ট্রের সেবাগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে গিয়ে পশু রোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। সেবাগ্রামে দু বছর থাকার পর তিনি শান্তিনিকেতনে যান। ভারতে কাজ করতে হলে যে ভালরকম ভাষাজ্ঞান থাকা দরকার, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সহকর্মীদের সুপারিশে হিন্দী শেখার জন্য তিনি শান্তিনিকেতনকে বেছে নিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে বছর দুয়েক খুব মন দিয়ে হিন্দী শিখেছেন মিঃ মাকিনো। তার ফলে এই ভাষায় অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে-পড়তে তাঁর আর কোনো অসুবিধা হত না। হিন্দী ভাষায় এই দক্ষতা তাঁর পরবর্তী জীবনে খুব কাজে লেগেছে। শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা শেষে তিনি মধ্যপ্রদেশে যান , এবং একটি গ্রামে স্থানীয় বেসরকারী বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যার শিক্ষক হিসাবে চাকরি শুরু করেন। সেই গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না , পর্যাপ্ত জলেরও অভাব ছিল। সেখানে তিন-চার বছর কাজ করার পর একটি কোম্পানীতে

নতুন চাকরি পান। মধ্যপ্রদেশেরই গোয়ালিয়র শহরে অবস্থিত এই কোম্পানীর সাথে জাপানের একটি মেশিন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ছিল। প্রযুক্তিগত সহযোগিতার জন্য জাপানের এই কোম্পানী থেকে আসা ইঞ্জিনিয়ারদের দোভাষী হিসাবে কাজ শুরু করেন মিঃ মাকিনো। কিন্তু কোম্পানীর ব্যবসা ভাল না চলায় তিন বছরের মাথায় তিনি চাকরিটি হারান। এর পর পরই জাপান থেকে তাঁর স্ত্রী ইউকির আগমন হয়। আসলে মিঃ মাকিনো ১৯৫৮ সালে যে জাহাজে করে ভারতে পৌঁছান, সেই জাহাজে ইউকি-ও ছিলেন। ইউকির দাদা কলকাতায় থাকতেন। তাঁর সাথে দেখা করার জন্য ইউকি ভারতে গিয়েছিলেন। সেবার তিনি কিছু দিন কলকাতায় চাকরি করেন। শান্তিনিকেতনে মিঃ মাকিনোর পড়াশোনার খরচ তিনিই বহন করতেন। এর পর একসময় ইউকি জাপানে ফিরে বিবাহের আইনগত প্রক্রিয়া চুকিয়ে আবার ভারতে যান মিঃ মাকিনোর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন শুরু করার জন্য। ১৯৬৮ সালের ৩১শে জুলাই তাঁদের কন্যা সেৎসু-র জন্ম হয়। ইতিমধ্যে মিঃ মাকিনোর নতুন চাকরি জুটেছে। গুজরাতের বরোদা শহরে তখন সার কারখানা নির্মাণের কাজে যুক্ত বহু জাপানী প্রযুক্তিবিদ্ বাস করতেন। মিঃ মাকিনো তাঁদের দোভাষী ও সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। তার পর একই কাজের সূত্রে মাকিনো পরিবার চলে যান গোয়ায়। ১৯৭৪ সালে সার কারখানা নির্মাণ শেষ হলে জাপানী কর্মচারীরা স্বদেশে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করেন। মাকিনো দম্পতিও কন্যাকে নিয়ে জাপানে ফিরবেন বলে প্রায় মনোস্থির করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তখন অকস্মাৎ বিশ্বভারতী থেকে একটি চিঠি মিঃ মাকিনোর হাতে গিয়ে পৌঁছায়। চিঠিটি ছিল বিশ্বভারতীতে জাপানী ভাষা শেখানোর আমন্ত্রণপত্র। এতে রাজি হয়ে মিঃ মাকিনো সপরিবার শান্তিনিকেতনে চলে যান। এইভাবে ১২ বছর পর আবার শুরু হয় তাঁর আশ্রম জীবন।

অধ্যাপক মাকিনোর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে যখন আমি প্রথম বারের মত ভারতে বেড়াতে যাই। আমি তখন টোকিওর বিদেশী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। হিন্দীর পাশাপাশি সবে বাংলাও শিখতে শুরু করেছি। আমার কাছে শান্তিনিকেতন ছিল "বাংলা ভাষার তীর্থস্থান"-এর মত। তাই ভারতে পৌঁছে ভ্রমণসঙ্গী দুই বন্ধুর কাছ থেকে আলাদা হয়ে আমি একলা শান্তিনিকেতন-মুখো হলাম। কলকাতাবাসী একজন জাপানীর কাছ থেকে অধ্যাপক মাকিনোর নাম শুনে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর অফিস ছিল চীনা ভবনের এক কোনায় একটি ঘরে। অফিসটি পুরোনো এবং সাদামাটা। ঘরের ভিতরে একটি ডেস্ক, তার সামনে একজন প্রৌঢ় (তখন আমার তাই মনে হয়েছিল) ব্যক্তি বসে আছেন। তিনিই অধ্যাপক মাকিনো। আমার গলা শুনে তিনি মুখ তুললেন। রোগা-পাতলা শরীর, ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল সবই প্রায় পেকে গেছে। আমি টোকিওতে হিন্দী শিখছি শুনে খুশী হলেন এবং অফিসের ভিতরটা ঘুরিয়ে দেখালেন। এই অফিস ক্লাসরুম হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। দেখলাম লাগোয়া একটি ছোট্ট লাইব্রেরীও আছে। তার পর অধ্যাপক মাকিনো সাইকেল টানতে টানতে আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে টিফিন বাক্স ঝুলছিল। তাঁর কথা বলার ধরণে পশ্চিম জাপানের কোমল টান ছিল। এ্যাণ্ড্রুস পল্লীর ১১ নম্বর বাড়িতে তাঁরা থাকতেন। বাড়ির সামনে মাঠে সাত বছরের মেয়ে সেৎসু ওরফে সেচ্চান খালি পায়ে ছোটাছুটি করছিল। ওকে দেখে খুব মিষ্টি লাগল। সেই দিন মিঃ মাকিনোর বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করেছিলাম। কি খেয়েছিলাম আজ আর তা মনে করতে না পারলেও, এ কথা পরিস্কার মনে আছে যে অধ্যাপক মাকিনোর বাড়িতে ভাল লেগেছিল খুব।

কেন শান্তিনিকেতন আমাকে এত আকৃষ্ট করে, তা গুছিয়ে বলতে পারব না। তবে শান্তিনিকেতনের নাম শুনলে মনে যে দৃশ্যটি ভেসে ওঠে, সেটি ১৯৭৫ সালের প্রথম শান্তিনিকেতন ভ্রমণের সময় দেখা। বোলপুর স্টেশন থেকে রিক্সায় চেপে শান্তিনিকেতনের দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তার অপর দিক দিয়ে একটি রিক্সা এসে যখন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, তখন সেই রিক্সার আরোহী সাদা রঙের জামা পরা এক ভদ্রলোক আমার উদ্দেশ্যে হাঁক পেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কটা বাজে বাবু ?" একদম সাদাসিধে কথা, কিন্তু এখনো মনে গেঁথে রয়েছে, কারণ সেটাই ছিল আমার প্রথম বোধগম্য হওয়া বাংলা। চট্ করে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি বটে, তবে তখন দেখা নীলাকাশ আর রাস্তার পাশে সবুজ বনের রঙের সাথে ওই ভদ্রলোকের অবয়ব মিলেমিশে আমার মনে স্বপ্নের চেহারা নিয়েছে। সেই রূপকথার মত দৃশ্য দেখার ইচ্ছাতেই সম্ভবত আবার শান্তিনিকেতন যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে টোকিওতে "দৈবক্রমে" বাংলা ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাকরি পেয়ে গেলাম। ভাষার প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ যখন হল, নির্দ্বিধায় শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলাম। তবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মাত্র ছয় মাসের জন্য প্রশিক্ষণের অনুমতি পাওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক মাকিনোর মাধ্যমে একটা ব্যবস্থা হল। তিনি না থাকলে আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয়ত সম্ভব হত না।

শান্তিনিকেতনে পৌঁছে থাকার জায়গা খুঁজতে হল। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক ছাত্র না হওয়ায় আমার পক্ষে হোস্টেলে থাকা সম্ভব হয় নি। আবার অধ্যাপক মাকিনোর শরণাপন্ন হতে হল এবং তাঁর সাহায্যে পৌষালী নামক একটি হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। সম্পূর্ণ দেশী ধাঁচের হোটেল, সকাল ও রাতের খাবার

সহ এক মাস থাকার ভাড়া ৬০০ টাকা, তখনকার বিনিময় হার অনুযায়ী ১৮ হাজার ইয়েনের মত। খরচ কম হলেও ঐ হোটেলের সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল খাবার। কাঁকর মেশান ভাত, তরকারিও স্বাদহীন। ফলে ছয় মাসেই আমার ওজন কমে গিয়েছিল ৮ কেজি। প্রথম দিকে ভেবেছিলাম বেশী দিন থাকা যাবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে গেল। উপরন্তু হোটেলের মালিকের সাথে গড়ে উঠল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। মালিক দম্পতির ছয়টি সন্তান। বড় জনের বয়স ১৭, সব থেকে ছোট ছেলের বয়স ৩ বছর। রোজ তাদের সঙ্গে খেলতাম এবং বেড়াতাম। বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অত্যন্ত সুন্দর বাংলা

ও বাংলা ভাষার আকর্ষনীয় দিক সম্বন্ধে জানার পাশাপাশি বাচ্চাদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমেও শিখেছি অনেক।

দিনের বেলায় সোমেনদার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ, তাই তাঁর বাড়িতে রাতে পড়তে যেতাম। পথে পড়ত শ্মশান। যে দিন আকাশে চাঁদ দেখা যেত না, একটু যেন ভয় ভয় করত। তাছাড়া অন্ধকারের মধ্যে থেকে হঠাৎ অন্য সাইকেল এসে আবির্ভূত হলে চম্‌কে উঠতাম -- যেন ভূত দেখছি ! তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনে কেউ সাইকেলের বাল্ব জ্বালাত না। তবে আকাশে চাঁদ থাকলে অসুবিধা হত না। পূর্ণিমা হলে তো কথাই নেই। স্নিগ্ধ বাতাস আর চাঁদের আলোর মধ্যে সাইকেল চালানো ছিল অত্যন্ত আনন্দময় অভিজ্ঞতা। পূর্ণিমার রাতে প্রায়ই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে হোটেলের ছাদে জ্যোৎস্না-স্নান করতাম। জীবনে প্রথম শান্তিনিকেতনেই জ্যোৎস্নার আলোয় মাটিতে গাছের ছায়া পড়তে দেখেছি। জ্যোৎস্নার নীল আলোয় আলোকিত শান্তিনিকেতনের মত সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।

বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকদের অনেকেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ক্লাসে যেতেন। দেখতাম ক্লাসের আগে বা পরে অধ্যাপকরা হাসিমুখে গল্প করতে করতে চলেছেন। বাতাসে তাঁদের ধুতির কোঁচা পত পত করে উড়ত। ঐ দৃশ্যও আমার খুব ভাল লাগত।

অধ্যাপক মাকিনোর অফিসে মাঝে মাঝে যেতাম। সেখানে জাপানী ভাষার ছাত্রছাত্রীদের সাথে পরিচয় হয়। কেউ কেউ এমন আগ্রহ নিয়ে ভাষাটা শিখছিল যে সে বছর কলকাতায় জাপানী ভাষায় দক্ষতা যাচাই-এর পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেছিল বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরাই।

শান্তিনিকতনের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মাকিনো দম্পতি আমাকে সাহায্য করেছেন। মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যেতাম। সে সময় বিশ্বভারতীতে জাপানী ছাত্রছাত্রী ছিলেন আট/দশ জন। সত্যি বলতে কি, বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাপানীরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ট। তাঁদের মধ্যে অনেকে কলাভবনে পড়াশোনা করতেন। অধ্যাপক মাকিনোর বাড়িতে প্রায়ই আশ্রমবাসী জাপানীদের নিয়ে পার্টি হত, আর তাতে যোগ দিয়ে আমরা আনন্দ করতাম।

একদিন অধ্যাপক মাকিনোর বাড়িতে চিত্রকর হুকু আকিনোর সঙ্গে পরিচয় হল। মিয আকিনো জাপানী চিত্রকলার জগতে নামকরা শিল্পীদের একজন। তিনি পরবর্তী কালে জাপানের সব থেকে সম্মানজনক সাংস্কৃতিক পুরস্কার Order of Culture পেয়েছেন। ভারতপ্রেমী আকিনোর বয়স তখন ৭৭ বছর। এক সময় তিনি শান্তিনিকেতনে কলা ভবনের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি এমনই ভারতপ্রেমী ছিলেন যে তিরিশ বারেরও বেশী ভারতে গিয়েছেন এবং ভারতের অসংখ্য ছবি এঁকেছেন।

একবার মিয আকিনো এবং অধ্যাপক মাকিনোর স্ত্রীর সঙ্গে দুর্গাপুরে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ হল। পোড়া মাটির মন্দির ও হাতে বোনা শাড়ীর কারখানা যখন ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, তখন হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আমরা একটি মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে গিয়ে মন্দিরের বারান্দায় সূর্যের আলো এসে পড়ল। সেই দৃশ্যকে হুকু আকিনো পরে ছবিতে এঁকেছেন। সেটি তাঁর খুবই বিখ্যাত ছবি।

আমি জাপানে ফিরে আসার কয়েক বছর পর অধ্যাপক মাকিনো কিছু দিনের জন্য জাপানে এসেছিলেন। দেশের বাড়ি যাওয়ার পথে তিনি কিয়োতোয় মিয আকিনো সঙ্গে দেখা করতে যাবেন শুনে তাঁর সফরসঙ্গী হলাম। টোকিও স্টেশনে পৌঁছে দেখি অধ্যাপক মাকিনো জাপানী কিমোনো পরে এসেছেন। বহু দিন পর জাপানে ফিরে সম্ভবত তাঁর শৈশবের পরিধান ঐ পোশাক আবার ব্যবহার করতে ইচ্ছা করছিল। মিয আকিনোর বাড়ির বাগানে ছিল বাঁশের বন। সেখানে ভ্রমণরত কিমোনো পরিহিত অধ্যাপক মাকিনো-কে দেখাত খুব সুন্দর।

তার পর বহু দিন অধ্যাপক মাকিনোর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাই নি। ২০০৯ সালে তিনি জাপানে এসেছিলেন নিজের লেখা "ভারতে ৪০ বছর" নামক বইটির প্রকাশনা উপলক্ষে। টোকিওতে তাঁর বক্তৃতা সভা হয়েছিল, সেখানে তাঁর সঙ্গে বহু দিন পর আবার দেখা হয়। কিন্তু সেটাই শেষ দেখা। ভারতে ৫০ বছরেরও বেশী অতিবাহিত করে শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক মাকিনো ভারতেই মাটিতে পরিণত হলেন।

৬৫ বছর বয়সে বিশ্বভারতী থেকে অবসর নেওয়ার পর অধ্যাপক মাকিনো মণিপুরে গিয়ে জাপানী ভাষা শেখানোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আসলে মণিপুরে যাওয়া ছিল তাঁর অনেক দিনের স্বপ্ন। ১৯৮২ সালে আমি শান্তিনিকেতনে তাঁর মুখে মণিপুর যাওয়ার পরিকল্পনার কথা শুনি। সেই সময় অবশ্য বিদেশীদের মণিপুরে প্রবেশে অনেক বাধানিষেধ ছিল, যার ফলে তখন পরিকল্পনাটা বাস্তবায়িত হয় নি। তাঁর একজন প্রাক্তন ছাত্র মণিপুর বিশ্বিদ্যালয়ে জাপানী ভাষা শেখাতে আরম্ভ করেন। তিনিই স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সে পড়ানোর জন্য অধ্যাপক মাকিনো-কে আমন্ত্রণ জানান। অধ্যাপক মাকিনোর জন্ম ১৯২৪ সালে। তাঁর প্রজন্মের জাপানীদের মনে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের নাম বিশেষ একটি অনুভূতি বয়ে আনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে সামরিক বাহিনীর বেপরোয়া অভিযানে বহু জাপানী সৈনিককে এখানে প্রাণ হারাতে হয়। অধ্যাপক মাকিনো নিজে সেই অভিযানে অংশগ্রহণ না করলেও ইম্ফল কেমন জায়গা তা যে দেখতে চাইতেন, সে কথা সহজেই অনুমেয়। মণিপুরে তিনি জাপানী ভাষা শেখানোর পাশাপাশি ইম্ফলে নিহত জাপানী সৈন্যদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা সভাগুলোতেও যোগদান করেন।

মণিপুর অধ্যাপক মাকিনোর খুব ভাল লাগত। ১৯৯০ সালের প্রথম সফরের পর তিনি মোট পনের বারেরও বেশী মণিপুরে গিয়েছেন। "ভারতে ৪০"-এ তিনি লিখেছেন, "এখানকার আবহাওয়া যে জাপানের মত, সেটা গাছপালা দেখলে বোঝা যায়। পাইন, বাঁশ, প্লাম, পীচ --সব জাপানের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া মণিপুরীদের চেহারা আমাদের মত। আমি এখানে হুবহু আমার দাদার মত দেখতে একজন স্থানীয় লোককে দেখেছি। এখানে পৌঁছাবার পরের দিন ঘুম থেকে উঠে মনে হল যেন আমি জাপানে আছি। এখানে লোকজনের জীবনধারা, তাঁদের হাবভাব ও বাড়ির নির্মাণ শৈলী দেখলে পুরোনো জাপানের কথা মনে পড়ে। ৫০ বছর আগে আমরা ঠিক এ রকম ছিলাম। মানব মনের সহজ-সরলতা, মানুষে-মানুষে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক যা জাপান থেকে হারিয়ে গিয়েছে, এখানে সেগুলো পাওয়া যায়"।

অধ্যাপক মাকিনো হিন্দীতে একটি বই লিখে গেছেন যার শিরোনাম "জাপানী আত্মার খোঁজ"।

আমার মনে হয়, অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশে পরিণত হওয়ার পর আমরা জাপানীরা মন-মানসিকতার দিক দিয়ে যা খুইয়ে বসেছি, অধ্যাপক সাইজি মাকিনো ভারতে ৫০ বছর ধরে তারই খোঁজ করছিলেন। ❑

সে যে সব হতে আপন আমাদের শান্তিনিকেতন

- সেৎসু তোগাওয়া (মাকিনো)

আমি যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে যাই বাবার কাজের সূত্রে, তখন আমার পাঁচ কি ছয় বছর বয়স। এক ফোঁটাও বাংলা জানতাম না। তার আগে গোয়া ও গুজরাতে ছিলাম বলে কিছুটা হিন্দী, ইংরেজী, কোঙ্কানী (গোয়ার স্থানীয় ভাষা) বলতে পারতাম, বুঝতাম। কিন্তু জাপানী কতটা বুঝতাম ঠিক মনে নেই।

শান্তিনিকেতনের কথা লিখতে গেলে সবথেকে বেশী মনে পড়ে পাঠভবনের দিনগুলির কথা। পাঠভবন হল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবন বা আশ্রমের আর্দশে বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন। আমি পাঠভবনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। একেই গোয়া থেকে শান্তিনিকেতনের নতুন পরিবেশ (পশ্চিম থেকে পূর্বে), তার উপর বাংলা একদম অজানা ভাষা, তাই নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে কিছুটা তো সময় লেগেছিল। প্রথম ছ মাস স্কুলে গিয়ে শুধু বসে পড়া শুনতাম। প্রথম থেকে অ আ ক খ অভ্যাস করে ঠিক কবে থেকে যে বাংলায় লিখতে পড়তে বুঝতে ও কথা বলতে ও সকলের সঙ্গে communicate করে উঠতে পেরেছি, মনে পড়ে না। ছোট ছিলাম বলে হয়ত চট্ করে শিখতে পেরেছিলাম।

আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্ত ছিল পাঠভবনের দিনগুলি। গাছের ছায়াতে ক্লাস, প্রকৃতির সান্নিধ্য, নাচ, গান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু-বান্ধব, পড়াশুনা -- সব মিলিয়ে স্কুলজীবন যে এত আনন্দের, সেটা পাঠভবন বলেই হয়ত অনুভব করতে পেরেছি। সারা বছর ভোর সাড়ে ছটায়, শুধু শীতকালে সাতটায় ক্লাস শুরু হত। তার আগে বৈতালিক দিয়ে দিনের সূচনা হত। "ওঁ পিতা নোহসি পিতা নো বোধি --- " মন্ত্রপাঠ করে একটা পূজা পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে যে যার ক্লাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতাম। সিংহসদনের ঘন্টা আমাদের ক্লাসের শুরু ও শেষ জানাত। যে কোনও অনুষ্ঠানের সূচনাতেও এই ঘন্টা বাজান হত। বেশ দূর থেকে এই ঘন্টার ঢং ঢং আওয়াজে বুঝতে পারতাম কিছু শুরু হতে যাচ্ছে।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা -- সারা বছরই আমরা মোটামুটি বাইরেই ক্লাস করেছি। সুতরাং প্রকৃতি ও ছয় ঋতুকে আমরা অত্যন্ত কাছে পেয়েছি। পাঠভবন তৈরি হয়েছে বিস্তৃত জায়গা নিয়ে। নানা রকম গাছ রয়েছে পাঠভবনের প্রাঙ্গণে। সেই অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থানের আলাদা আলাদা নাম, যেমন আম্রকুঞ্জ, শালবীথি, বকুলবীথি, মাধবীবিতান, গৌরপ্রাঙ্গণ, ঘন্টাতলা ইত্যাদি। আশ্রমে নানারকম

ফলের গাছ থাকায় প্রায়ই আমলকী, কাঁচা আম, কুল, বকুল, খীরকুল, বয়রা, পাতাবাদাম ইত্যাদি কুড়িয়ে খেতাম।

ছোটবেলায় আমার একটা প্রিয় ক্লাস ছিল প্রকৃতিপাঠ। এর কোনও পাঠ্যপুস্তক ছিল না। মাষ্টার মশাই মুখে মুখে প্রকৃতি, গাছ, পাতা, ফুল, পাখি-- আমাদের চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে বলে শোনাতেন, আর প্রায়ই বেড়াতে নিয়ে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করাতেন। এই ক্লাসে আমরা অনেকবার উত্তরায়ণে গিয়ে নতুন রকমের উদ্ভিদ দেখেছি।

পাঠভবনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য এই যে ২য় শ্রেণী থেকেই পড়াশুনার বাইরে নাচ, গান (রবীন্দ্রসঙ্গীত) ও হাতের কাজ, কাঠের কাজের ক্লাস রয়েছে। শান্তিনিকেতনে সারা বছর ধরে ঋতুকে কেন্দ্র করে নানা উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, আর উৎসব-অনুষ্ঠান মানেই নাচ, গান, নাটক। যেহেতু নাচ আমার ভাল লাগত, তাই আমি ছোটবেলা থেকেই এই উৎসব-অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করে এসেছি। বসন্তকালে বসন্তোৎসব, বৈশাখ মাসে নববর্ষ, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, বর্ষাকালে বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, শরৎকালে শারদোৎসব ইত্যাদি। তাছাড়া পাঠভবনের ছেলেমেয়েরা প্রতি মঙ্গলবার "সাহিত্য-সভা" করে নিজেদের লেখা রচনাপাঠ, আবৃত্তি, গান ও নাচ পরিবেশন করে। তাই সারা বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সময় রিহার্সাল দিতে ব্যস্ত থাকতাম। এই রিহার্সালের মাধ্যমেও নাচের অনেক কিছু শিখেছি। নিজে অংশগ্রহণ করিনি যখন তখনও রিহার্সাল দেখতে খুব ভাল লাগত। শান্তিনিকেতনে ছিলাম বলেই মোহরদি (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়), শান্তিদা (শান্তিদেব ঘোষ), বাচ্চুদি (নীলিমা সেন) এঁদের সান্নিধ্যে কয়েকবারই নাচ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। মোহরদির বাড়িতে কত রিহার্সাল দিয়েছি। শান্তিদার ৭০ বছর বয়সের জন্মদিনে উনি "বাল্মীকি

প্রতিভা" করিয়েছিলেন । উনি নিজে গান গেয়ে অভিনয় করে বাল্মীকির ভূমিকাটি করেছিলেন আর আমি বনদেবীর একজন হয়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম । বাচ্চুদি আমাদের দিল্লীতে "চণ্ডালিকা" করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন । তাঁদের স্নেহাশীর্বাদ আর এইসব অভিজ্ঞতা আমার জীবনে অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে ।

প্রত্যেক বছর পাঠভবন থেকে পাশ করার আগে দশম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা নববর্ষের সন্ধ্যায় গুরুদেবের নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে । এটি একটি পরম্পরাগত ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে । আমাদের সময় "চিত্রাঙ্গদা" করেছিলাম, এবং সেটি পরিচালনা করেছিলেন আমাদের অধ্যক্ষের স্ত্রী শুভ্রাদি । আমরা কয়েক মাস ধরে প্রস্তুত হয়েছিলাম । শুভ্রাদি ওনার পূর্ণ উৎসাহ, আগ্রহ, ভালবাসা দিয়ে আমাদের তৈরি করিয়েছিলেন । শান্তিনিকেতনে কোনো অনুষ্ঠান হলে নানান দিক থেকে সহযোগিতা করার লোকের অভাব হয় না । গান-বাজনা, সাজ-পোশাক, গয়না, মঞ্চসজ্জা -- সব ব্যবস্থাই হয়ে যায় অনায়াসে । একটা বড় শিক্ষা আমি শান্তিনিকেতনে পেয়েছি, তা হল অনাড়ম্বর সাজ । নাচের সময়ও একদম জমকালো সাজগোজ করতাম না । সাধারণ তাঁতের শাড়ি, হাতায় স্বহস্তে এমব্রয়ডারি করা ব্লাউজ, ফুল-পাতা দিয়ে তৈরি গয়না । কাঁঠাল পাতা, টগর ফুল, আকন্দ ফুল, রঙন ইত্যাদি চারপাশের ফুল দিয়ে যে কী সুন্দর গয়না তৈরি করা যায়, সেটা বোধহয় শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরাই জানে । বেশীরভাগ অনুষ্ঠানও খোলা মঞ্চেই অনুষ্ঠিত হয় ।

এইভাবে শান্তিনিকেতনে আমার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে

নাচ-গান যুক্ত হয়ে গিয়েছিল । অনুষ্ঠান হলেই ডাক পড়ত । জাপানে সেই পরিবেশটা নেই বলে, এত বিলাস ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও মাঝে মাঝে জীবন রসহীন লাগে ।

এখন আমি হিরোশিমাতে থাকি, কিন্তু প্রতিবছর শান্তিনিকেতনে যাই । আমার বাবা ৺শ্রী সাইজি মাকিনোও তাঁর দু বছরের ছাত্রজীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতার আকর্ষণেই হয়ত কাজ পেয়ে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়েছিলেন । বিশ্বভারতী থেকে অবসর নেবার পরও জাপানে ফিরে না এসে শেষজীবন পর্যন্ত শান্তিনিকেতনেই কাটিয়েছিলেন । শান্তিনিকেতন সকলকে আপন করে নেয় । সেই টানেই হয়ত দেশ-বিদেশ থেকে এত লোক শান্তিনিকেতনে একত্রিত হন পড়াশুনার কাজে, গবেষণার কাজে ও অন্যান্য উদ্দেশ্য নিয়ে । ❑

চলো, চলো, চলো । ঝরনার মতো চলো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলো, প্রভাতের পাখির মতো চলো, অরুণদয়ের আলোর মতো চলো । সেইজন্যই তো পৃথিবী এমন বৃহৎ , জগৎ এমন বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম ।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পথের সঞ্চয়)

তিরিশ বছর পর শান্তিনিকেতনে

- মাসায়ুকি ওওনিশি

সঙ্গীত ভবনের ছাত্র ছিলাম আমি, ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। পূর্বপল্লীতে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকতাম আমার স্ত্রী-র সঙ্গে। একটি সাঁওতালি দম্পতি বাস করতেন বাগানে। বাড়ীটার দেখাশোনা করতেন। তাদের সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্টতা গড়ে উঠেছিল। তখন পূর্বপল্লীর পিছন দিকটা প্রায় ফাঁকা ছিল, সেখান থেকে প্রান্তিক স্টেশনের দিকে যেতেই মাঠের ওপারে দিক-দিগন্ত দেখতে পেতাম।

সেই বাড়ীতে থেকে আমরা শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশতে লাগলাম। প্রকৃতিকে যেন পেয়েছিলাম খুব কাছেই। মনে পড়ে, রাত্রিবেলায় কারো বাড়ীতে সঙ্গীতানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর যখন আমরা জ্যোৎস্নার আলোতে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ী ফিরতাম , সরু গলিতে চলতে চলতে জুঁই ফুলের সুগন্ধে আমাদের সারা শরীর যেন মাখামাখি হয়ে যেত। কালবৈশাখী যখন আসত , তখন ঝোড়ো হাওয়ায় বেল গাছের ফলগুলো ধপ্ ধপ্ করে ছাদে এসে পড়ত। তার পরের দিন সকাল বেলায় উঠে বাড়ীর বারান্দার ঠিক সামনের মাটিতে সেই ভাঙ্গা ফলগুলো দেখতাম। আমরা সেগুলোর ঘন হলুদ রঙের শাঁস দিয়ে সরবৎ তৈরি করতাম। আর বর্ষাকালের আরম্ভে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসত। তার ছায়া বাগানের মাটির উপর খুব হাল্কাভাবে খেলা করত।

আমি বিশেষ করে ভালবাসতাম গ্রীষ্মকালের দুপুর বেলায় প্রখর রৌদ্রের মধ্যে সাইকেল করে ঘুরে বেড়াতে। রাস্তা-ঘাটে লোকজনের কোনো চিহ্ন নেই। খাঁ খাঁ মাঠের মাঝখানে রাস্তা ধরে সাইকেলে চলতে চলতে মনে হত রৌদ্র যেন মাটিতে ধাক্কা মেরে তার ভিতরে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর আমি যেন তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

সঙ্গীত ভবনে তখনো শান্তিদেব ঘোষ, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দীনাথ দত্ত প্রমুখ ওস্তাদরা ছিলেন। আমরা নানান অনুষ্ঠানে তাঁদের গান-বাজনা শোনার সুযোগ পেতাম। সেই সময় শান্তিনিকেতনে প্রায় দশ /বারো জন জাপানী ছাত্রছাত্রী ছিলেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন কলা-ভবনে , বাকি ক জন ছিলেন সঙ্গীত-ভবনে ও বিদ্যা-ভবনে। তখন বিশ্বভারতীতে জাপানী পড়াতেন মাকিনো সেনসেই। ১৯৭৮ সালের পৌষ মেলাতে আমরা জাপানীরা সবাই মিলে জাপানী চা ও মিষ্টির দোকান খুলেছিলাম। তার পরের বছর আমি সে সব জাপানী ছাত্রছাত্রীর জন্য উত্তরায়ণে শান্তিদার গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে সেই অনুষ্ঠানে গাওয়া গানের মূল কথা ও তার জাপানী অনুবাদ কাগজে পাশাপাশি লিখে সূতো দিয়ে বেঁধে খান বিশেক ছোট "program" তৈরি করেছিলাম শ্রোতাদের সুবিধার জন্যে। আমার কাছে এখনও তখনকার একখানা "program" এবং অনুষ্ঠানটির সাউণ্ড-রেকর্ডিং রয়েছে, চিরকালের স্মৃতির মত।

গত জুন মাসে তিরিশ বছর পর আবার আমি গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে। মাত্র দু দিন ছিলাম সেখানে। যাওয়ার আগে থেকেই জানতাম পুরোনো লোক বলতে বিশেষ আর কেউ নেই, সবাই চলে গেছেন। আরও শুনেছিলাম, শান্তিনিকেতনের চেহারা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। এই ক বছর কলকাতায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েও শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয় নি। এবার যাওয়াটা ঠিক করেছিলাম অনেকটা আমার পুরোনো বন্ধুদের তাগিদে।

শান্তিনিকেতনে পরিবর্তন দেখলাম সর্বত্র। সব জায়গাতে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ী। আগে যেখানে খোলা মাঠ ছিল, সে সব জায়গার চারিদিকে বেড়া দেওয়া হয়েছে।

দু-এক জন পুরোনো বন্ধুর দেখা পেয়েছিলাম। তারা কিন্তু আগেকার মতই আছেন। আমার অন্যতম বন্ধু ছিলেন নাড়ু, আনন্দীদার দ্বিতীয় ছেলে। তিনি তিরিশ বছর আগে কলা-ভাবনের ছাত্র ছিলেন। এখন সেখানেই অধ্যাপনা করেন। তিনি তখন আমাদের সাথে এমন মিশেছিলেন যে জাপানী ছাত্রছাত্রী মাত্রেই তাঁকে চিনত। তিনি এখন তাঁর বাড়ীতে সঙ্গীতের আসর বসান, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে নিয়মিত গান-বাজনা করেন।তাছাড়া তিনি তাঁর ঘরের মধ্যে সঙ্গীত সংরক্ষণের স্টুডিও তৈরি করেছেন।

সেই গান-বাজনার আসরে প্রায়ই আসেন আমার এস্রাজ ক্লাসের পুরোনো সহপাঠী বুদ্ধদেব। তিনি এখন সেরা এস্রাজ বাজিয়েদের মধ্যে একজন। ভাল ভাল ছাত্রছাত্রীও তৈরি করেছেন। তাদের দেখে মনে হল ভারতে সঙ্গীতের ধারা এমন ভাবেই অক্ষুন্ন রয়েছে -- কোনো সংস্থার দ্বারা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা নয়, উৎসাহিত ব্যক্তিদের আকাঙ্খা আর ভালবাসায়। সঙ্গীতের প্রতি তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ ও ভালবাসা দেখে সেদিন আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। ❑

ছাতিম গাছের পাতা বুকে নিয়ে

- সাওরি কুরোদা

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি আজও আমার মনকে দুলিয়ে দিয়ে যায় স্নিগ্ধ বাতাসের মতো । হ্যাঁ, কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের হাওয়া-বাতাস , আকাশ, ফুল, চাঁদ, মানুষ -- সব কিছুই আমার ভাল লেগেছিল ।

ভোর হতে না হতেই নীল আকাশের তলায় পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত – "আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে তোমারি নাম সকল তারার মাঝে" -- এমনই আরও কত গান সতেজ সুরেলা কণ্ঠে । বৈতালিকের শেষে ঘন্টার শব্দে শুরু হোত আমার দিন ।

আমি বিশ্বভারতীর ছাত্রী ছিলাম । তবে সকালে পাঠভবনের ক্লাসেও যোগ দিতাম । পাঠভবনের ক্লাসগুলো হয় গাছের তলায় -- প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে । ছাত্রছাত্রীদের পোশাকের রঙ হলুদ । আমি যেতাম হলুদ রঙের শাড়ী পরে --সাইকেলে কোরে । প্রথমত শাড়ি পরা , তারপর সেই অবস্থায় সাইকেল চালানো -- দুটোই আমার জন্য বেশ কঠিন কাজ ছিল । আমি যে পরিবারের সাথে থাকতাম , সেখানকার গৃহকর্ত্রী (মাসী বলে ডাকতাম তাঁকে) রোজ সকালে আমাকে শাড়ী পরিয়ে দিতেন । শিক্ষিকাকে সম্বোধন করতাম বুলবুলদি নামে । একদিন কোথা থেকে একটা জ্ঞানপিপাসু হনুমান এসে হাজির হওয়ায় হৈ চৈ বেঁধে গেল । ওটাকে সরিয়ে ক্লাস আরম্ভ হতে বেশ দেরীই হয়ে গিয়েছিল । আরেক দিন, সে কি ঝম্‌ঝম বৃষ্টি ! শাড়ী ভিজে একশা ! Rainy Dayর ছুটি পেয়ে গেলাম । মনে পড়ে, বয়সে অনেক ছোট সহপাঠীদের সঙ্গে পড়া মুখস্ত করে, শ্রুতিলিখনে ভুল করেছিলাম অনেক । শিক্ষিকার আদেশে প্রত্যেকটি শব্দ ১০ বার কোরে লিখতে হয়েছিল । সহপাঠীরা সবাই ছোট, তবু ওদের সাথে সময়টা কেটেছিল চমৎকার । আশ্রমের ছোট

বন্ধুরা , তোমরা সবাই ভাল আছ তো ?

সপ্তাহে একদিন কাঁচের মন্দিরে যেতাম প্রার্থনা করতে । বিশ্বভারতীতে সাপ্তাহিক ছুটির দিনটি হোল বুধবার । সেদিন ছাত্রছাত্রী ও শান্তিনিকেতনের বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেই সাদা কাপড় পরে, নানা রঙের কাঁচ দিয়ে সাজানো মন্দিরটিতে যান প্রার্থনা করতে । আমিও যেতাম সাদা পোশাকে । ভোরের আলোয় সমস্বরে "শান্তি" "শান্তি" ধ্বনি দেওয়ার যে স্বর্গীয় অনুভূতি, তা চিরকাল মনে থাকবে ।

মার্চ মাসে শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব দেখতে প্রচুর লোক সমাগম হয় । নৃত্যগীতে মুখরিত হয়ে ওঠে জায়গাটি । ওতে অংশ নেওয়ার সুযোগ আমারও হয়েছে । পরণে হলুদ শাড়ি আর খোপায় পলাশ ফুল গুঁজে আরও অনেকের সাথে "ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল" গানটি গাইতে গাইতে নাচের তালে পাড়ি দিয়েছি ছাতিমতলা থেকে আম্রকুঞ্জ । হাতে ছিল দুটো কাঠি - নাচের তালে বাজানোর জন্য । খালি পায়ে পথ চলতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি বটে , কিন্তু সেই কষ্টকে ছাপিয়ে গিয়েছে উৎসবের আনন্দ ।

শান্তিনিকেতন থেকে বাসে ৬ ঘন্টার পথ পুরুলিয়া, ছৌনাচের জন্য বিখ্যাত । সেখানকার সৃজন উৎসবও খুব নামকরা । বিশ্বভারতীতে আমাদের মতো বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের একটি দল, একবার গিয়েছিলাম সৃজন উৎসবে নাচ করতে । নাচের সময় প্রত্যেকে বুকে লাগিয়ে নিয়েছিলাম শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে আসা ছাতিম গাছের পাতা । আমি ভারতে প্রথম জাপানী নাচ পরিবেশন করি পুরুলিয়ার একটি পাহাড়ে -- জাপানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক "ইয়ুকাতা" পরে, ছাতিম গাছের পাতা বুকে নিয়ে । নাচ চলেছিল গভীর রাত পর্যন্ত । শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেও , মন ভরে উঠেছিল তৃপ্তিতে ।

শান্তিনিকেতন সারা বিশ্বের মিলন-স্থল । সেখানে গিয়ে আমিও আমার দেশ সম্পর্কে সবাইকে জানানোর সুযোগ পেয়েছি ।

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে আমার অনুভূতির উল্লেখ না করলে শান্তিনিকেতন বাসের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রথম শুনি জাপানে থাকতেই । বিশ্বভারতীর একজন গানের শিক্ষক জাপানে আসলে তাঁর সাথে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম । তিনি আমাকে দেখে গেয়ে উঠেছিলেন, "আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী ।" কি অপূর্ব কন্ঠ ! গাওয়া শেষ কোরে গানটি আমাকে শেখালেনও । রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি আমার অন্তরের টান আরও সুগভীর হয়েছে যখন আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে থেকেছি ।

শান্তিনিকেতনে আশ্রম জীবনের অধ্যায়টি আমার মনে সর্বদা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে । ❑

আমার স্মৃতির খাতা

- ইউকা ওকুদা

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের দেড়শোতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমার শান্তিনিকেতনের স্মৃতি নিয়ে কিছু লেখার সুযোগ দিয়েছেন অঞ্জলির সম্পাদক । আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রনাম জানিয়ে স্মৃতির পাতা খুলছি ।

বিশ্বভারতীর ছাত্রী-জীবন শেষ করে দেশে ফিরে আসার পর কেটে গিয়েছে অনেকগুলো দিন, তবু নির্দ্বিধায় বলতে পারি শান্তিনিকেতন এখনও রয়েছে আমার মন-প্রাণ জুড়ে ।

ওই যে আমার চোখে ভাসছে একটি মেয়ে, নীল রঙের শাড়ী পরে, ডান হাতে ছাতা খুলে ধরে, সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে -- সেই "আমি" । সম্ভবত সঙ্গীত-ভবনের ক্লাশে যাচ্ছে সে ।

সঙ্গীত ভবনের মেয়েদের শাড়ী পরাটা যেন প্রতীকের মত । তবে কোনো নিয়মে বাঁধা নয় , যেন স্বাভাবিক ভাবে মিশে আছে সুরের লহরিতে । পাশে কলা-ভবনের শিল্পীরা কামিজ পরে তাঁদের হাতে গড়া সৃষ্টির সাথে যেমন ভাবে মিশে থাকেন , ঠিক তেমনই । শান্তিনিকেতনের মেয়েদের মৌলিক শক্তি সেই যে মাটির রঙ আর হাওয়ার সুরের মধ্যে থেকে এসে যায় বুঝি । জীবন সুন্দর, সুন্দর জীবন -- এই প্রেরণা পেয়েছি গুরুদেবের ভালবাসায় ।

নতুন তোলা গুরুদেবের গান, গুন-গুন করে গাইতে গাইতে গরম হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে ফেরার পথে কি যে আনন্দ -- আঁচলের নাচন !

আমি তো বাঙালী নই ! তাতে কি আছে ? গুরুদেবের গানে তো মন ভরপুর ! এই গান আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন মোহর দি , অর্থাৎ শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় । সুরের কাঠামো শুধু নয়, তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন গানের ভিতর যে আনন্দ ধারা বইছে , সেই ছবিও ।

আম্রকুঞ্জে চাঁদের আলপনা, ছাতিম তলায় ধূপের রেখা, পলাশ ফুলে গাঁথা হাসির মালা, ঘন মেঘের বৃষ্টি ভেজা মাটির গন্ধ -- এই সব কিছু যে এক দিন আমার গান শুনেছিল তা ঠিক !

গোধুলিবেলার তীরে মোমবাতির আলোয় বসে শুরু করি রেওয়াজ । সা-রে- গা-মা----র প্রতিটি সুরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ছায়া খুঁজি । মনে হয় যেন পৃথিবীতে কোন অভাব নেই, আছে শুধু শান্তি, পূর্ণ শান্তি । খুঁজতে কোথাও যেতে হবে না, মনের মধ্যে আছে মন্দির, সাধনার পথে এগিয়ে গেলে কোনদিন হয়তো দেখা হতেও পারে । হাতে কিছু নেই, তবু সব আছে । পরমানন্দের আলোর পথ, মুক্ত আকাশ, মন চায় সে দিক দিয়ে যেতে ।

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান
তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান ।
ভুলবে সে গান যদি, না হয় যেয়ো ভুলে
উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগর কূলে,
তোমার সভায় যবে করব অবসান
এই ক'দিনের শুধু এই কটি মোর তান ।
তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে ?
সেই কথাটি, কবি, পড়বে তোমার মনে
বর্ষামুখর রাতে, ফাগুন-সমীরণে --
এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান
ভুলতে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ ।।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

শান্তিনিকেতনের স্মৃতির খাতায় দেখি সবাই হাসিমুখে হাত নাড়ছে । আমার এই খাতা কোনো দিন মিলিয়ে যাবে না । অন্তরের ভালবাসার জনকে আজ নতুন করে পাব বলে মনের কোণে শঙ্খ ওঠে বেজে । ❑

From 1984 to 1994 in Santiniketan

- Koichi Yamashita

In June 1984, I joined the Department of Japanese Studies as a Reader and started to live in the quarter number 37 in Andrews Palli known locally as Forty-five. I really enjoyed the Santiniketan life with my family for a decade and during that time visited many places in India and Nepal. I got acquainted with many excellent people in and out of the University that enriched my own self.

In those days, only the Certificate and Diploma Courses were offered in the Department, and *Uttar Siksha* was an elective subject. When the Nippon Bhavan was inaugurated, the Department moved there from the China Bhavan. As the head of Department I tried my best to open the B.A. Honours Course in Japanese but was not successful at that time. I am very happy that the B.A. and M.A. Course are both available now.

During my stay in Santiniketan I published two books. One was *Patanjala Yoga Philosophy* which was based on my PhD dissertation submitted to the Calcutta University and the other was *Japanese Grammar*. Both were written in English and published from KLM Firma.

I was very happy that during my stay in Santiniketan I was blessed with three daughters, Himali, Shanti and Kanchan. In 1994 at the age of forty five I resigned from Visva-Bharati and was back in Japan in February 1995. ❑

Santiniketan, My Hometown

- Yukino (Himali) Amemiya

I had a very important experience 6 months ago in Santiniketan. I went back there last December almost after 9 years of separation. The visit turned my future that I had drawn until then 180 degrees around.

I grew up in Santiniketan since I was born, and came to Japan when I was 10 years old. The experiences of childhood were so impressive that I couldn't adapt to the life in Japan for a long time. However, I hadn't kept in touch with my old friends for about 8 years just because it was bothersome for me to write to my friends in English. I really missed the town and my neighborhoods very much, but I had given up going back there. I'd thought that I would spend my whole life in Japan as Japanese. However, the situation has changed since I found out one of my classmates on Facebook in November 2009 by chance. The connections with them revived and I suddenly decided to visit Santiniketan during last winter vacation.

When I arrived at my hometown and met my old friends, I felt so happy that I couldn't say anything for a while. They welcomed me even if we hadn't met for a very long time. The 7-days stay passed very quickly. Santiniketan had hardly changed for 9 years. Though the campus was enclosed by fences and more houses had been built, it seemed to me to be as same as how Rabindranath Tagore described it in the song "Amader Santiniketan". I felt very comfortable in every moment —spending time with my friends and neighborhoods, talking in Bengali, singing Tagore songs, walking around Santiniketan, having Indian food, and sleeping at night, and so on. It was a special feeling that I hadn't had for a long time. I noticed that my background had been almost made up in Santiniketan. In other words, I am Japanese but my heart is completely Indian. I can't find exact words to describe my feeling, but one thing is clear that I could express myself with my real national identity when I was there. It was so comfortable and great feeling that I could not help going back to Santiniketan last March again.

I have a dream now; I want to go back to Santiniketan and live there. Of course I don't think it is easy. Japan may be more convenient country to live. Also I have many problems to solve before I go back there. However, I'm sure that living in Santiniketan will make me happier than living in Japan. Santiniketan is such a place for me. I greatly appreciate and respect Rabindranath Tagore as he founded Santiniketan, one of the peaceful and wonderful places in the world. I'm very proud that I grew up there and know the real meaning of the song "Amader Santiniketan". ❑

シャンティニケタンの想い出
Memories of Santiniketan

村尾　草苑子（むらお　まきこ）Masako Murao

私は、シャンティ二ケタンで1985年から1987年までＫａｌａ　Ｂｈａｖａｎで、Ｎｏｎｉｄａ，Ｍｏｎｉｄａ先生等に習いました。

初めの1年目は、4人の先生たちがそれぞれ、美術の基礎である花々のスケッチや、描いたものの形から組み合わせていくデザインなどの宿題がたくさん出たので、夜、家に帰ってから、必死にやりました。　ケロシンランプのもと！ケロシンが切れた時は本当に文字通り、蛍のひかりのもとで‥‥！　とても、大きな木に蛍がいっぱいいて、その明りのもとで、デザインをしました。その蛍の木の幻想的なこと！宿題が出ても、ちっとも、苦にならないで、幻想の世界を私は、楽しみました。

シャンティ二ケタンの咲き乱れる植物を描くことからインドの生活が始まりました。オショクのゆらゆら波打つ葉やオレンジ色の鳥のくちばしのようなポーラシュの花、夜マランチョのお家（クリパラニさん）の門へ入るとハッとするような甘い香りを漂わせる清廉なシュウリの花、垣根に植えられているタゴールの花、一軒のお家の前にクリシュナチュラーの燃えるような紅い花と対に植えられているラダ―チュラーの黄色の花。などなど、などスケッチしまくりました。美しい色や形に魅せられてしまいました。その美しい形をもとにデザインしていくことから生まれる布に向かって描き続けました。

インド更紗の模様のもつ意味をスケッチし続けていくうちに、学んだような気がします。

インドのクラスメイトと一緒にウットラヤンの庭でスケッチをしていた時に、友達が私は自分が美しいと思うものから、描き始めていくの！あなたは、どう？と、聞かれてハッとしました。形を如何に正確に描くかということにばかり気を使っていた私です。どんどん友達の絵は、花や葉や幹の木の流れ、付けたされていきます。やがて、描いていくうちに更紗の模様になっていきます。自分の心の流れのように描いていく‥そうか！これだということで、デザインをしてみました。蜜蠟と木蝋とパラフインの描く流れるようなバティックの模様はこうしてできたのかと改めて思いました。

二年目はバティック制作と私自身の課題、現地の植物染に明け暮れました。タゴールの伝記を書かれたクリパラニさんのお家の前に一本の大きな木があります。その木がインドの昔からの植物染に欠かせないホリトキー（ミロバラン）でした。なんと、初めてインドで染めた木の実がホリトキーとは何とも幸運なこと！細長い緑色の実で採りたての物は固く、ナイフで削ると、青っぽい汁がでて、煮込んで染めてみると、なんと目の覚めるような鮮やかな鶯色になったのです。スパーリー（檳榔樹）の実. これも採りたての朱色の実がなんともかわいい。一日中煮込んだが、色がでない。糸を染めてみたら染液が薄くて糸にも期待したような色がでてこない。とにかく、想い出にと思って日本に持ち帰って5年。紅殻色に染まっていた。植物を染めていくなかで、いろいろな友達にも助けてもらいました。

とにかく、いろいろな方に出会い、私の人生の彩になっているシャンティ二ケタンです。

クラスメイトの家でスエーデンから来ていた友達と2年後再会した時、ここはタゴールが建てた理想の地であると言うが、自分達にとっても同じで、何回来ても、どんなに変わろうともその心は変わらないと、お互いに語り合いました。　❑

I was in Santiniketan from 1985 to 1987. During that time I learned from two eminent Kala Bhavan teachers affectionately known as Nonida and Monida.

In the first year four teachers taught us basics of fine arts through sketches of flowers and combination of different forms to create intricate designs. The teachers gave us extensive homework which we completed often working late at night. We used kerosene lamps, and when kerosene was not available, fireflies literally came to the rescue… we created our designs in the glow from fireflies congregating under a big tree creating a dreamy atmosphere. We all cherished this air of fantasy around us and no amount of homework was of concern. We enjoyed every bit of the experience.

My stay in India started with sketches of beautiful flowers and plants abundant in and around Santiniketan. We sketched the gently waving *Ashok* tree leaves, *Polash* flowers resembling the twisted beak of an orange bird, the sweet scented *Seuli* flowers that tenderly greeted guests at the entrance of Maloncho (Mr. Kripalani's house) at night, the neatly planted *Tagor* flowers forming a fence around the house, the twin trees of *Krishnachura* and *Radhachura* in front of the house creating a riot of red and yellow flowers, and many others. We were mesmerized by the beautiful colors and shapes all around us that culminated into the delicate prints we tirelessly designed.

I learned the meaning of each and every pattern used in India prints as I continued to sketch them on my own. One day when I was sketching in the *Uttarayan* garden, one of my classmates asked, "I always start sketching from the object I think is most beautiful, how about you?" I was a bit perplexed at first with this simple question. Then I realized

I was more concerned about how precisely I could draw the patterns. But my friend would start with a flower, then the leaves, next the stem of a tree, and gradually the whole scene would morph into a beautiful India print. From that day onwards I made sure to let the thoughts deep in my heart flow into my designs. I also came to realize that the flowing forms and lines in a *batik* print are all results of such a creative process.

In the second year I was fully occupied with *Batik* prints using local plants for dyeing. There was a large *Horitoki* tree in front of the house of Mr. Kripalani, a renowned biographer of Rabindranath Tagore. *Horitoki* has been used for dyeing in India for ages. Fortunately the first ingredient I used for dyeing was *Horitoki*. The long and slender green *Horitaki* fruit is quite hard and as you scrape it with a knife, a kind of bluish fluid ooze from the fruit. This bluish fluid when used for dyeing results in a splendid hue of greenish brown. I also remember having experimented dyeing with *Betel nuts*. At first sight the reddish nuts looked beautiful. But boiling them in water did not produce the anticipated color; it only resulted in a very light hue for the roll of thread I was experimenting with. More than five years have passed since I brought back the thread as a token to Japan. To my surprise it has now turned into a beautiful red just as I originally imagined.

In course of my work on dyeing using plants, I made many friends, and in the process Santiniketan has made my life very colorful. The other day I met a friend from Sweden in Santiniketan after about two years. Rabindranath Tagore built Santiniketan as an ideal place to live, and we agreed that it was really such a place for us. Whenever we come back to this place, in spite of the various outward changes the feelings deep within us ring the same tone. ❑

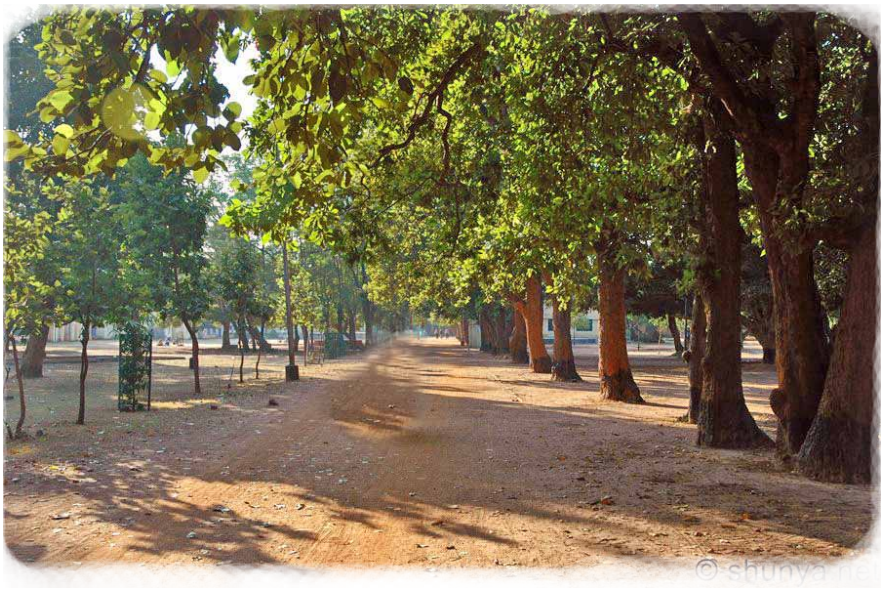

～私のインド生活～
My Life in India

山東　良子 Ryoko Santo

私がインドに興味を持ったのは、額装業を営む祖父が、戦前に集めた古更紗が私の身の回りにあり、その布の色彩やデザインの美しさに惹かれていたからだろうと思う。

その後、染織の雑誌にサンティニケタンへ留学されていた大西浩子さんの手記を読み、私もぜひこの場所に行って、染色を学びたいと思ってしまった。

まだ大学生だった私は、卒業までの2年間を大西さんの主催されていた【インド更紗研究会】で基礎を学び、着々とインド行きの準備を進め、周囲の反対も押し切ってスタートしたインド生活は、私の人生の中でも一番輝く貴重な時間となった。サンティニケタンは、私の原風景のような気がする。

染色に関して言えば、あの過酷な自然の中で身をもって感じることができた。乾季の後の雨の力が植物へ生命の息吹となり、あの力強いデザイン、そして鮮やかな色彩が生まれたのだと実感した。そして私もあの大地の香りを感じながら、何枚もの布を染めることができた。

生活で言えば、厳格な女子寮に入り、インド人のルームメイトや多く友人を得て、文化や習慣に深く触れることができた。便利な日本から比べれば、多くのことが不便なことだらけだったような気がするが、それもすべてひっくるめて受け入れていたように思う。そしてその反面、貧困や多くの問題も突きつけられ、若かった私も迷い戸惑うことも数多くあった。でもインドに来たことを一度も後悔したことはなかったように思う。今思えば、凝縮した時間が流れていたんだと思う。

インドという国に愛想を尽かして帰っていく人、反対にどんどん惹かれていく人。私は、確実に後者だった。両親と約束した1年という約束をあっさり破り、2年余りの滞在をした。忘れられないことは、1年の期限が迫って、もう帰るんだと嘆く私に、インド人の親友が“あなたは何を急いでいるの？“と聞かれて、返す言葉もなく、気がついた。“そうだ！私は何も急いでない・・・”と。翌日には迷うことなく延長の手続きを始めていた。彼女は、私の心に深い問いかけをしてくれたと思っている。 ❑

My father, who was involved in the business of picture framing, collected many India prints before the world war to decorate our house. Through these fascinating prints I slowly became interested in India. So when I read the notes on study in Santiniketan written by Hiroko Oonishi in a journal for dyeing and weaving it rekindled my interest in the study of dyeing in Santiniketan.

I was a sophomore at that time. For two years till my graduation from the university I started to learn the basics of dyeing at the Association for research on India prints organized by Oonishi-san. This way I prepared meticulously for my study at Santiniketan, and the subsequent life I started in India against the wishes of my parents, turned out to be the most precious time in my life. Santiniketan thus forms the basic background of my life.

I was able to learn about dyeing in the difficult and harsh natural settings. As the long season of drought ended with the arrival of rains to pour new breath of life in the plants, the natural settings led me to conceptualize the confluence of the vivid colors into bright lively designs. I captured this immense beauty of nature into the numerous dyeing projects I since undertook.

Talking about life, I lived in the girls' dormitory which had very strict rules, but I was very fortunate to make many friends, and was able to familiarize myself with the culture and social practices. Compared to Japan, I experienced many inconveniences, but taken together it was all acceptable. On the other hand, I was confronted with various issues related to poverty, and my young mind was at times full of hesitation and confusion. But I never regretted to have lived in India. In retrospect, this was a very condensed time full of rich experiences in my life.

Speaking of India, people are either fed up with the difficult experiences, or feel fascinated with and more attracted to the colorful experiences. I surely fall in the second category. I promised to my parents that I shall be in India for only one year, but ended up spending two full years. One episode I will never forget was, when the end of my first year was fast approaching and I was very sad about leaving, one of my Indian friends asked, “What are you hurrying for?” At that time I did not know how to answer this question, but soon realized that I have really nothing to hurry for. The next day without any trace of hesitation I completed the procedures to extend my stay for another year. To this day I am grateful to her for asking me the deep and fateful question. ❑

My Best XI for the World Cup 2010

- Shoubhik Pal

Goalkeeper: **Maarten Stekelenburg – Netherlands**
The current Holland goalkeeper had zilch expectations before the World Cup, but came out from it as one of the better goalkeepers of the World. His cross collection was assuring, and some of his saves were out of this world, one in particular being a save denying Kaka in the quarter finals. His one possible blotch can be his questionable positioning against Diego Forlan's strike in the semi finals. However, it wasn't a mistake of 'Robert Green' proportions and again, the Jabulani ball has a mind of its own.

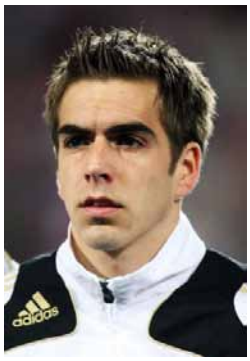

Defenders:
Right Back: **Philipp Lahm – Germany**
The German stand-in skipper increased his reputation even further in this World Cup, and his astute leadership was met with some absolutely brilliant defending. When his central defenders were caught napping, he was always there in hand. Some of his blocks were absolutely critical. His marauding attacking runs always put the opposition defense under pressure and some of his crosses were sublime, namely the one that led to Klose's goal against Australia.

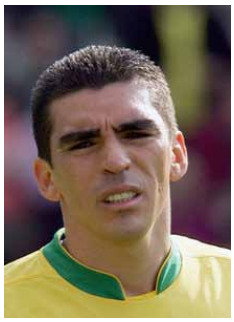

Centre Back 1: **Lucio – Brazil**
Although Brazil's campaign can be called a failure, Lucio's tournament was far from it on personal performance. The Brazil skipper was a rock at the back, making up for the occasional shortcomings of fellow defender Juan. More impressive were his penetrating runs through the centre of the field and efficient passing, which gave Brazil a different dimension from Dunga's one-dimensional defensive tactics.

Centre Back 2: **Joris Mathijsen – Netherlands**
The Netherlands were expected to have free flowing football as the crux of its attack and a shaky defense, an imitation of Argentina, so to speak. But the exact opposite happened. They sometimes had to play dirty to score goals and their defense was in brilliant form. One of the key reasons to this was Joris Mathijsen, whose positional sense and surprisingly good passing made them almost bedrock in defense.

Left Back: **Maicon – Brazil**
I know he's a right back, but the fact that there weren't many impressive left backs in the World Cup makes me give this to him. Also, I believe this position would bring out a different dimension in him. We've always known Maicon was good (he kept Dani Alves out of that team) but this World Cup really proved to me that he was something else. His defending is impeccable and his attack is similar to that of a firing Wayne Rooney and not the one we saw this World Cup. In short, Maicon is the closest thing I have seen to 'Total Football' this whole World Cup.

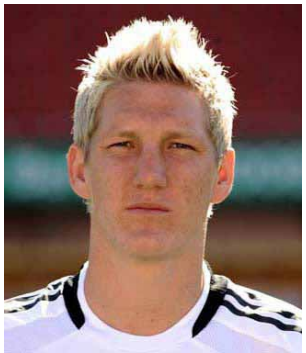

Midfielders
Defensive Midfielder 1: **Bastian Schweinsteiger – Germany**
This man has been immense. All that aggravation about Michael Ballack not playing wouldn't matter to the Germans at all now. This season, 'Basti' has found a new lease of life, and almost plays like 2 players. One, who provides the screen to the defense and snuffs out attacks, and the other, who builds attacks, provides assists, dribbles and is not afraid of shooting long range. And he did these two roles with aplomb this World Cup. Ask Argentina.

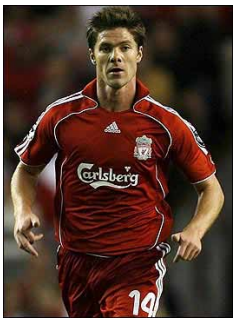

Defensive Midfielder 2: **Xabi Alonso – Spain**
His long passes are a joy to watch and his short passes are played with speed and cleanliness that it's almost difficult to dislike the way this man plays. He, along with Xavi, has the best pass success percentage in the competition, but unlike Xavi, Alonso's passes have more beauty and danger instilled in them. And who can forget his dangerous shots from range? All these qualities make it a no brainer to realize who is better between Busquets and him.

Attacking Midfielder 1: **Keisuke Honda – Japan**
The fact that this guy is brimming with talent is an understatement. Although Japan didn't make it too far into the competition, and unluckily so, Honda established himself as probably the best player in the group stages. Quality exuded every time he touched the ball and his set piece technique was second to none this whole competition. His goal and assist in that match against Denmark rank as in the top 5 of this competition, respectively.

Attacking Midfielder 2: **Wesley Sneijder – Netherlands**
He's not the most talented player in the world. His passing is often wayward. His shots from the halfway line are a joke. Yet, how has Wesley Sneijder had such a great year and established himself as one of the best players of this competition? Sure, luck has something to do with it, but Sneijder possesses many qualities that others on this list may cover up with pure skill. Sneijder is tenacious and never stops trying, as well as possessing heaps of self confidence. All this has made him arguably the player of the tournament.

Second Striker: **Diego Forlan – Uruguay**
Forlan is the hero of the South Americans and the Golden Ball winner. All that talk about Forlan not adapting to the Premier League is now dissipated into thin air, as he showed all the qualities that a complete footballer should possess. Skill, leadership, drive, willingness to shoot yet being very unselfish, Forlan reinvigorated himself this World Cup. And the fact that he's thirty and possesses such match changing influence is another treat, dispelling the whole 'if you're thirty, you have no skill' opinion.

Front Striker: **David Villa – Spain**
Thank God Barcelona bought him before the World Cup. At certain times this World Cup, it felt that beating Spain meant beating ONLY David Villa. Until that semi final against Germany, Villa was involved in every single goal Spain scored in the tournament, whether it was scoring or assisting. 'El Guaje' was Spain's lifeline in this World Cup, and the fact that he is a total footballer was accentuated further when he was forced to play as a left winger, however, he reveled in that role, shown by his superlative performance against Honduras.

These men were my top picks of this World Cup. Of course, listing only 11 players doesn't do justice to all the wonderful performances shown during this one month bonanza. Excluding the likes of Iker Casillas, Sergio Ramos and Thomas Mueller from this list may be a crime, but this is the high level of quality displayed in this World Cup. While hot favorites like Wayne Rooney, Didier Drogba, Kaka, Robin van Persie and Franck Ribery flopped, these men rose to the occasion. ❑

Rain Dance

- Udita Ghosh

Two nights in a row it poured in rain,
Thunder rumbled far up high,
I watched through the streaked window pane
As lightning lit up the whole sky,
And sought to remember all the days
Of the wet smell of comfort known -
Flashes that my mind replays,
Memories alone that are my own,
Of days in brightly coloured raincoats,
School uniforms drenched in play,
Barely floating paper boats,
Under wet trees that happily sway.
Hot, soft *khichuri*,
Butter melting ever so slow,
Tangy *aachaar* and *aloo bhaja* -
With memories of rain they must go,
Or leaning out of auto
Watching water splashing from the wheels,
Spurting short laughing streaks as we go
And leaving streaming lines at our heels.
And wonderful little green mangoes -
-*Ambi*, hanging from the dark green trees,
Falling as the wind blows -
We scrambled for them on our knees.
Where are the white pebbles
Rain-washed, I stocked in a pot,
Which like childhood fables,
Unknowingly I quite forgot?
The large grey clouds have not
Visited me in a while,
The sweeping winds they would bring,
Came not within a mile
The days that we danced in the rain
Reside in another time,
Small pleasures, quite insane,
Lost in daily rhyme.
Oh beautiful childhood!
Like the *ambi*, soft and lush,
Juicy, tangy, every bite as good,
Found and gone in a rush.
So we may sit and watch the rain
From deep in cover and roof,
And remember the joy that pulsed in our vein,
But decide to stay aloof.
Or I must step out and heed no voice
Except of the rain clouds in the sky
Calling me out, I have no choice
But to get soaked in reply.

Activism, in 140 characters or less

- Diya Kar

What if Gandhi had Twittered on the way to Dandi to make salt? Or if Martin Luther King, Jr. set his Facebook message as "I have a dream?" The rapid growth and emergence of new social media in recent years has changed the scale and scope of social and political activism. The success of Barack Obama's 2008 presidential campaign demonstrated how these forms of media can be used to mobilize and organize millions, leaving his less-technologically savvy opponent befuddled and behind. Yet, the advent of these forms of new social media raises important questions about the future of social activism.

Political scientist Benedict Anderson wrote in his classic work, *Imagined Communities*, that the emergence of the printing press redefined how people saw themselves as being part of a community or nation. As newspapers and other printed works became more readily available, individuals in different parts of the same nation could increasingly conceptualize themselves as belonging to the same community, the same causes and therefore somehow connected. New social media, then, is redefining the kinds of communities individuals see themselves as belonging to. By clicking on "Like" we can identify ourselves on Facebook as supporting a particular political candidate, rock star or food; or by joining a particular group, we can belong to "A Million Strong against Genocide." Yet, even as we belong virtually to these groups, what are the consequences for actual forms of social activism?

A quick search on YouTube (the irony is not lost), which brings up clips of King's well-known speech, however demonstrates something else; as does a Google Image search shows Gandhi and his followers on their march of civil disobedience against colonial rule; or even the footage from Obama's election night speech in Chicago's Millennium Park. What is evident in these images is the fervor and dedication of the people in the crowds. Is it possible, then, to ever virtually constitute this sense of engagement?

French social theorist Emile Durkheim argued that the sense of belonging to society emerges through collective action. Durkheim focused on religious ceremonies in which collective worship, or collective effervescence, served not only individual spirituality, but also created in the individual a sense or feeling of the social. This sense of the collective, however, could dissipate over time, and so it becomes necessary to reaffirm the social through regular participation in rituals. In many ways, participation on social activism requires a similar kind of collective effervescence. Participation in rallies, protests, sit-ins or marches achieves something that is inherently missing in the virtual: the reaffirmation of the collective.

This is not to argue that activism through new forms of social media is disingenuous or wrong; rather it, is to consider the ways in which social media can be harnessed without losing the kind of work that traditional forms of social activism achieved. What do we do, in other words, after we have clicked the "like" button? ❑

Rendezvous with Touch Rugby

- Anagha Ramanujam

Growing up, I never picked up any sport. The focus on academic work was so intense that it was always easy to find an excuse for not getting to the field. So when I did manage to get to the field on a rare occasion, I was quite predictably hopeless... Throw in laziness, spice it up with the inability to face defeat and a dash of embarrassment for being worse than the worst, you have a perfect recipe for a 'non-sporting' me!

Ironically, I loved sports! So, I yearned to play... In 8th grade in school, I signed up for an inter-house badminton tournament. I believed this was the easiest of sports requiring minimal effort, had the right gene pool to pull it off (with a tennis player father and a badminton champion uncle) and hoped I would play well enough to not embarrass myself. By now, I think you already know what happened. I failed, miserably! I think the score was 12-0 in 2 matches. I couldn't serve. I couldn't pick up a serve and kept getting smashed, repeatedly, consistently, convincingly. Before I could gather my wits and realize what was happening, the game was over. Before I could strategize for the next game, that one was over too. I was ceremoniously escorted off the courts and vowed never to take a second look at any sports ground or court!

If only, I could be one of those who hit the ground running, I'd probably have become a pro at many a sport. Unfortunately, this wasn't me. Like everything else I have learnt, this too called for tremendous patience, practice and perseverance. I didn't have any of these. Or, I had an excuse to not give it a try.

School went by. I moved to university. I told myself I would learn to play. I may not be the best at it, but I would persevere. I guess it wasn't meant to be. I landed up in the tryouts for the same sport that I had miserably failed at and guess what! I got jelly feet and dropped off the court even before the matches began. We had to compulsorily play a sport or engage in social work. The latter seemed less intimidating!

I was always envious of people who were sporty. In the back of my mind, I always wanted to be there. I told myself I would try. I did. I tried a few shots at tennis, dabbled with swimming, tried rock climbing, hiking, athletics... These seemed okay. Probably because I was pitted against myself and not against opponents who intimidated me. I guess that's what built some confidence and I signed up with the corporate touch rugby team when I went to Hong Kong last year. Sounded exciting but I never made it to ANY of the practice sessions. I blamed it on long hours at work because of which I could never make it to the field at 7:30 pm on a Friday evening and 2:00 p.m. on a Saturday summer afternoon was way too hot to run around chasing a ball and other people off. With the sun beating down on the turf, my head would spin and I'd faint. So, I can't go. Or so I told myself. It was another opportunity lost.

This year, I very reluctantly agreed, yet again, to go for practice. I promised myself that I wouldn't back out and would be true to my word. Within a week of saying 'Yes', I was having second thoughts. I spent a week praying this was a joke and there was no tournament at all. When that seemed impossible, I spent the next few days hoping there were too many people who wanted to play, so I could volunteer to drop out. That didn't work either as they needed at least 2 girls in the team and I was one of the 3 who had signed up! I made all the initial disclaimers about being amateur, not wanting to let the team down with my poor play - the works. I don't think destiny wanted to let go of me this time. Every time I tried to hide, it sought me out and put me on the spot. The way I got pulled into the game by the team captain is more than a mere lesson in leadership. He said he didn't care for my experience and skill as long as I was willing to learn. Well, I couldn't say I didn't want to learn...

Another colleague from the team signed up too and with both of us playing on behalf of the firm, we could wiggle out on the 2 Fridays that we practiced. The first game was a lot of fun. Never having played in a team, I loved the whole idea of 6 different people being responsible for a collective objective. Yet, no one could sleep on the job. It was exhilarating to say the very least. It was, perhaps, the first time in my life that my hair was a colossal mess, my shirt was drenched in sweat and my heart was palpitating. I didn't seem to have a care in the world. Something, something at last had made my over analytical brain stop processing random thoughts! I loved it. I even looked forward to D-day. Sunday, 20th June will go down in history as the first day I played a team sport. Wow, this was exciting!

Come 19th June. I have jelly feet again. It is a sunny day with clear blue skies and no clouds. Not a soul wants to be out in this weather. I have my Big match tomorrow. I can almost sense the burnt skin and the splitting headache doing me in. I wish I didn't exist. I wish I wasn't in Hong Kong. I think of all possible excuses that would let me out. Each one seems lamer than the other. Also, something inside me pushes me to go for it. It will be an experience; I want to give it a try. If I am a loser, I will give it up forever. After a day trip to Macau, and a call from my colleague, the other girl in the team saying she had injured her knee and wouldn't be able to play, I try to fall asleep with an aching belly and a spinning head. I wish "tomorrow" never arrives.

Time and tide wait for no man. Or so they say. The morning did come, a little later than I had expected it to; I had to bring it on. After a quick shower, I changed into the team jersey. Black and red with the number 14 printed behind -I looked a clear picture of the devil! The Chinese character for 4 is the same as that for death. None of the buildings in Hong Kong have floors numbered 4, 14, 24, 34 ... Here I was, literally wearing death on my back, on the very first tournament in my life. Life has got to be kidding me!

I reach the stadium and peek out of the cab to see the team captain. I am so glad to see him! His laughter is a great reassurance! I pay the cab guy, he wishes me luck and I get to the pavilion. Half-an-hour later, the warm ups begin and then we were up for our first game against Swire properties. Luckily for me, the captain didn't depend on my amateur skills to see the team through. He had recruited a couple of professional touch rugby players from the Hong Kong and Singapore country teams and they saw us through to the semis.

In the end, we didn't win the trophy. The captain said he wasn't hopeful of the cup. But he hoped we could take back the plate. We truly disappointed him. What could you expect from a team that had amateurs like me pitted against some of the most seasoned players of touch rugby?

They say, you could lose the war and yet win some battles. Guess that's kind-of what happened today. We lost the trophy and the plate. But I think, in my mind, I won the never ceasing battle against my fear of playing a sport. I returned with a blasting head and an exhausted body. I showered and fell asleep only to be woken up with an ache that was worse than one I had ever experienced, all thanks to the day spent running around in the sun. Yet, after a few hours of sleep, awake and refreshed and reminiscing the series of events that led to the day's debacle, I am so glad I was a part of this team.

Sometimes, you need to push yourself, hard, harder, be harsh to yourself even. You'll see that there's many a thing to smile about after the pain subsides. That's how you grow as a person.

Three cheers to an excellent team and a brilliant captain! ❑

An ode to Salil Chowdhury

- Sujata Chowdhury

The musical genius of Salil Chowdhury or "Salilda" as popularly known, needs no introduction.

A combination of composer, lyricist, musician and an occasional singer, Salilda ruled the world of Indian Music for almost 40 years. Very few music lovers are there in India who are not fans of Salilda. The biggest characteristic of Salilda's music was that, unlike his contemporaries, his lyrics not only spoke of romance and beauty of life but more of stark reality and broken dreams.

This article is not an analysis of Salilda and his music which I am not at all qualified to do and has been done umpteenth time in various places. It is more of a personal interpretation, experience and influence of his songs on the life of one of his ardent fan and admirer.

My generation was not even there when Salilda started his career. My earliest recollections of Salil Chowdhury's songs were those sung by his daughter Antara Chowdhury and composed by him. Antara's album of 'Bulbul pakhi moyna tia' and songs of a less known Hindi movie "Minoo" became our hot favourites. Little did I know what more was there. My first step to Salilda's world of music was through the album "Abak Prithibi" sung by Sri Hemanta Mukherjee. Those unforgettable melodies and lyrics created for me the unknown magical village life , which we city breds never had the opportunity to experience. Particularly "Dhitang dhitang Boley" became our favourite dance number for any occasion.

Then came the college days when Salilda's Hindi and Bengali romantic melodies became a part of our musical journey. Salilda's songs became a tool of our emotional manifestations. Salilda's songs taught us to see romance in life. My particular favourite was "Madhumati" and bilingual ones sung by Lata Mangeskar.

I have discussed Salilda's songs with our previous generation, contemporary and next generation. We differ on a number of issues but there is one point where we all agree, the time-less magic that was Salil Chowdhury. Salilda is no longer in this world but wherever he is, he still lives and will continue to live in the hearts of millions of music lovers across generations. ❑

Of Children and Siblings

- Sougata Mallik

In India, in our childhood, we had lots of aunts, uncles, brothers, sisters and cousins that we grew up amongst. In most cases the age structure in the families was similar to that of a staircase – one step gradually giving way to the next, existing one after another. Every epoch fell just after the other and cousins, siblings had a close-knit age difference between them. Such was the hierarchy in those times. Even in our extended family my oldest cousin was only few years younger than our aunt, my father's youngest sister. When my grandparent's marriage was arranged, the first thing that my grandmother had learnt was that her would-be husband belonged to a family of eleven brothers and sisters.

There are numerous, umpteen instances of people and families we know in India or those now living abroad who belong to such households and have grown up with plenty of siblings and cousins. That was a phenomenon, an experience world apart - and however much we try to explain to our single child brought up in a nuclear family setup the delight, the sheer joy, the unending fun of growing up in such circumstances, it will remain something beyond their imagination or wildest dreams. Now having large families or too many children in India or elsewhere is somehow relegated to the less fortunate, illiterate classes. Sitting in the family-room couch and flipping television channels on a rare, lazy, work- free afternoon, all these thoughts crossed my mind when I chanced to watch a report that stated that a 33-year-old woman in The United States had given birth to eight children and all of them surviving.

The television camera sometimes pinned to the woman's house and then to the close-up of the babies in the hospital bed all wrapped up like white bundles, some with the oxygen and feeder tubes etc. It struck me that these kids will be growing up together all under the same roof, every day of their little lives! The number suggests that, what we would call a joint family. Fun, frolic … modified, pressed, deprived existence?

My trend of thought detoured itself. It was 3 pm and my teenaged High school daughter returned home. I don't have eight kids – I just have one. Mothers like me who only have one or two children, will perhaps agree that we keep our eyes pinned on them. We listen to them; take note of them, their activities, interests, wishes, desires. We pay far too much attention to them. By this time, my daughter is a young adult, a young lady. She sprints around the whole house like Julie Andrews in 'The Sound of Music'. She now takes decisions to buy the right kind of clothes for herself, advises her father and me on our formal outfits for work or social events, and on some rare occasions gives us presents and gifts. Friends and relatives who visit us, are often happy with her or find her gratifying. But let's not forget that she is growing up in a household that cherishes and nurtures fewer members. If under the circumstances she is ever required to live in the broader spectrum, I can vouch she will nowhere fit into the wide joint families, numerous siblings, cousins, relatives like we had in the olden times. As I looked at her with this thought, with a glint in her eyes she told me to anticipate something which can be unrevealed after her father returns from work. In the modern nuclear families of these days, father-mother-child is the only thing they know.

Nonetheless, I initiated my gift from my small family – it was a gleaming exercise-bicycle sitting in my room. While I am an absolute non-exercise pro, I was skeptical about the bike. My daughter told me it was more than a gift - it was about a trim and fit body that could enable trekking and allow me to pry into every cave in the Himalayas! She emphasized that I could put that cycle to good use: exercise-ing, de-stressing, load-shedding. Her words translated zest as I eyed the cycle. I was asked to take up the project with gusto!

So I did. In-between spells of chores and tasks, I would sit astride the cycle and pedal with profusion, fantasizing about shapely long legs, Himalayan trekking. It is a truth universally acknowledged that while men must be muscular, women should be tubular. Incessantly the implications are about maintaining the ideal physique, which will lead to good health, happiness, a protracted, sickness-free life.

After a few months of rigorous discipline and fervent enthusiasm on the exercise bicycle, I suddenly noticed I could rarely walk without experiencing pain in the knee and ankle joints. And what a pain there was, my country's men and women! Creaks, aches, crackle, rattling of bones - I had them all.

Behaving like a responsive, aware person I went to see a doctor. He advised and prescribed medicines, X-ray. The doctor mentioned that if I engage in excessive cycling I could develop knee erosion. Erosion! Since my last Geography test in high school, I had not used that word.

My husband was livid. "*You and your daughter*". This possessive switch is quite common - when the daughter does something wise, it is his daughter and sometimes generously our daughter, but if she does something fallow, she is my daughter. Such is the politics of familial semantic jugglery.

I turned to my trusted associates and links for help or suggestion. I Google-d, Yahoo-d and the good genie in the computer showed me thousands of web pages that told me I was not alone. There are plenty of men and women with the same problem. I was assured. But at the same time was proud of myself - especially for a never-athletic woman like me, painstaking marathon cycling was one of the bravest things I have ever done in my life!

Thankfully, my friends from all over the world rushed to me. My childhood classmate who now lives in Houston sent urgent text, "*Throw that cycle right now*". She had a similar story. Her conscientious jogging through the roads of Houston, only to become slender had almost sent her knees to the surgery. This incentive was also a flip side of the coin. Her America born and raised daughter wanted to be proud of a slim and trim mother to go shopping with. This young girl also had never lived with obese grandmothers, overweight aunts or plump, round, heavy uncles. Raised in America and in a nuclear family, she too had missed out on the assortment and variety of joint households.

Oh yes! What did I do with the vicious cycle? It is in the attic covered with an old, grey bed sheet. I am much better now. I climb up and down the stairs, drive long distance and finish my usual chores in time. I can once again sit on the floor, pick up something that slips and rolls under the bed or table. I can stand on my exercise-free, pain-free legs again with ease! ❑

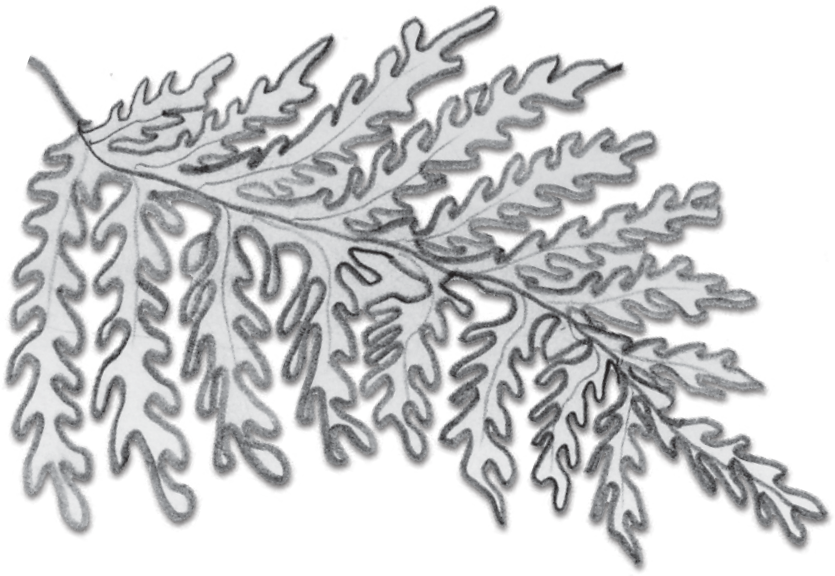

A Walk Down Memory Lane

- Ahona Gupta

Tokyo is cold during winter....and by cold I mean FREEZING!!!! Most of our winter evenings and weekends are spent huddled under the blanket with both the room and floor heaters on...sipping hot coffee and generally cursing the howling wind outside and its resultant sub-zero temperature. Coming from the sunny climes of Kolkata, where winter is a long awaited and cherished season... a season of light woollens and even lighter moods; the dark and gloomy winter of Japan is definitely not something I look forward to.

Occasionally on such cold wintry evenings I find myself turning back the pages of time and revisiting my childhood. As it is with most schools in Kolkata (specially the non-Christian ones like mine), winter holidays were almost an after-thought. While the summer and the Puja holidays stretched over a month and a half...the winter holidays were a measly 2 weeks, and it was within those 2 weeks that we managed to cram in all possible fun activities. We would usually go on our annual family trips during the longer holidays while the Christmas vacation due to the shortage of time, was mostly limited to local attractions.

Some of those attractions which remain vivid in my mind (and I am sure in the minds of every true-blue Kolkatan) include visits to the Alipore Zoo complete with badminton racquets, Frisbees and of course a picnic hamper; at least one visit to whichever circus was in town (Nataraj Circus was my particular favourite, although in my late pre-teens, I started appreciating the Russian circus more) and of course the event I personally looked forward to the most, the "Boi Mela" or the Book Fair held every year at the Maidan. Earlier, I used to go with my parents and a brood of cousins and later on with my friends...but the magic remained the same irrespective of my companions - the crisp smell of new books mingled with the mouth-watering aroma coming from the 'Ben Fish' stall, the endless queues outside the popular publishing houses and people just sitting on the fair grounds and soaking in the ambience; all went towards creating an unforgettable experience. I have not visited the Book Fair in the last six or seven years, but sadly I hear from the people who still go, that the fair is not what it used to be...its magic has been greatly diminished.

While these are all memories of outdoor events, my favorite memory associated with winter is an indoor one, a memory which I am sure, most Kolkatans will recognize and reminisce about - eating 'komla lebu' (oranges) and reading a book while soaking in the warm afternoon sun! Right from my early childhood, I was an avid reader, everything from books to magazines to 'kagojer thonga' (paper bags made from recycled newspapers) would be gobbled up by my hungry eyes. It was a habit my dad was only too happy to encourage and encourage he did. Our school back then, had its mid week holiday on Thursday unlike many who broke for the whole weekend. Every Saturday, I would come home from school to find my favorite sunny corner of the verandah set up with quilts, pillows and a brand new book inscribed with a funny message from dad. As I crossed over into my teens the authors changed from Enid Blyton to Erich Segal, but, the scenario remained the same. My 'baba' (as I used to call my dad) would then serve me my mid-afternoon snack (usually a variety of sandwiches and of course the ubiquitous orange in all its peeled glory), while I lazily laid back and turned the pages of my new book. Sadly, those times are no more and neither is my baba...but if I close my eyes and try hard enough I can still feel the warm sun on my back, hear the rustling of the crisp pages and smell the oranges..... ❑

Food, Energy, Life

Life is given to us,
we earn it by giving it.
- Tagore

- Sudheer Reddy

This article is about food, energy and life. Let us start by looking at figure (a). I think most of us are familiar with this life flow. If you wonder how this life flow is sustained then refer to figure (b). You will not find anything exciting but rather boring things such as organic matter, microorganisms, humus and soil-nutrients. However these boring things are extremely important in sustaining the life flow on planet earth. It is interesting to know how we, as a human race, played our role in this life sustenance cycle in the past, what is happening in the present and what our children have to deal with in the future. My focus in this article is on plants.

Figure (a)

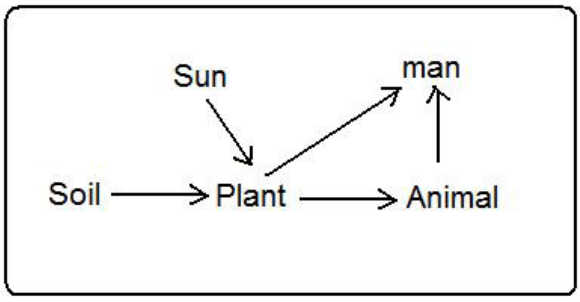

Figure (b)

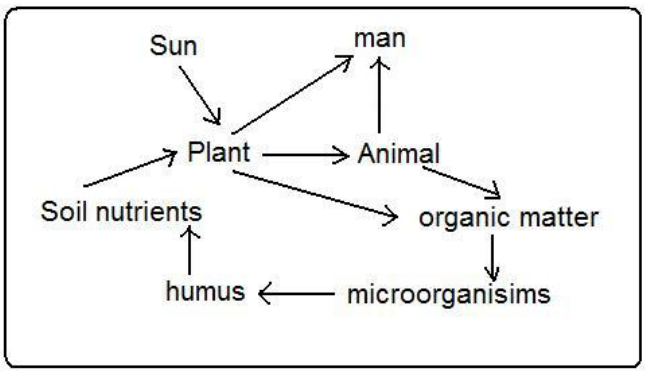

A little bit of history. Man crossed a very important milestone when he evolved from hunter-gatherer to domesticator of grains. Archaeologists and historians suggest that it all started in the fertile crescent of Middle East around 10,000 years ago. Since then, man clearly understood the life sustenance cycle (figure-b), developed cultures based on making this cycle even more efficient, created a huge knowledge base required to domesticate "selected" plants and basically found the rhythm to live in harmony with nature.

However, as man got smarter (or evolved), he understood the science of things around him and inside him. Man's struggle for existence led him to triumph over natural disasters and diseases that had kept his population under check. What is the impact of such "rapid" evolution and population growth on the life sustenance cycle? Until recently man was using natural way of farming plants (or natural-farming) which is in alignment with nature and where entire focus was on making sure that soil nutrients are abundant to support the plants. It was also interesting to note that there was a little bit of tinkering done by adding certain natural materials to the soil (lime and gypsum) to improve the yield of natural-farming.

However, when Justus Von Liebig, one of the most influential chemists of 19th century, published his research on agriculture chemistry, the way of farming entirely changed with focus shifting from soil to plants. All soil nutrients were boiled down to N-P-K: Nitrogen, Phosphorus and Potassium. Slowly over the century most of the countries adapted this new way of farming which relies on synthetic fertilizers as a total diet of inorganic minerals to cater to plant's needs. This industrial way of farming was primarily aimed at improving yields in order feed growing population.

So we have natural farming - dominant way of farming in the past, and industrial farming - dominant way of farming in the present. Let us look deeper into natural farming.

Natural farming:

Key principles of natural-farming (as I understand) are Living soil, Soil fertility, Natural manures, and Pest & Weeds management.

Living soil is the foundation of natural farming. It is the Soil where life is teeming with creatures such as earth worms, mites, centipedes, lice, worms, termites, ants, and millions of microorganisms. These creatures are essential for breaking down the organic matter and to make nutrients available to plants. Healthy soil = Healthy plants that are naturally disease and pest resistant.

Soil fertility is the basis for sustainability. Attention is given to building Humus which is well-decomposed organic matter in the soil and is produced by a host of beneficial soil organisms.

Humus holds essential nutrients and releases them slowly to the plants, prevents harmful chemicals from damaging plants and helps retain water in the soil. Soil fertility once established can be maintained and improved by crop rotation.

Natural manures such as animal manures and composts help to increase soil fertility. Compost is basically enriched biomass. All the biomass ingredients are usually collected within the farm. It is said that composting is similar to preparing curd at home. Right combination of biomass, culture, temperature, water and air makes the right compost.

When living beings (plants and animals) co-exist sharing natural resources the weak perish and the strong live longer maintaining equilibrium in the eco-system. Pests are treated as integral part of the farm eco-system and are naturally kept under check. One way to deal with We eds is cutting off or smothering.

If you notice, natural farming is perfectly aligned with life sustenance life depicted in figure (b). Now let us look at industrial farming.

Industrial farming:

Here the focus is to increase crop yields by large scale usage of inorganic salt fertilizers, pesticides, growth stimulants, mono cropping and unsustainable irrigation methods in order to achieve desired results. Recently genetic engineering is applied to directly manipulate plant's genes. Are there any undesired results of industrial farming? Yes, vanishing top soil fertility, dwindling yields, increased pest menace, decreasing ground water resources – to name a few.

Again refer to figure (b) and you will notice that industrial farming basically short circuits the cycle by directly replacing soil nutrients with synthetic fertilizers and chemicals. How are synthetic fertilizers and chemicals produced? The answer is "Oil" - with all its controversies and the politics. The present dominant way of farming is essentially breaking the life sustenance cycle and turning it into a linear flow based on energy sourced from Oil. Now this is some food for thought.

Proponents of industrial farming claim that natural farming is not economically viable but they ignore the true cost of "industrial farming" after factoring externalities. Another argument made by proponents of industrial farming is based on the myth that crop yields of natural farming are low and cannot meet our growing population's food demand. I call it a myth because it is based on false notions of "productivity". I have deliberately not included many other factors in this article. Factors such as industrial-animal-farming, skewed public policies & subsidies and politics that will make this subject even more complicated to discuss.

New way of farming:

Is there a new way of farming that is based on the philosophy of natural farming and takes advantage of modern science & technology? Yes, there are already communities both in developed and developing countries doing this in small and large scale. The growing market for organic produce has very many interesting players and one can find innovative working models. However, I do have a word of caution for organic produce. Recently big corporations have entered this lucrative market to chase big profits and they are only interested in adhering to the rules of organic certification (some of which are fuzzy) and not interested in the essence of organic farming.

Several modern techniques practiced along with intercropping and crop rotation with legumes makes small scale natural farming a success story. Let me focus on one such modern technique widely used in India. If you remember, compost is natural manure which increases soil fertility. Several new methods of composting which are based on scientific research have evolved recently. "Indore-method" which depends on vegetable and animal waste is a popular method that has spread even to other countries in Africa and Latin America. NADEP-method practiced in Maharashtra aims to make farmers self sufficient with manure requirement.

If you are interested in visiting a place where the principles of natural farming are practiced here in Japan, I recommend a trip to "Maioka park" in Yokohama (phone: 045-866-8328, http://www.city.yokohama.jp/me/totsuka/kusei/maioka.pdf). Make sure to call and request for a guided tour.

So is there anything you can do as an individual? You eat thrice a day - you get to vote thrice a day. Pay attention when you are shopping food products. If possible buy locally produced food that is seasonal and organically grown. Look for below logo if you want to buy Japanese certified organic produce. Remember my warning, do not blindly buy organic produce, do some research. The most important thing is to be conscious of what you eat.

Refer to figure-b again. For the future of our children, that cycle has to be self sustaining.

"Life is given to us, we earn it by giving it". ❑

General Nutrition Concepts

- Alaka Mohan Chutani

SELF HELP IS THE BEST POSSIBLE ROAD TO HEALTH.

NO ONE EXCEPT YOU IS MORE INTERESTED IN YOUR HEALTH.

Nutrition – is an important component of health. It is Science of food and its relationship to health.Life can't be sustained without adequate nourishment. Next to the air we breathe, water we drink, food is - prime necessity of life, as it provides energy for all work; as well as for growth of the body. The challenge is to learn how to continue to improve the palatability and quality of our diet while doing so in a more healthful manner.

Some basic principles for understanding and practicing good nutrition.

Calorie: Calorie is a unit of energy. One Calorie is the amount of heat that increases the temperature of one kilogram of water by 1 degree Celsius (scientific definition).In context of food, a calorie represents the amount of energy a particular food provides in our body once it is digested. A person utilizes calories/ energy through physical activity& the rest of excess calories/energy produced upon food digestion are stored as fat. The storage of extra calories over time leads to increase in weight.

Nutrient Density: Nutrient density is defined as, "ratio of nutrient content (in grams) to the total energy content" of a food. It means that compared to the Calories, how many nutrients is provided of the food.Nutrient density is a good indicator of how "healthy" a food is. Higher the nutrient density better of the food. Example: Spinach is a very nutrient dense food.

Calorie/Energy Density: Calorie/energy density is the amount of calories a food provides per volume measure. Example: Ice Cream is a Calorie dense food. Carrots are a low Calorie dense food.

Energy Balance: While understanding energy balance, think of a weight balance with one side (e.g. left side) representing all the food and drink consumed within one day and the other side (e.g. right side) representing the amount of energy used in a day. If you want to maintain your body weight; both sides should be in balance- thus, food intake energy equaling the required energy by the body & thus energy balance is neutral. To lose weight; you utilize more energy than the food intake energy/calorie & thus creates a negative energy balance. On the other hand, in case of gaining weight, there is a positive energy balance. That is, the energy through food which the body receives exceeds the requirement for the day.

Variety: "Variety is the spice of life" is quite true for achieving optimal nutritional status .As every food provides different nutrients; we should take a variety of foods and not depend on one food. In addition, have a variety of foods within the same food group as well. For example, in vegetable group, don't eat just one vegetable like potatoes, but eat a variety of leafy green vegetables, carrots, peas, and so on. Similarly in the cereal group; have a variety like wheat, barley, semolina, oats, rice etc. Mix it up and have fun trying new foods and recipes and benefit your body at the same time.

Balance: For a "balanced diet" you should daily have foods from all the main food groups – cereal, pulse/meat, vegetables, fruit, dairy products, Nuts& oils daily. Instead of having just one kind of food e.g. chicken for dinner, have green beans and a roti/rice/baked potato with it. Balance the proteins, carbohydrates, and fats in each meal.

Moderation: A major contributor to the overweight/ obesity problem is the portion size of the food we eat. The key is to incorporate moderation in the foods in our diets. Instead of eating a big portion size; opt for smaller portion size. You will be surprised to see how much total calorie intake you can reduce by practicing moderation in your food portions.

These three principles -**variety, balance, and moderation** are important for establishing healthy eating habits, maintaining a neutral energy balance, and also in improving your body's overall nutritional status.

Actual Daily Intake/Food Journal: To improve your nutritional status & to assess your intake; it is

good to record everything you eat for three days in a food journal. You need to honestly record every meal, every lick, and every bite of food you take. After recording your intake for three days, compare your actual intake to your recommended intake with the help of a dietician or website resources on food pyramid.

Healthy Lifestyle: Every day one makes choices and our lifestyle affects those choices. If we follow and have a healthy lifestyle; we are more likely to make wise decisions about the food intake and activities we undertake. Thus a healthy lifestyle helps in practicing healthy eating choices.

Nature's prescriptions for good health

- Eat to live, do not live to eat(maintain body weight)
- Clean up the oily mess(reduce total fat)
- He who follows nature (natural grown, coarse grains, vegetables)is never out of the way
- Nature is bountiful, so stay close to it(eat fresh fruits & vegetables)
- Don't get reduced to ashes(Don't smoke)
- The wise depend on exercise for fitness ❑

Edomura, an unique experience in Japan!

- Adriana Elena Stoica

A common topic of interest among people interested in Japanese language and culture is the fascination towards the image of the ancient Japan, especially in the Edo period (1603-1868). As the Japanese literature and many works of popular culture (novels, stage plays, films, television shows, animated works, manga, video games and movies) are abundant in presenting the lifestyle and customs, facts, great events of the period (Siege of Osaka, Shimabara Rebellion, and the decline and fall of the Tokugawa shogunate), historical and fictional people and groups of the period, including Miyamoto Musashi, Izumo no Okuni, Yagyū Jūbei Mitsuyoshi, the fictional Isshin Tasuke, Yui Shōsetsu, Matsuo Bashō, Tokugawa Mitsukuni (Mito Kōmon), Ōoka Tadasuke, Tōyama Kagemoto (Tōyama no Kin-san), the Forty-seven Ronin, Sakamoto Ryōma, Katsu Kaishū, and the Shinsengumi, as well as the fifteen Tokugawa shoguns, it is obvious that almost everyone became attracted to experience the lifestyle of that time.

For an unforgettable experience of the old Japan, Nikko Edomura (Edo Wonderland) is the perfect place to visit. The theme park that recreated the ancient town and buildings of Edo period give the visitors a complete image of the downtown just as it was in the past with streets, merchant houses, commoner's houses and samurai's (warrior) residences, traditional houses, arcades, pavilions, restaurants and theaters. The houses and shops, replica of the original ones, are built using traditional materials and methods and give a clear picture of how period craftsmen worked.

Indeed, visitors feel as if they went back in time as soon as passing through the entrance, since Edo's townscape as well as roads, post station, old towns, and samurai residential areas are recreated exactly like how they seemed in those days. Park staff wears traditional costumes and look perfectly integrated in the scenarios, performing different traditional activities. Visitors can also join the atmosphere by renting costumes and weapons of samurai, kimono and decorations of princesses, and other Edo characters and wearing them around the town, while joining the main activities and event of the time: Mizugei (water magic show), the Oiran's (high-class courtesans) march shows, as well as performances by ninja's, geisha's and other traditionally dressed artists and townspeople.

Indeed, every space you can find in the park quickly turns into a theatrical performance spot where you will find the people of Edo engaged in various occupations while also seeing many other uniquely Edo features such as street performers doing the Nankin-Tamasudare (trick performed by using a 30-centimeter bamboo curtain and changing it into various shapes such as fishing pole, bridge, willow tree, and flag while singing along).

Around the park there are lots of other performers and also games for visitors to participate in, but I think the most popular attractions are the spectacular and dynamic Ninja shows at the Dai-Ninja Gekijo and Ninja Karasu Yashiki where the audience enjoys following the story and watching the martial arts demonstrations. A wide range of samurai's clothes, steel swords, throwing stars and other weapons can be found at the Ninja House, together with full explanations about their purpose and significance. For an interesting experience to understand samurai's life style and training, the audience can try the Ninja maze, a tricky labyrinth made of wood logs that look repetitive and disorienting. The bravest can visit the wax museums, Kodenmacho Jail House and Kira-Kozukenosuke Residence that show graphic scenes of prison life, torture, battle. Another challenge worth visiting is the haunted house where different Japanese spirits and ghosts, pop up from nowhere amongst sloping floorboards and tricky mirrors and some other optical illusions.

After enjoying the shows and displays, visitors take rest at the local restaurants. Good food is guaranteed inside as well as outside of restaurants, as there are many stands selling dumplings and freshly-steamed Manju. Before returning, people love buying souvenirs from the traditional shops or taking picture with the popular mascot Nyan-Mage.

For the ones interested in Japanese culture, Edo Mura is a "must-see" place to enjoy and have good memories! ❑

Flowers in Japan

- Christine Banerjee

It has been nine years for me to live in Tokyo. Before coming to Japan I thought that Sakura (Japanese cherry blossom) is the only flower I wanted to see in Japan. Over the years, I found that I had missed a lot of chances to see many other types of beautiful flowers in Japan and now, I try to be on the lookout for places to see different kinds of flowers. Here are some of my favorites.

Can you tell the difference between cherry blossom (sakura) and plum flowers (ume no hana)?

They look very similar, right? I could not tell them apart before I learned to look for the minor differences. The photo on the left is a photo of plum flowers (taken at Mogusaen on the Keio line) which you will see has flowers flowering on the main branch and you can see the stamens clearly in each flower. In addition, the flower buds are more numerous and longer in case of plum flowers compared to the buds of the cherry blossom. Plum flower season in Tokyo is between January to Feburary.

The photo on the right is that of cherry blossoms (taken near Sophia University at Yotsuya on the JR Chuo line). You will see that cherry blossom flowers are also growing on the sub branches – this is something that does not happen usually in the case of plum flowers. So from next year onwards, when you see white or pink flowers, try to look a closer look to see if you can distinguish between plum and cherry blossom flowers!

Boats and flowers, anyone?

When the flower season arrives, taking a boat to do the flower watching is quite popular in many areas. Seeing the flowers growing on land from the water gives you a different view of the flowers compared to the view that you can get from the land and being on a boat is often a lot of fun. Boats and flowers come in various styles. Some places, like the Sawara Water Plant Park in Chiba (left photo) try to recreate a bit of history by having a lady dressed up in old-style costume to show you the park and tell you the story of that area. The flowers in the photo are iris. Incidentally, this park is the biggest iris park in Japan with more than 400 kinds of iris being grown. The peak season is from the middle of April until the end of June. You may not believe it, but there are 150 million flowers growing there during the season!

The photo on the right was taken at Chidorigafuchi in the Kudanshita (Hanzomon Line) area during

the sakura (cherry blossom) season. After you enter the famous "sakura tunnel"at Chidorigafuchi, walk past the Indian Embassy and keep walking straight. You will eventually reach a boat house where you can rent boats that you can row yourself in the moat and enjoy viewing the tunnel of flowers from the outside. Try to go early as in the peak season you may have to wait for a couple hours to rent a boat! If you do not have that much time it is still fun enough to see people on the boats as you walk slowly through the sakura tunnel. You too may want to compose a photo with the pink and white sakura, the green water of the moat and the blue boats with happy smiling people rowing them!

How many colors of Wisteria (fuji no hana) do you know?

Doesn't the purple wisteria on the left look like one of the trees in the movie Avatar? When I saw this big tree-like vine, I was very surprised and could not believe that it is one single vine with such beautiful flowers and without any leaves. Actually, wisteria smells like grapes and for a moment you may forget that they are flowers and may really want to eat them! I felt like I was on another planet! This wisteria trellis is in the Ashikaga Flower Park in Tochigi and is the biggest wisteria in Japan covering more than 1000 square meters and still growing. It is 140 years old. It is said that this wisteria is one of the most beautiful wisterias in the world.

Besides the purple wisteria, there are white (middle photo) and yellow ones (photo on the right) too. There is even a tunnel of white wisteria. The tunnel is about 80 meters long and full of white flowers that smell very sweet. They also have a yellow wisteria tunnel that is 80 meters long. This wisteria park is perhaps my favorite and after going there I often tell my family and friends that they have to go there at least once in their lives!

The season for wisteria is from the middle of April to May but the park has many different kinds of flowers growing throughout the year.

Cycling around Poppy fields?

For those of you who do not want to travel far from Tokyo, you could consider going to a place close by like Showa Memorial Park in Tachikawa (JR Chuo Line). Showa Memorial Park used to be an air field

but now has many types of flowers growing through the seasons. For example, if you go in April, you may be able to enjoy some lovely poppy flowers. Poppy flowers have different colors, e.g. red, white, yellow and orange although red is probably the most common.

In other seasons you can see tulips, cherry blossoms (sakura), azaleas (tsutsuji), peony (botan) and cosmos. The park has lots of open spaces where you can have a picnic and there is also a small lake. You can rent bicycles to go around the park or even rent a swan boat to go around the lake.

Tulip – is this the Netherlands or Japan?

Absolutely, it is Japan! These photographs were taken at Hokkaido, Kamiyubetsu Tulip Park in May. There are 120 different kinds of tulips and in total 120 million flowers growing in the park. I have never been to any tulip park in the Netherlands yet but this tulip park is very impressive. I believe it is the biggest tulip park in Japan with a total area of 12.5 hectares.

Since the park covers a very large area, besides walking around you can consider taking the park shuttle bus to watch the flowers as the shuttle bus drives around the park. Not only that, you may also take a helicopter ride inside the park and see the whole view of the park up from the sky!

Phlox (shibazakura) – Have you ever seen pink hills?

You might have seen phlox in Tokyo or somewhere around Tokyo. However, if you want to see two big hills of pink color then a trip to Hokkaido, Higashimokoto Shibazakura Park is recommended. This is not just a field of flowers but two entire hills full of flowers! The phlox flower season is from April to mid-June. The flowers actually have different colors like white, pink, purple and red. Each flower is very small with a diameter of only 1.5 cm but when they flower together they cover the entire hill. Walking on the pathways between the flower beds make you feel like you are in a dream!

Why don't you too search for flowers near and far and share your thoughts with friends and family over a cup of chai? ❑

The Battle of Wits

- Tapan Das

"We were quite cornered in the battle front and we knew we were losing. In fact, our old black king, though psychologically strong was very weak physically and could hardly move. Being immobile in a war as a leader was proving to be disaster. He was facing a stiff fight from the white army. Of the three strong soldiers who had been positioned to protect and guard the king, two had been killed on duty and I was the only one guarding him. The black looked on helplessly as the swift white army surged in like tidal waves, killing our people.

From the hillock where I was guarding the king, I had a full view of the battle front. We were fortunate that our black queen was quite dynamic. She was literally 'a black beauty in amour.' 'God help the Queen,' I kept crossing my fingers for her as she fought valiantly with her knights. She killed a couple of white enemy officers herself. Each time, I sent up a silent prayer of thanks. But I knew our situation was quite vulnerable. Since we lost so many key people in the battle, it was difficult for her to be offensive. Looking at the situation she decided to defend and save the old king. I was shocked when I saw an ordinary white soldier, threatening our black queen. He had the audacity to come very close to her but her brave knights sacrificed their lives to save the queen. Soon she was trapped and killed by the encircling white army. I panicked. I looked around for help. But I could see none but white soldiers around. Our fate was sealed. I waited with thumping heart and baited breath. But doom descended on us soon and our fort was ceased.

Being defeated, our black king and I tried to run away together towards the nearest rocks. But it was too late. As our black king moved up behind me a harsh voice unnerved us completely. 'Check-mate', it said.

Another game of chess had come to an end and Gary Kasperov loses the world title to the defending champion, Bobby Fisher.

I couldn't help but smile at the collective groans and grunts of protests that burst out from my young pre-teen audience including my daughter Saachi, as I ended the story above. After all, such an anti-climax was quite unexpected! They were already quite worked up and were probably gearing up to save the helpless black king in their mind. I had almost gotten them to believe that I had really been out in the trench and the fort and the field during my youth, and had really swished and swirled the sword at the command of the king. What a let-down to know that it was a chess board fight I was talking of! I had felt the same when I first read this story in my school text book long back.

The eager-eyed young group huddling together around me on the blue berth of a compartment in Godavari Express, was hungry for more stimulation to their imagination. We were on our way back to Hyderabad from a savouring trip to the unspoiled beaches of Vizag and the hills of Aaraku.

Pujo was in the air and its spirit had seeped into our conversations, our feasts and our stories on this trip. I recalled a day in our jungle camp near Aaraku when these awe-struck, unwavering eyes were hungrily drowning into my words as I narrated stories of Mohishashur's three transfigurations to elude Devi Durga who killed him in all the three forms, nonetheless. I remembered the young Ruku from Satyajit Ray's famed movie 'Joy Baba Felunath.' Fed constantly on mythological stories, fantasies and adventure stories, Ruku's reaction is quite a sum up of what this group of Rani-Angshuman-Riu-Ria-Baban Ankita, Abhi, Digvi, Misa and Saachi keeps feeling too: '…shob sottyi. Mohisashur sottyi, tintin sottyi, aranyadeb sottyi, Captain Spark sottyi…'

I was sure that the emotions that this story had whet up in them were quite akin to the involvement I notice when they play video games. They are race car drivers, super-heroes on bikes and fighter plane pilots then. One look at their determined face and focused eyes while they are at this, and you are quite convinced, that your little kid is actually out in the fields and battling it out! I fear the unthinking addiction it can give rise to. But I am hopeful of the imagination it can generate.

Imagination can make them fly. So I don't clip their wings. I remember George Bernard Shaw: 'You see things and you say, 'why?' but I dream of things that never were and I say, 'Why not?' ❑

Explaining India's Growth Mechanics

- Gautam Ray

Despite its woefully inadequate infrastructure, rigid labor laws, complicated tax systems, labyrinthine judicial system and inefficient public delivery system afflicted by corruption, Indian economy has been growing steadily in the last four decades. In the current decade the average annual growth in real terms (netting out inflation) is 7.65% on the back of 5.62% average annual growth in 1990s decade.

In order to understand India's growth mechanics, it is necessary to examine the state level data in India's fourteen major states. Per-capita net state domestic product grew in this decade at the slowest pace in the poorest second and third states, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, while highest growth is witnessed in the richer states of Gujarat and Andhra Pradesh whose ranks in poverty reduction and overall HDI are also relatively high. Five states in the lowest range in per capita income, decline in poverty incidence and human development index (HDI) ranks grew at lowest range of rates while five richest states with highest ranks in poverty decline, namely, Kerala, Punjab and Haryana, Gujarat, Andhra Pradesh and Tamil Nadu were the states that exhibited highest growth range.[1]

During last decade also the same trend is observed. Studying these major states, Datt and Ravallion (2002) found that poorest states in 1980s grew at the slowest pace in 1990s. Another important finding of this paper is that growth in India has been higher in states that exhibit lower growth elasticity of poverty decline which explains why economic growth has not significantly reduced poverty incidence in India. Looking at the decline of poverty incidence per Datt and Ravallion(2002) incorporated in col.4 of the Table, it is seen that during 1960-2000 poverty incidence declined the most in Kerala at an annual rate of 3.26% followed by Punjab and Haryana, 2.96%, Andhra Pradesh, 2.38%, and Gujarat 2.02%. The lowest decline in poverty was in Assam, 0.06%, Bihar 0.32%, and Madhya Pradesh, 0.80%, Uttar Pradesh 1.11%. Again, these are the states which grew at the slowest pace and their human development indictors also improved the least during this period. This correlation has an important bearing in understanding India's democracy mediated growth dynamics.

Ray (2001) shows that three factors of production drive growth of the real economy[2]: accumulation of physical capital and knowledge capital which are privately owned; accumulation of public infrastructure capital including social capital that are commonly owned; and increase in access to such commonly owned public capital. Poor economies due to lower level of accumulation of private and public capital and lower access of public/social capital among the poor fail to grow at high rates, while economies with higher levels of such capital and access continue to grow at higher rates. Both capital accumulation and increased access are necessary and critical for higher growth momentum of the real economy in the longer run.

India's four decade long growth story broadly follows this dichotomous growth dynamics in its richer and poorer states. Comparatively richer states where poverty declined the most and access to public goods /services widened the most grew much faster than poorer states with low poverty decline rate and low HDI rank. Maharashtra in spite of being a well endowed capital rich state which drew 35.46% of India's total foreign direct investment (FDI) grew at relatively lower rates in this decade as it could not provide higher access to capital to its marginal groups, a fact that is evident from its lower level of decline in poverty incidence and lower HDI rank. West Bengal in spite of achieving a relatively high poverty decline grew at lower rates than Karnataka, Gujarat and Tamil Nadu as its capital accumulation was lower: it attracted only 1.30% of FDI as compared with 17.78% by Delhi and Haryana, 6.49% by Karnataka, 6.20% by Gujarat, 5.36% by Tamil Nadu, and 4.12% by Andhra Pradesh[3]. This

1 See Table. Among the poorer states, Bihar and Orissa grew at high rates particularly in 2005-06 and 2006-07 mainly because these mineral rich metal producing states benefitted from very high price rise following huge increase in demand in China and India. Maharashtra, the second richest state in per capita output term, was laggard in poverty eradication during 1960-2000 and growth during 2000-2007.

2 There can be economic growth just based on expectations in the financial/capital market, asset market and real estate without corresponding growth in the real economy. Over the last two decades such growth is witnessed everywhere particularly in USA .But since such growth are not driven by accumulation of factors of production in the production side of the real economy, they bust just like bubbles as the expectations melt down and the growth comes back to the normal growth trajectory of the real economy as is witnessed now in USA after 2008 .

3 FDI inflows are registered in RBI branch offices at Mum-

shows that both capital accumulation and access to public goods/services including poverty decline are critical for higher growth momentum in the real economy. Gujarat, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu are among the major states that exhibited highest growth rates as they have achieved remarkable progress in both capital accumulation and access as evident from higher FDI inflow and also higher poverty decline and HDI rank.

What explains poverty decline in India? Decline in poverty incidence and improvement of human development indicators are attributable to three major political movements in democratic India. The first movement is the bank nationalisation program in 1969. Bargess and Pande (2005) found that large state-led bank-branch expansion program following bank nationalisation was associated with poverty reduction in India. The second major political movement is empowerment of India's dalit and other socially backward population. Studying investments in rural infrastructure (for example, primary schools, piped water, and electricity connections) over 1970s and 1980s [4] and their access to different categories of population using data on public goods and social structure from parliamentary constituencies in rural India, Banerjee and Somanathan (2007) found evidence of considerable equalisation of access in accordance with national policies and political agendas of universal access to basic amenities and public facilities. The scheduled caste population who were better organised politically got higher access than the scheduled tribes who were not so well organised politically.

The third major political movement is common minimum program of the political alliance of the Congress parties with leftist parties, which led to National Rural Employment Guarantee Act, 2005. This Act guarantees at least 100 days wage employment in every financial year to every household in rural areas whose adults volunteer to do unskilled manual work. Two recent legislations, Right to Education Act, 2009 and the Women Reservation Bill, 2010, have laid the foundation for India's rapid socio-economic transformation in coming years. The former makes free and compulsory education a fundamental right for all children between the ages of 6 and 14 providing for 20% quota in private schools for the disadvantaged groups. The latter provides for reservation of 33% seats for women in Union and states legislature.

India's democratic political dynamics have been leading India to a growth dynamics that exhibit strong correlation between economic growth and poverty decline. This growth process has also generated win-win outcomes of investments in private as well as public firms in the organised sector, a supporting evidence of which comes from the firm level study of Alfaro and Chari (2009), which have raised expectation for higher private and public investments in the real economy. Favorable business climate is reflected in last year's survey of Japanese firms in India by JETRO which revealed that their revenue and profits came entirely from domestic market; they were in expansion mode; none of them required retrenching their workforce; and none was considering shifting their business to other countries.

The prospect of India's future growth is brighter with the growing pool of educated workforce, planned public-private investment of about US $500 billion in productive infrastructure such as power, highways, ports, airports, railways, and telecommunications by the end of the current plan period and the vastly improved business climate following the ongoing economic reforms program of Indian governments. Two recent examples of such program are the e-BIZ project and the Unique Identification Number Program (UNIP) launched by the government of India. The first mentioned initiative is on course to take India to a new height in e-governance of G2B services through an integrated on line portal for delivery of clearance, approval, and compliance related services of central, state and local governments, while the latter will improve governance, accountability and transparency as it will effectively monitor public funded programs including those targeted for the poor and vulnerable.

REFERENCES

Alfaro, Laura. & Chari, Anusha., 2009. India Transformed? Insights from the Firm Level 1985-2000. NBER Working Paper 15448

Banerjee, Abhijeet & Somanathan, Rohini.,2007.The political economy of public goods: Some Evidence from India *Journal of Development Economics* 82 (7) pp. 287-314.

Burgess, Robin.& Pande Rohini., 2005. Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment. *American Economic Review* 95(3) pp.780-795

Datt, Gaurav & Ravallion, Martin., 2002. Is India's Economic Growth Leaving the Poor Behind? *Journal of Economic Perspectives,*16(3) (Summer), pp. 89-108

Ray, Gautam, Lakshmanan, T.R. & Anderson, William P. 2001 Increasing Returns to Scale Inherent In Affluent Knowledge-Rich Economies: A Theoretical Inquiry *Growth and Change,*32(4), pp. 491-510.

bai, New Delhi, Bangalore, Ahmedabad, Chennai, Hyderabad, and Kolkata for the respective states.

4 Primary schools were available in 75% of all villages in 1991 as against 53% in 1971; electricity connections increased from 18% to 70%, and there was nine fold increase in access to piped water over these two decades .

Table : Poverty Decline and Growth

State	Population	SDP per capita	Poverty Decline during (1960-2000)	Annual Compounded Growth in the current decade (2000-2007)	Growth Rank (2000-2007)	Poverty Decline Rank (1960-2000)
	(Million)	(Rs.)	(%)	(%)		
Andhra Pradesh	76	35,864	2.38	15.1	2	3
Maharashtra	97	47,051	1.31	12.7	8	10
Gujarat	51	45,773	2.02	15.9	1	4
Tamil Nadu	62	40,757	1.92	13.1	6	6
Punjab &Haryana	45	51,712	2.96	13.2	5	2
Kerala	32	43,104	3.26	14.17	3	1
Karnataka	53	36,266	1.54	12.9	7	8
West Bengal	80	31,722	2.29	12.21	9	5
Orissa	37	23,403	1.55	14.17	4	7
Rajasthan	56	23,933	1.49	9.8	12	9
Assam	27	21,991	0.06	10.2	11	14
Bihar	110	11,135	0.32	11.5	10	13
Madhya Pradesh	81	18,051	0.8	6.5	14	12
Uttar Pradesh	175	16,060	1.11	8.7	13	11
ALL INDIA	1,027	33,283		12.73		

Sources:Economic Survey 2009-10;Datt and Ravallion(2002; and author's estimation of compound growth rate of Indian states between1999-2000 and 2006-07)

HAYABUSA: The first Space Odyssey to an "Asteroid"

- Dr. Pankajakshan Thadathil

The nail-biting seven-year journey of a Japanese spacecraft to an asteroid and back ended on 13 June 2010, captivating the public and possibly giving the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) a new lease on life. When its re-entry capsule floated into the Australian outback on 13 June 2010, the Hayabusa probe became the first spacecraft to land on a celestial body other than the Moon and return to Earth. The main goal of the mission was to bring back samples of surface materials from the asteroid "Itokawa", which orbits some 300 million km away from Earth. But the return of the capsule alone is expected to boost Japan's space business, and JAXA's deft handling of the many glitches that occurred during the voyage could help the agency fend off critics. The capsule separated from Hayabusa's main body at around 8 p.m. on 13 June 2010. The craft itself subsequently burned up in the atmosphere, sending streaks of fire across the sky. Meanwhile, the capsule sped through the atmosphere, opened its parachutes and drifted down into the Woomera desert in South Australia.

Hayabusa had traveled billions of kilometers, but the capsule still had a few more to go. Recovered in Woomera on 14 June 2010, it was flown to Tokyo International Airport at Haneda on June 17. It finally arrived at JAXA's Sagamihara Campus in Kanagawa Prefecture in the predawn hours of June 18. It could take as long as half a year to analyze its contents. Hayabusa, Japanese for "falcon", hitched a ride in May 2003 on an M-5 rocket from the Uchinoura Space Center in Kagoshima Prefecture. While orbiting Earth, it worked its way toward Itokawa, which follows a path crossing from outside the orbit of Mars to inside the orbit of Earth. The craft reached Itokawa in 2005. It made hard landings in order to kick up debris, which was to be captured in a 40 x 20cm container. But the probe failed to shoot a metallic projectile into the asteroid's surface as planned, which would have aided the collection of samples.

Scientists hope to find a combination of the minerals that make up Itokawa, or at least gases from the asteroid's surface.. Analysis of the debris could help to explain the origins of our solar system. It is thought that the Sun and planets formed some 4.6 billion years ago from an aggregation of gaseous materials in space. Since then, drastic changes on Earth have hidden the answers to many questions about its initial state. ***Asteroids, however, remain as they were when they were formed, so scientists are keen to learn from them what substances were widespread during the solar system's first days.*** Still, even if the capsule does not contain enough to unlock such secrets, all will not be lost. The Hayabusa mission was not solely about bringing back space dust - it was also conducted to test technologies for long-distance round-trip flights to other planets. This much we know for sure: Hayabusa traveled a heck of a long way. The craft clocked a total of some 6 billion km, about the same distance Earth travels in six trips around the Sun.

It's rough up there
Adventures of Hayabusa

- **May 2003:** Launched on M-5 rocket from Uchinoura Space center, Kagoshima Prefecture
- **May 2004:** Accelerated using Earth's gravity in swingby maneuver, set on course to Itokawa asteroid
- **November 2005:** Lands on Itokawa twice to collect samples
- **December 2005:** Fuel leak causes problems with attitude control; radio communications with Earth lost
- **January 2006:** Radio communications with Earth restored
- **April 2007:** Return trip to Earth begins
- **November 2009:** Problems with ion engines
- **April-June 2010:** Orbital adjustments conducted to direct spacecraft toward re-entry
- **June 13, 2010:** Lands in Australia

Source: The Nikkei

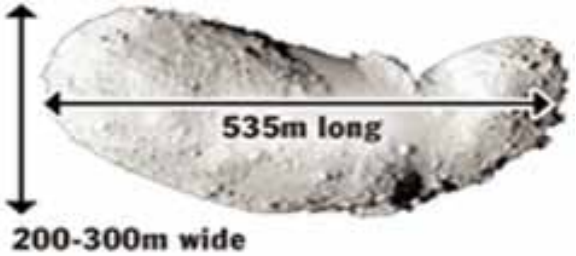

Asteroid Itokawa, photographed by Hayabusa spacecraft *(Courtesy of JAXA)*

Haiku *

- Purnima Ghosh

Sakura Blossoms

Sakura bana
Hito wa hana mite,
Tanoshi garu
Meaning: People are enjoying while viewing Sakura Blossoms..

The Hydrangea

Ame ga furu,
Niwa ni ajisai,
Me ni suzushi.
Meaning: It is raining. The hydrangea in the garden is a delight to the eyes.

Autumn Leaves

Toridori ni,
Momiji irozuku,
Kyo no maachi.
Meaning: Colorful maple leaves are on the streets in Kyoto.

Crawling Snails in the Rain

Ame ga furu.
Katatsumuri-tachi,
Yukuri hau
Meaning: Rain is falling. All the snails are crawling slowly.

Snowfall

Furu yuki ni,
Ocha ga karada wo
Atatameru.
Meaning : Snow is falling. Green tea warms the body.

*Haiku is one kind of traditional Japanese poems, consisting of only three short lines. The first, second, and third line contain five, seven, and five Japanese characters (syllables) respectively. In addition, Haiku always contains a word related to the seasons.

***Acknowledgement**: Mr. Miura Mitsunori, Language Teacher, for consultation*

The Shortcomings of a Zero Interest Rate Policy

- Sanjeev Gupta

Although there has been a steady trend of declining economic growth in Japan, it still maintains a gross domestic product (GDP) of about $4.8 trillion. In an attempt to rescue Japan's dwindling economy, the Japanese government has adopted a fairly radical approach by keeping its interest rate close to zero since the 1990's in order to advocate increased investment to boost GDP. This has subsequently led to a very low overnight call rate between banks. By maintaining a relatively high money stock of $4.3 trillion (as of 2009), the government has managed to keep the interest rates at near zero percent, as shown by the diagram below:

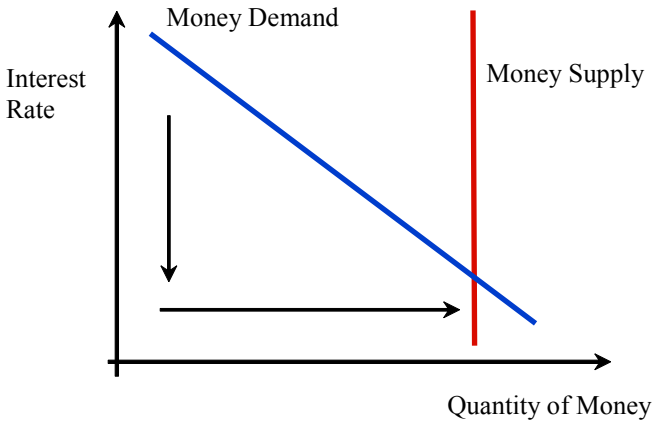

This approach, however, has been severely criticized by economists due to its inadequacy and the long-term problems it can cause. Japan is now suffering from the decisions the government made back in the 1990's. First of all, with the interest rate already practically zero, the government has been unable to use a valuable monetary tool for two decades that could have been used to stimulate the economy for short-term downturns. Besides that, the policy has also been unpopular due to its inability to actually solve the problem it was meant to, namely the global recession. In a normal cyclical slowdown, lowering interest rates encourages fresh business activity by reducing the cost of borrowing from banks. With more borrowing comes more investment, more jobs and more growth. But these are far from ordinary times. Japanese banks, already burdened with bad consumer and commercial debts, are desperate to clean up their balance sheets and avoid risk — they are not eager to take on more risk by issuing new loans against the backdrop of a deteriorating business climate. They are busy recapitalizing and paring down mountains of bad assets and have little interest in doling out more loans in a moribund economy. Japanese consumers, too, are trying to reduce household debt, so borrowing more money for a new car or to remodel the kitchen is not a high priority. And without greater consumer spending, most companies have little need for new loans to expand operations. Simply put, interest rate cuts don't matter in this environment. ❑

আমার প্রিয় জাপানী মহিলা-কবি মিসুজু কানেকো

ৎসুয়োশি নারা

আধুনিক জাপানী কবিদের মধ্যে মিসুজু কানেকোকে আমি সর্বোত্তম মহিলা কবি বলে মনে করি। জাপানী কাব্যরচনা শৈলী চার ভাগে বিভক্ত। যেমন –

১) তাংকা (৩১টি স্বরবর্ণ দ্বারা রচিত কাব্য)
২) হাইকু (১৭টি স্বরবর্ণের দ্বারা রচিত কাব্য)
৩) সেনরিউ (১৭টি স্বরবর্ণের দ্বারা রচিত কাব্য)
৪) সি (স্বরবর্ণের সংখ্যা ও অন্তে মিলের কোন নিয়ম নেই)

হাইকু ও সেনরিউ-এর মধ্যে ব্যবহৃত স্বরবর্ণের সংখ্যা এক হলেও, তাদের ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে পার্থক্য থাকে, অর্থাৎ হাইকুর মধ্যে কোন ঋতু বিশেষে নির্দ্দিষ্ট শব্দ একটি অন্ততঃ থাকা আবশ্যক। কিন্তু সেনরিউ-র মধ্যে তেমন শব্দ না থাকলেও চলে। তবে তার মধ্যে হাস্যরসাত্মক শব্দ থাকা উচিত।

আজকাল জাপানী সমাজে যাঁরা নিয়মিত ভাবে "হাইকু" রচনা করেন এবং দৈনিক সংবাদপত্রে ও মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তাঁদের সংখ্যা প্রায় পনের লক্ষ। যাঁরা "সেনরিউ" রচনা করতে ভালবাসেন, তাঁদের সংখ্যাও হাইকু ভক্তবৃন্দের চেয়ে সামান্য কম হলেও প্রচুর বলেই বলা যায়। তাদের তুলনায় "তাংকা" সাধকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও পাঁচ লক্ষের মত।

কিন্তু যাঁরা "সি" রচনা করেন, তাঁদের সংখ্যা এঁদের তুলনায় খুবই কম। তা সত্ত্বেও "সি" রচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবি বেশ কয়েক জন আছেন। মিসুজু কানেকো ঐ বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবিদের মধ্যে একজন, এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রিয় মহিলা কবি।

মিসুজু কানেকো-র আসল নাম তেরু কানেকো। ১৯০৩ সালে সেনজাকি মুরা, ওৎসু গুন, য়ামাগুচি কেনে (বর্তমানে নাগাতো শহরে) জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর, বইয়ের দোকানে কাজ করতে করতে কবিতা রচনা শুরু করেন। রচনা করার এক মাস পরে সেই কবিতাগুলি "মিসুজু কানেকো" এই ছদ্মনামে তোওকিয়োস্থ চার জন প্রকাশকের কাছে পাঠান। তাঁর প্রেরিত সবকটি কবিতাই প্রকাশকদের প্রশংসা লাভ করে, এবং তাঁদের মাসিক পত্রিকায় সেগুলো প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। ঐ সময়ে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতাটি দিলাম –

সমুদ্রে মাছের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়
ধান হলে মানুষে তার চাষ করে
গরু হলে পশুচারণভূমিতে তৃণভক্ষণ করানো হয়
রুই মাছ হলে পুষ্করিণীতে গমের রুটি পায়।
কিন্তু সমুদ্রের মাছ হলে –
কারো কাছ থেকে কোনো যত্ন পায় না
কিন্তু সে কারোর কোনো ক্ষতি করে না
তবু এমন ভাবে আমার দ্বারা ভক্ষিত হয় সে
তাই সমুদ্রের মাছের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়।।

"ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ধরা।"

গোলাপ-রাঙা ভোরে
প্রচুর মাছ ধরা হল,
সার্ডিন মাছ ধরা হল।
সমুদ্র তীরে দেখা যায়
মানুষের আনন্দময় উৎসব
কিন্তু সমুদ্রের গভীরে
হাজার হাজার সার্ডিন মাছ
শবানুগমন হচ্ছে ।। (অনুশোচনা)
(১৯২৬ সালে লেখা মিসুজু কানেকোর কবিতা)

১৯২৬ সালে মাত্র তেইশ বছর বয়সে মিসুজু কানেকো "সঙ্গীত রচনার যুব কবি সঙ্ঘ"-এর সদস্য হওয়ার অনুমতি পান। এত অল্প বয়সে এমন সুপ্রতিষ্ঠিত কবি সঙ্ঘের সদস্য হতে পারার প্রধান কারণ সম্ভবত ইয়াসো সেইজোও নামক ঐ সময়কার এক বিখ্যাত কবি কানেকোর কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করে সদস্য হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করতে সুপারিশ করেন। দ্বিতীয়ত, অন্যদের তুলনায় তাঁর কবিতা ছোট এবং সরল ভাষায় রচিত বলে সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও সেগুলো খুব জনপ্রিয় ছিল।

মিসুজু কানেকোর লেখা কবিতার আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক্ –

"আমি, ছোট পাখি আর ছোট্ট ঘন্টা"

আমি, নিজের দুই বাহু যতই প্রসারিত করি না কেন
তবু, কোন মতেই আকাশে উড়তে পারব না।
তবে, আকাশে ওড়া ছোট পাখি আমার মত

তাড়াতাড়ি মাঠে ছুটতে পারবে না।
যতই আমি নিজের শরীর সজোরে কাঁপাই না কেন
তবু ছোট্ট ঘন্টার মত সুন্দর শব্দতরঙ্গ তুলতে পারব না।।

মিসুজু কানেকো প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ ছাত্রী ছিলেন বলে সর্বদাই শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে প্রশংসা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন। সকলের সাথে সুন্দর ব্যবহার এবং সর্বদা হাসিমুখে অভিবাদন জানানো ছিল তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। এভাবেই তিনি তাঁর মনের গভীর দুঃখ ও একাকীত্বকে লুকিয়ে রাখতেন।

তিন বছর বয়সে মিসুজু কানেকো বাবাকে হারান। তাঁর বয়স যখন ষোল বছর, সে সময় তাঁর মা এক মৃতদারকে বিবাহ করেন। সৎ বাবার একটি বিরাট বইয়ের দোকান ছিল। সেই দোকানের কাজে তিনি বাবাকে সাহায্য করতে শুরু করেন। তেইশ বছর বয়সে মিসুজু কানেকো সৎ বাবার ইচ্ছানুযায়ী ঐ দোকানেরই মিয়ামোতো নামের এক কর্মচারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মিয়ামোতো স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করতেন না। সেই কারণে বাবা জামাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে কন্যার সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য তৎপর হন। মিসুজু কানেকোরও সেই ইচ্ছাই ছিল , কিন্তু ইতিমধ্যে সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়ায় ঐ চিন্তা তিনি পরিত্যাগ করেন। ১৯২৭ সালে তাঁর একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। স্বামীর দুর্ব্যবহার কিন্তু তারপরেও অব্যাহত থাকে। এমনকি তিনি কানেকো-কে কবিতা রচনায় বাধা দিতেও দ্বিধা করেন নি। শেষ পর্যন্ত স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ১৯৩০ সালের ১০ই মার্চ বেলা ১টা নাগাদ বিষপান করে আত্মহত্যা করেন তিনি। ঐ সময় তাঁর নাম ছিল তেরু মিয়ামোতো (বিবাহোত্তর নাম)।

জীবতকালে মাত্র ছয় বছরের মধ্যে মিসুজু কানেকো পাঁচশোরও অধিক ছোট কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে এমন কয়েকটি কবিতা আছে যা ছোট ছেলেমেয়েরা গানের সুর দিয়ে এখনো গায়। তাঁর আরও দুটি কবিতা দিয়ে আমার লেখা শেষ করছি।

"গুপ্ত রহস্য"

আমার অত্যন্ত রহস্য জাগে
কালো মেঘ থেকে ঝরা বৃষ্টি
কেন রুপোলী রঙে চক্‌চক্ করে।
আমার অত্যন্ত রহস্য জাগে
তুঁতগাছ থেকে সবুজ-রঙা পাতা খাওয়া রেশমগুটি
কেন সাদা রঙে বদলে যায়।

আমার অত্যন্ত রহস্য জাগে
কারো হাতের ছোঁয়া না লাগা সাদা ফুলগুলি
হঠাৎ করে কেন ফুটে ওঠে।

আমার অত্যন্ত রহস্য জাগে
যাকেই প্রশ্ন করি না কেন
সকলেই কেন হেসে বলে "এ অতি স্বাভাবিক" !

"মৌমাছি ও ঈশ্বর"

ফুলের ভিতরে আছে একটি মৌমাছি
সেই ফুলটি আছে একটি বাগানের ভিতরে
সেই বাগানটি আছে একটি বেড়ার ভিতরে
সেই বেড়াটি আছে একটি শহরের ভিতরে
সেই শহরটি আছে জাপান দেশের ভিতরে
জাপান দেশটি আছে পৃথিবীর ভিতরে
পৃথিবী আছ ঈশ্বরের অন্তরে
এবং, ঈশ্বর আছেন সেই ছোট্ট মৌমাছির ভিতরে।।

ক্ষুদ্‌দা ও কোলকাতার পুজো

- অনুপম গুপ্ত

গতবারে, মানে ২০০৯ সালে ক্ষুদ্‌দাদের আর জাপানে যাওয়া হল না। বৌদির কিন্তু মন খারাপ পুজোর সময়ে জাপানে না গিয়ে কোলকাতায় থাকার জন্য। বেশী দিন জাপান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে "আরিগাতোও গোযাইমাস্, গোমেন্নাসাই, কোম্‌বানওয়া" কথাগুলো ভুলেই যাবেন। পুজোর দিনে দুপুরের lunch-এ ব্যোমকেশদার রান্না খিচুরির স্বাদটাই তো fade out করে যাবে।

গড়িয়াহাটের দোকানগুলো দেখে রমলা বৌদি বলেন, "আমাদের Lazonaর দোকানগুলো কত্ত ভাল।" ক্ষুদ্‌দা মিন্‌মিন করে বলেন, "Lazona-র দোকানগুলো আবার আমাদের হল কবে থেকে ? Maruzen-এর বইয়ের দোকান আর কলেজ স্ট্রীটের বই-এর দোকান কি এক হল ?" অবশ্য রমলা বৌদি কি Maruzen-এ ঢুকেছিলেন ? ওখানে তো food counter বলে কিছু নেই, শুধু বই। বৌদির সঙ্গে বই-এর খুব একটা ভাল সম্পর্ক আজ পর্যন্ত তৈরী হল না। যারা বই লেখে তারা টাকা পায়, যারা বই বিক্রি করে তারাও টাকা পায়। মাঝখান থেকে এই বই কিনতে গিয়ে ক্ষুদ্‌দার টাকা খরচ হয়ে যায়, যার কোন সঠিক কারণ বৌদির মাথায় ঢোকে না।

সম্প্রতি রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ। ফলে পেঁয়াজের আকাল, মূল্য আকাশ-ছোঁয়া। বৌদির তাৎক্ষণিক ক্ষোভ উদ্‌গীরণ, "নাসিক থেকে পেঁয়াজ না আসতে পারে, কিন্তু নাগাসাকি থেকে তো আসতে পারে। নাসিকের পাশেই তো নাগাসাকি নামের মিল দেখলেই তো বোঝা যায়।" দাদা স্বগতোক্তি করলেন, "ভূগোলে যে গোল, বিয়ের আগে জানলে কি হত বলা যায় না।" এই তো গতবারে জাপানে থাকাকালীন তর্পণ করার সময় বৌদির বিস্ময় গঙ্গা এত বিশাল এবং পবিত্র নদী, অথচ জাপানে নাকি তার কোন শাখা নদী নেই।

কয়েক বছর পর পুজোর সময় কোলকাতায় আছেন বলে ক্ষুদ্‌দা রমলা বৌদিকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেড়িয়েছেন। বাবুবাগানের প্যান্ডেল সাঁওতাল বিদ্রোহের বীর সংগ্রামী "তিতুমিরের" বাঁশের কেল্লার আদলে তৈরি। দাদা বৌদিকে তিতুমিরের সংগ্রামের কথা বোঝাচ্ছিলেন। বৌদির প্রশ্ন, তিতুমির কি আমির (মানে আমির খান), মির কাশিম, মির-জা-ফরদের জ্ঞাতি ভাই ? মা সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে দাদা বললেন, "একটা প্রবাদ সকলেই জানে -- ইতিহাসে পাতিহাঁস, ভূগোলেতে গোল, কিন্তু পরের লাইনটা কেউ জানে না, রমলাকে নিয়ে আমি হচ্ছি পাগল।"

যোধপুর পার্কের পুজোর প্যান্ডেল বানানো হয়েছে রাজস্থানের "দিলওয়ারা টেম্পল"-এর অনুকরণে। ফল দর্শনার্থীদের ঠাকুর দেখতে হচ্ছে অনেক দূর থেকে। দাদা বললেন, "বেচারা কার্তিক ! অত দূর থেকে কি সুন্দরীদের ভালো করে দেখা যায় ?" বৌদির বক্তব্য কার্তিকের সমস্যা কার্তিকের মা বুঝবে, ক্ষুদ্‌দার মাথা না ঘামালেও চলবে। কিন্তু উনি যেন এই বয়সে বেশি "মেয়েছেলে" না দেখেন। পোশাকের যা ছিরি ! আর দর্জিদেরও বলিহারি, আর একটু বেশি কাপড় দিয়ে কি ব্লাউজ বানানো যায় না ? এতই যদি গরম লাগে, হাতপাখা নিয়ে ঠাকুর দেখলেই তো পারে !"

কলেজ স্কোয়ারের ঠাকুরের প্যান্ডেল রাজস্থানের "হাওয়া মহল" প্রাসাদকে নকল করে। বৌদির মনে হল যদি ঐ প্রাসাদের রানী হওয়া যেত, তাহলে বৌদিকে আর কোন কাজ করতে হত না, কত দাস-দাসী থাকত। দাদাকেও তো তাহলে মহারাণা হতে হত। অনেক দাস-দাসী যেমন থাকত, তেমনি অনেক সুন্দরী সুন্দরী রানী-ও থাকত। বৌদি তা মেনে নিতে পারবেন তো ?

কসবার বোসপুকুরের প্রতিমা আখের ছিবড়ে দিয়ে বানানো হয়েছে, কয়েক কুইন্টাল আখ থেকে ছিবড়ে নেওয়া হয়েছে। আহারে ! আখের রস কারা খেল কে জানে ! তবে কোলকাতার আশপাশে আর আখ নেই, এখন যেন কারোর জন্‌ডিস্ না হয়। বৌদির প্রশ্ন, কৈলাশে কি আখ চাষ হয় ? ওখানকার বাসিন্দা, মানে ঠাকুরদেবতাদের কি জন্‌ডিস্ হয় না ? যাক্ -- ওটা নিয়ে বৌদির মাথা না ঘামালেও চলবে। ওখানকার স্বাস্থ্য দপ্তর চিন্তা করবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের দেবতার নাম বৌদির জানা নেই। তাতে অবশ্য সমস্যা হওয়ার কথা নয়, কারণ আমাদের এখানেও কোন দপ্তরের মন্ত্রী যদি না থাকে তাহলে তো মুখ্যমন্ত্রীই দেখেন। ওখানেও হয়তো দেবী দুর্গাই দেখেন।

এখানে দুর্গা পুজোর সময় egg roll বা ফুচ্‌কার stall দেখে বৌদি খুব আনন্দিত। জাপানে কোন egg roll, ফুচ্‌কা, ঝালমুড়ির stall বৌদি দেখতে পান নি। এখানে রাজনৈতিক দলগুলির বই-এর stall দেখে দাদা ভাবেন এরা ঠাকুর মানে না, কিন্তু দুর্গাপুজার প্যান্ডেলের পাশে বই-এর stall বানিয়ে বই বিক্রি করার নামে আড্ডা দিতে এবং সুন্দরীদের দেখতে ভালই বাসেন। কার্তিক যেমন যুদ্ধ করার ভান করছেন, অথচ সুন্দরী মহিলাদের দেখতেই ব্যস্ত।

দশমীর বিসর্জনের দিনেও কি শান্তি আছে ? বাড়ির ঠাকুরগুলি ভাসান দেওয়া হয় অন্ধকার হওয়ার আগে। কিন্তু বারোয়ারি

পুজোর ঠাকুর তো আর দিনের আলো থাকতে বিসর্জন দেওয়া যায় না। আলো দিয়ে সাজিয়ে, কাপালিকদের মত কপালে সিঁদুর লাগিয়ে পেটে সিদ্ধির সরবতের বদলে রঙ্গীন তরল পদার্থ নিয়ে উদ্দাম নৃত্য করতে করতে ঠাকুর ভাসান দেওয়ার রীতি। ক্ষুদ্‌দার যৌবনকালের সেইসব উজ্জ্বল দিনগুলির কথা মনে পড়ে গিয়ে পা ও কোমর ঢাকের তালে তালে একটু যে দুলে ওঠে না তা নয়। তবে বৌদি বলে দিয়েছেন যে পরের দিন অর্থপেডিক সার্জেনের কাছে নিয়ে যেতে পারবেন না। আর দাদা এটা বুঝতে পারেন না ডাক্তারদের ঠিক এই সময়ে গোয়া, সিমলায় যাওয়ার কি আছে। তবে বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসানে যাবার পারমিশান নাকি আছে। যদিও ক্ষুদ্‌দা বলেন তার থেকে বাড়িতে বসে নিম-বেগুন খেতে খেতে উনিশের নামতা মুখস্ত করা অনেক ভাল।

ভাসানের পর্বটাও কিরকম গোলমেলে যেন। Tokyo-র মা দুর্গার ভাসান হয় packing box-এর মধ্যে। বৌদি অবশ্য কিছুতেই বুঝতে পারেন না মা দুর্গা packing box থেকে সপরিবার কৈলাশে যান কি করে ? আর যারাই বাক্স থেকে বেরিয়ে কৈলাশে যান না কেন, গণেশ আর লক্ষ্মী যে জাপানে আটকে আছেন সেটা Sony, Nikon, Asahi, Nomura, Toshiba, J.P. Morgan ইত্যাদি কোম্পানীগুলির বাড়বাড়ন্ত দেখলেই বোঝা যায়। তবে আজকাল আরেকটা রেওয়াজ চালু হয়েছে - গাছের নীচে প্রতিমা রেখে দেওয়া। দাদা বলেন, এটা অত্যন্ত অন্যায়, সারারাত প্রতিমারা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোদ, ঝড়, জল, হিমে কষ্ট পাবে আর আমাদের অর্থনীতি, ভারতীয় মুদ্রা strong হবে, sensex বাড়বে, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় swimming costume পরে Pacific-এর তীরে সপরিবার (মাঝে মাঝে বান্ধবী) নিশ্চিন্তে cold beer সহযোগে ছুটি কাটাবেন -- এটা তো হয় না। সেইজন্যই তো মা সরস্বতীর কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা বিলেত -আমেরিকায় যাচ্ছে Ph.D করতে। তবে বৌদির রাগ অন্য জায়গায়। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা ঠাকুরদের প্রথমেই মাথার চুল খসতে থাকে, পরে মুকুট। শেষে সাঙ্ঘাতিক দৃশ্য !

দুর্গাপুজো শেষ হল। এবারে বিজয়া করতে বৌদিকে তার বাপের বাড়িতে যেতে হবে। এখানকার local train-এ আর যেতে ইচ্ছে করে না। বৌদির ইচ্ছা এখানে যদি জাপানের মত shinkansen train চালু হত। দাদা বলেন, "রেলমন্ত্রী তো তোমাদের পরিচিত, তাঁকে বললেই তো হয়। তবে তার আগে shinkansen train কথাটার বানান ও উচ্চারণ ঠিক করে নিও। একটু লিখে দিতে বললে চশমা আনি নি বলে কি পার পাবে ? তোমার সঙ্গে একটু কথা বললেই মনে হবে সরস্বতী পুজোর সময়ে তোমার মা তোমার হাতে খড়ি ঠিক মতন দিয়ে উঠতে পারেন নি।"

দুর্গাপুজোর পুরো পর্বটাই আপাততঃ শেষ হয়ে গেল। শেয়ালদা স্টেশনে ঢাকিদের বাড়ি ফেরার মিছিল। ক্ষুদ্‌দার মনটাও চলে গেল কোন সুদূরে। পাড়ার পুজোর প্যান্ডেল বাঁধা হচ্ছে। ক্ষুদিরাম প্যান্ডেলের কাজ তদারকি করছে। কিন্তু প্যান্ডেলের দিকে যত না নজর, তার থেকে বেশী নজর নির্দ্দিষ্ট একটা বাড়ির জানালার দিকে। ষোড়শীর মোহময়ী মিষ্টি দর্শন ক্ষুদিরামের কর্মপ্রেরণা। প্রসাদ বিতরণের নামে উষ্ণ স্পর্শের জন্য ৩৬৫ দিনের অপেক্ষা। ধুনুচি নৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাওয়ার পরে ক্ষুদিরামের কি মনে হয় নি পুরস্কার প্রাপ্যের প্রেরণাদায়ীকে একটু ধন্যবাদ জানাতে ? বিসর্জনের পরে সেই জানালা বন্ধ। অতএব এখানে থাকার থেকে কলেজ হোস্টেলে থাকাই ভাল। বাবা হয়তো ভাবলেন পুজো শেষ হয়ে গেল বলে ছেলের মন খারাপ, অথবা কলেজের আসন্ন পরীক্ষার জন্য সুবোধ পুত্র চিন্তিত। এর থেকে বেশী না ভাবাই ভাল। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। রমলা বৌদি বললেন, "কি গো! কি এত চিন্তা করছিলে ? ঢাকিরা তো তোমাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে।" এক ধাক্কায় দাদা রোমান্টিক অতীত থেকে নিরস বাস্তব বর্তমানে চলে এলেন। দাদা ভাবলেন, বাংলার কিশোর-কিশোরীরা কত ভাগ্যবান। জাপানের ছেলেমেয়েরা কাব্যিক প্রেমের উষ্ণ রোমান্স থেকে হয়তো বঞ্চিত। দুর্গোৎসবের রূপ, রস, আমেজের কথা ভাবলে আজও ক্ষুদ্‌দা পুলকিত। ❑

আটলান্টিক শহরে বঙ্গ-সম্মেলন

- শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

২০০৯-এর জুলাই মাস । দিনটা ছিল যতদূর মনে পড়ে মঙ্গলবার । রাত তখন প্রায় ২টো । ফোনটা ঝন্‌ঝনিয়ে বেজে ওঠে । প্রায় লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এসে ছোঁ মেরে রিসিভারটা কানে দি । মাকে অকালে হারাবার পর, সারাক্ষণই বাবুর জন্য মনটা ছট্‌ফট করতে থাকে । এত রাতের ফোনে দর্ দর্ করে ঘামতে থাকি ।

-- হ্যালো, শুভা কথা বলছেন ?

-- বলছি ।

-- আমি নিউজার্সি থেকে কল্লোলের সম্পাদক কথা বলছি ।

উফ্ , স্বস্তি পাই, কোলকাতার ফোন নয় ।

-- হ্যাঁ বলুন, অনেক দিন পর । কেমন আছেন ?

-- এখানে সব ঠিকঠাক । আশাকরি আপনারাও সবাই ভাল ওখানে ।

আমার ঈষৎ ভারী গলাটা শুনে কিছু বুঝলেন হয়তো ।

-- এখন আপনার ওখানে কটা বাজে ?

-- রাত ২টো ।

-- ইস্ আমি সময়টাকে ঠিকভাবে ক্যালকুলেট করতে পারিনি । ভেরি স্যরি ।

-- না না ঠিক আছে ।

-- আসলে একটা জরুরি দরকারে ফোন করছি ।

-- বলুন ।

-- ২০১০-এ নিউজার্সিতে বঙ্গসম্মেলন হচ্ছে । আর কল্লোল তার উদ্যোক্তা । আমরা আপনার ট্রুপকে আমাদের মধ্যে পেতে চাই আগামীবছর ।

ওনার সাথে আমার আলাপ ২০০৭-এ । ২৭তম বঙ্গসম্মেলনে , ডেট্রয়েটে । NABC বা North American Bengali Conference-এর ২৭ বছরের ইতিহাসে ভারত ছাড়া বিদেশ থেকে আমরা অর্থাৎ বিদেশী একটা গ্রুপ অংশ নিয়েছিল প্রথম সেবার । দুটো শো করে প্রায় ছয় হাজার দর্শকের অসংখ্য ভালবাসা আর প্রশংসা (এটা বলতে লজ্জা করছে যদিও) কুড়িয়ে ফিরে এসেছিলাম আমরা । তারপর থেকেই এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ই-মেলে শুভেচ্ছা বিনিময় চলে নববর্ষ, শারদীয়া, বিজয়া ইত্যাদি বিভিন্ন উপলক্ষে ।

-- আগামী বছর ৩০তম বঙ্গসম্মেলন হবে নিউজার্সির আটলান্টিক শহরে । জুলাইয়ের ৯, ১০, ১১ -- এই তিন দিনের মধ্যে আপনাদের অনুষ্ঠান থাকবে দু দিন । আপনি মিনিমাম কতজন মেম্বার নিয়ে বিদেশে ট্র্যাভেল করেন ?

-- আপনার আমন্ত্রণে ভীষণ খুশী লাগছে । আপনারা কি ধরণের অনুষ্ঠান চাইছেন, তার ওপর নির্ভর করবে আমি কতজনের ট্রুপ নিয়ে যাব ।

-- আমাদের তিন দিনের মধ্যে দ্বিতীয় দিন আপনাদের একটা শো থাকবে । আর আমাদের খুব ইচ্ছে শেষদিন ক্লোজিং সেরিমোনিটা যদি আপনারা করেন ।

-- ঠিক আছে, আমাকে একটু সময় দিন, আমি দু/তিন দিনের মধ্যেই আপনাকে জানাচ্ছি ।

পরস্পরের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ফোনালাপ শেষ হয় সেই রাতে ।

পরদিন প্রথম ফোন করি কোলকাতায় বাবুকে । জানাই সব কথা । খুব খুশি হন বাবু । উৎসাহ দেন । চট্‌জলদি একটা মিটিং ডাকি । আলোচনা করে ঠিক হয় ১১ জনের টিম অংশ নেব বঙ্গ সম্মেলনে । নতুন মিউজিকে নতুন কম্পোজিশন শুরু করি । রিহার্সাল শুরু হয় ।

২০০৯-এর আগষ্ট থেকে ক্লাস ছাড়াও প্রতি শনি কিম্বা রবিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা অবধি চলে রিহার্সাল, এবং সবাইকে জানাই যে সামনের বছর থেকে শনি অথবা রবি নয়, প্রতি সপ্তাহের শনি এবং রবি কোরেই কম্বাইন্ড রিহার্সাল থাকবে । মেয়েগুলো অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝতে পারে । তাই তাদের কাছ থেকে কোনও অসম্মতির উত্তর আসেনা আমার কানে ।

এবার আমার ফোন করার পালা ।

-- হ্যালো, শুভা কথা বলছি ।

-- হ্যাঁ বলুন, কি ঠিক করলেন ?

-- আমরা ১১ জনের টিম যাব ।

-- খুব খুশি হলাম শুভা । এয়ার-টিকিট ইত্যাদির কি খরচ পড়বে জানাবেন । তাড়া নেই, জানিয়ে রাখলাম ।

প্রবাসীদের মনের কথা বুঝতে পারি আমি, হয়তো নিজেও বহু বছর দেশ ছাড়া বলেই । নিজের দেশ নিয়ে সেন্টিমেন্ট, নস্টালজিয়া একটু বেশীই আছে আমার । সেসব মাথায় রেখেই নতুন নতুন ভাবনাকে অবলম্বন কোরে নাচ তৈরি হতে থাকে । তবে জাপানিস গ্রুপ যাচ্ছে, জাপানী নাচ থাকবে না ? সেটাও মাথায় রাখতে হয় । ওকিনাওয়া আর হোক্কাইডোর দুটো সুর-কে নিয়ে উদয়শংকর নৃত্যঘরানায় নাচ তৈরি হয় ।

কাজ চলতে থাকে হু হু করে । প্রতিদিন ফোনের মাধ্যমে বাবুকে বিবৃতি দিয়ে যাই । বাবু চাকরীর সঙ্গে সঙ্গেই "নাট্যলোক" নামের এক নাটকের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহু বছর । তাই বাবুর কাছে অনেক উপদেশও পাই আমি । মমদিকেও (মমতাশংকর) দেখেছি নতুন কোন প্রোডাক্‌শন স্টেজে উপস্থাপিত হলেই বাবুকে আমন্ত্রণ জানাতেন । অনুষ্ঠান দেখে ভালো-খারাপ একটা কাগজে লিখে মমদিকে জানাতেন বাবু ।

কোলকাতায় যাব যাব করেও সময় করে উঠতে পারি না । ছট্‌ফট্ করতে থাকি । বাবু ওপাশ থেকে সান্ত্বনা দেন, এত বড় একটা কাজে হাত দিয়েছ, দৌড়োদৌড়ি কোরে কোলকাতায় এক্ষুনি আসতে হবে না । হেসে বলেন, এই তো স্কাইপে আমিও তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, আর তুমিও আমাকে । কোন তাড়া নেই । আমি ঠিক আছি । বয়েস হচ্ছে, শরীরে একটু-আধটু অসুবিধে তো থাকবেই । এমন কিছু চিন্তার নেই । আবার কিছুটা আশ্বস্ত হই আমি ।

এইভাবেই দিন কাটতে থাকে ।

এই বছরের প্রথমেই আবার এক দম্‌কা ঝড় ওঠে । বাবু-ও আমাদের ছেড়ে চলে যান মায়ের কাছে । বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে আসি এদেশে ।

বঙ্গ সম্মেলনের ব্যস্ততা বাঁচিয়ে রাখে আমাকে । মনকে

বোঝাই, বাবু জেনে গেছেন আমি ট্রুপ নিয়ে যাচ্ছি এবার। অনুষ্ঠান ভাল করতেই হবে। মা-বাবু ঠিক আমার সঙ্গে আমার পাশে পাশেই আছেন সবসময়।

আমাদের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের নাম নৃত্যাঞ্জলি। এতে থাকবে বিভিন্ন স্বাদের ছয়টা নাচ। তার মধ্যে দুটোর কথা আগেই বলেছি। সবগুলোর কথা বলতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে এই লেখা। এখানে আরেকটা কথাও জানিয়ে রাখি। বঙ্গ সম্মেলন বাঙালীর সম্মেলন। তাই এখানে নাচের আগে যে announcement থাকবে, সেটাও বাংলাতে। জাপানে অনুষ্ঠান করতে জাপানী স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করি জাপানী দর্শকের জন্য। কখনও ইন্টারন্যাশন্যাল কোনও অনুষ্ঠানে জাপানী ভাষার সঙ্গে ইংরেজীটাও যুক্ত হয়। কিন্তু এবারে তো বাংলা। বাংলা ভাষায় বক্ বক্ করতে দিলে আমাকে নাকি কেউ হারাতে পারবে না, আমার বাবু-মা সবসময় বলতেন। কিন্তু এতো তা নয়। স্টেজ অন্ধকার -- ব্যাক স্টেজ থেকে দর্শকদের কানে ভেসে আসবে annoncement, উৎসাহিত করবে তাদের, আগ্রহ বাড়তে থাকবে কেমন সেই নাচ। আর আমরা তার মধ্যে স্টেজে stand by হবো।

ক্লাস, রিহার্সাল, সংসার -- সব কিছুর পাশাপাশি চলতে থাকে সব থেকে কঠিন কাজ -- announcementএর জন্য স্ক্রিপ্ট লেখা।

দেখতে দেখতে যাবার দিনটাও এসে যায়। পৌঁছে যাই নিউইয়োর্ক এয়ারপোর্টে। বাসে ৩ ঘন্টার পথ পেরিয়ে আটলান্টিক শহরে। সব গুণীজনেরা এক হোটেলে। একসঙ্গে সকাল, দুপুর, রাতে খাওয়া-দাওয়া। টেবিলে টেবিলে আড্ডা-গল্প। আমার জন্য এই সময়গুলো ভীষণ মূল্যবান। কখনও ইন্দ্রানীদির (ইন্দ্রানী সেন) সঙ্গে গল্প করছি, আবার কখনও মনোময়। বিক্রম ঘোষের সঙ্গে আগেই আলাপ আছে। ওনার কিছু সুরে আমাদের কিছু নতুন নাচও আছে এবার। এক সময় ছুটে এলেন এক মহিলা, "আপনিই শুভা ? ওয়েবসাইটে আপনাকে দেখেছি।" ওনার সঙ্গে ওদিকের টেবিলে যেতেই ঝট্ কোরে উঠে দাঁড়ায় ছোট্ট অন্বেষা। "সা-রে-গা-মা-পা"র অন্বেষা। ইনি অন্বেষার মা। আমি একটু অস্বস্তিতে পড়ি, আহা উঠে দাঁড়ালে কেন ? বসে কথা বলো। কিছুতেই বসলো না সেই মেয়ে। ভাবলাম ছোটবেলা থেকেই বাবা-মার ট্রেনিং চলছে। প্রাণবন্ত ছেলে অনীক ধর। ওর এক বৌদি আবার আমার ছাত্রী ছিল কোলকাতায়। নিজে থেকেই আলাপ করে "তুমি কি জয়ীতাকে চেনো ? ও আমার বৌদি হয়।" বাউল জগতর উৎপল ফকির আর সহজ মা। গল্পে-গল্পে বেরিয়ে যায় কোলকাতায় আমরা একই পাড়ায় থাকি। অন্যদিকে সাহিত্যিক সুনীল গাঙ্গুলী, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নবকুমার বসু (উনি সম্পর্কে আমার পিসামশাই হন।)

পঙ্কজ সাহাকে মনে আছে ? কোলকাতা দূরদর্শনের প্রাক্তন পরিচালক পঙ্কজ সাহা ! ছোটবেলায় ওনাকে টিভিতে অনেক দেখেছি, ওনার পাঠ শুনেছি। আমি জাপান থেকে ট্রুপ নিয়ে এসেছি শুনে আজুমা সেন্‌সেইয়ের খোঁজখবর নিলেন। আর এই বঙ্গ সম্মেলনে যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হওয়ার পর থেকে যিনি আমাকে বিভিন্ন ব্যাপারে (মিউজিক, আলো, স্টেজ) সাহায্য করছেন, তিনি অভিনেতা চন্দন সেন। নাম আগেই জানতাম, রূপালী পর্দাতেও দেখেছি। কিন্তু সরাসরি আলাপ হয় ২০০৭-এ, ডেট্রয়েটে। এত বড় সব গুণীজনের মাঝে নিজে থাকতে পেরে ভাগ্যকে অস্বীকার করতে পারি না। ৯ তারিখ সন্ধ্যে ৬টায় শঙ্খধ্বনি আর ভারত-বাংলাদেশ-আমেরিকা-কানাডার জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে সূচনা হয় বঙ্গসম্মেলনের -- প্রায় সাত হাজার দর্শকের সমাগমে।

১০ তারিখ আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান। আমাদের আগে ইন্দ্রানী সেন। পর পর পাঁচটা নাচ হয়ে গেল। শেষ নিবেদনের জন্য তৈরি হতে থাকি।

"আজও এই একবিংশ শতকেও পৃথিবীর আনাচে-কানাচে চলে খুনোখুনি, রক্তারক্তি। হিরোশিমা-নাগাসাকি আজও তৈরি হয় দেশে দেশে। মানুষ নামের মুখোশের নীচে থাকে হিংস্র পিশাচের চাউনি। শিকার হয় অসহায় শিশু। এই শিশুরাই বড় হয়ে কেউ নাম লেখায় টেরোরিস্টের দলে। ধর্মের লড়াই, জাতির লড়াই, ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই। কেউবা নেশার কবলে পড়ে প্রাণ হারায় অকালে। মায়ের কোল শূন্য হয়। মা যশোদা বলেন, "কৃষ্ণানি বেগানে বারো।" অর্থাৎ বাছা কৃষ্ণ, ফিরে আয় বাবা। ধর্মের পার্থক্যে কেউ বলে হে রাম, কেউ বলে হে খ্রীষ্ট, কেউ বলে হে আল্লা, তুমি যে-ই হও, আমাদের উদ্ধার করো, আমরা তোমার সন্তান -- একমাত্র তোমার ওপরেই আমাদের অগাধ বিশ্বাস। এই পৃথিবীকে সুস্থ-সুন্দর করতে পথ দেখাও আমাদের। আমাদের শেষ নিবেদন The Child ."

ঋতুপর্ণার গলায় যেন যাদু আছে। স্পষ্ট উচ্চারণ, দর্শকরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন শেষ নিবেদন দেখার জন্য। Colonial Cousinsএর একটা গান বেছে নিয়েছিলাম এই নাচটার জন্য। ছয় মিনিটের এই নিবেদন স্টেজের ওপরেই শেষ হয়। আলো ফেইড-আউট হয়। হাততালির সঙ্গে সঙ্গে কানে আসে Bravo, Wonderful, দারুণ ইত্যাদি ছোট ছোট কিছু শব্দ। গলাটা ধরে আসে।

চোখভর্তি জল নিয়ে অনেক দর্শক দেখা কোরে যান গ্রীনরুমে এসে। জড়িয়ে ধরেন আমাকে। এই সব মুহূর্তগুলোতে কেমন কোনও কথার দরকার হয় না। পোষাক ছেড়ে হলের বাইরে বেরিয়ে আসতেই জনে জনে এসে বলে যায় তাদের ভাল লাগার কথা। আগামীকাল ক্লোজিং দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম -- জানিয়ে যায় অনেকে। আনন্দ হয় খুব, কিন্তু ভেসে যেতে পারি না। এখনও আরেকটা বড় কাজ বাকি যে ! আগামীকাল ক্লোজিং সেরিমোনি।

ক্লোজিং সেরিমোনির জন্য একটা ছোট স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম। নাম – "কোরাপ্‌শন"। ভারত এবং জাপান এই দুই দেশকে নিয়েই এই স্ক্রিপ্ট। উদ্দেশ্য ভারত-জাপান মৈত্রী-বন্ধন। কোলকাতায় স্টুডিও নিয়ে তার জন্য রেকর্ডিং করিয়েছিলাম। ১১ তারিখ সকালবেলায় হোটেলের ঘরেই একটা রিহার্সাল দিয়ে নি। এদিন আমাদের আগে অনীকের গান। সুন্দর একটা রেশ রেখে যায় স্টেজে আমাদের জন্য। শুরু হয় কোরাপ্‌শন।

তিরিশ মিনিটের টানা অনুষ্ঠান মনে হয় তিন মিনিটে শেষ হতে চলেছে। একদম শেষে আমরা ১১ জন ভারত এবং জাপানের পতাকা হাতে নিয়ে স্টেজের ওপরেই এগোতে থাকি সামনের দিকে। আলো এবং মিউজিক ফেইড-আউট হয়। গ্রীনরুম থেকে পোষাক পাল্টে হলের ভেতর ঢুকতেই হাততালি দিয়ে ওঠে দর্শকেরা। উফ্ কী অনুভূতি ! আজ হল থেকে বেরিয়েই প্রথমে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলি "ওৎসুকারেসামাদেশিতা" , অর্থাৎ তোমাদের এতদিনের এই কঠিন পরিশ্রমের জন্যই এই সাফল্য। ধন্যবাদ সবাইকে। পা চালিয়ে Convention Center-এর বাইরে এসে দাঁড়াই, তাকাই আকাশের দিকে। খুঁজি মা-বাবুকে। জোড় হাত বুকের কাছে ধরি।

পরিদিন ভোরবেলা থেকেই ব্যস্ততা। ফিরতে হবে। লাগেজ উঠিয়ে কল্লোল গোষ্ঠির সবাইকে বিদায় জানিয়ে আমরাও উঠে পড়ি বাসে। ফিরে আসি এদেশে।

এই জীবনখাতার পাতায় আপনা আপনিই জুড়ে যায় আরেকটা নতুন অধ্যায়। ❑

আজ কাল পরশুর বারমাস্যা

- মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত)

ভোর হয়ে আসছে । অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি এখনও । হাওয়ায় হিমের ছোঁওয়া । আবেশের চাদর সারা অঙ্গে জড়িয়ে প্রকৃতি ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন । দিনটা রবিবার । দীপাঞ্জন ওরফে দীপ এই সাতসকালে বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে । সার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে দেখার চেষ্টা করে তার ড্রাইভার অভ্র এসেছে কিনা । দেখতে না পেয়ে ফোনে তাকে ধরলো,

-- অভ্র উঠেছিস্ ? তাড়াতাড়ি গাড়ীটা নিয়ে আয় । আর দেরী করলে চক্রধরপুরের যানজটের মধ্যে পড়তে হবে । আজ কোন মতেই দেরী করা চলবে না রে ।

ওপাশ থেকে অভ্র উত্তর দেয়,

-- আমি তৈরী দাদা । আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব ।

অভ্র ওদের ড্রাইভার শুধু নয় , তার থেকেও বেশী । পরিবারের একজন বলতে গেলে । দীপ ওকে নিজের ভাইয়ের মতনই দেখে । থাকে বাড়ীর সঙ্গের গেস্টরুমে । ওদের পুরনো পাড়ার ছেলে । ছোটবেলা থেকে চেনা । ভদ্র, সপ্রতিভ ছেলেটিকে দীপ চিরকালই পছন্দ করে । কলেজ পাশ করার পর কিছুদিন চাকরির চেষ্টা করে, না পেয়ে দীপের কাছে এসে কেঁদে পড়েছিল যে কোনও একটা কাজের জন্য । দুঃস্থ এই পরিবারটির জন্য তার সহানুভূতির অভাব কোন কালেই ছিল না । নানা ভাবে সাহায্যও করেছে সময়ে-অসময়ে । অভ্রর অনুরোধ সে ফেলতে পারেনি । একটু চিন্তা করে অভ্রকে বলেছিল,

-- তুই এক কাজ কর । গাড়ী চালানোটা শিখে ফেল । খরচ আমি দেব । তারপর তোর যদি আপত্তি না থাকে তাহালে আমার গাড়ীটা চালা । পরে যদি অন্য কোথাও ভাল কাজের সুযোগ আসে তাহলে তো কথাই নেই । সেখানে চলে যাস্, আমি আপত্তি করবো না ।

অভ্র সেই থেকে রয়ে গেছে । খুবই বিশ্বাসী আর নির্ভরযোগ্য । দীপকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে । আর ও আছে বলেই দীপ নিশ্চিন্ত মনে কাজের জন্য বাইরে যেতে পারে শ্রমণাকে রেখে । রান্নার মাসী অবশ্য আছেন । তবু একজন পুরুষ মানুষ পাহারায় থাকা আলাদা ব্যাপার ।

অভ্রর সঙ্গে কথা বলে ঘরে ঢুকে দীপ আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে তৈরী হতে । দীপের নিজের ব্যবসা । তাই খাটুনীও বেশী । শ্রমণা বোঝে সব । সেই জন্যে পারতপক্ষে কিছু বলে না । কিন্তু এক এক সময় আর পারে না । মেজাজ দেখিয়ে ফেলে । গতকাল রাতেও এক প্রস্থ হয়ে গেছে এই নিয়ে । অথচ কথা শুরু হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবেই । আসলে গত ক মাস ধরে দীপ ভীষণ ব্যস্ত । ফিরতে রোজ অনেক রাত হয় । সকালে বেরোয়ও তাড়াতাড়ি । তার ওপর ইদানিং রবিবারগুলিও কাজের জন্য চলে যাচ্ছে । শ্রমণাকে সেরকমভাবে সঙ্গ দিয়ে উঠতে পারে না । তাই যখন করুণ মুখে শ্রমণা বলেছিল,

-- কালকেও তুমি বেরোবে ? আবার আমি সারা দিন একা ?

দীপের খারাপ লাগে, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে বলে,

-- তোমার অসুবিধা কোথায় ? ছোট গাড়ীটা তো আছেই । ড্রাইভারেরও অসুবিধা নেই । সামনের হিন্দ মোটরস্‌কে বলা আছে । দরকার হলে ওরা ড্রাইভার দেবে । কোথাও ঘুরে আসতেও তো পার । আর নিজের কোথাও যেতে ইচ্ছা না করলে বন্ধুদের ডাকো বাড়ীতে ।

-- হুঁ, সকলের আমার মতন অবস্থা কিনা ! বাড়ীতে একা বসে আর ডাকলেই হুট্ করে চলে আসবে ।

একটু থেমে আবার বলে,

-- ঠিক আছে। বন্ধুদের না হয় ডাকলাম বাড়ীতে। কিন্তু তোমার কি একটুও সময় নেই আমার জন্যে, ছুটির দিনগুলিতেও কাজ ?

এই নিয়ে কথা কাটাকাটির মধ্যে যেতে চায় না বলে কোনও উত্তর না দিয়ে একটু হেসে নিজের কাজ করতে থাকে দীপ। কিন্তু শ্রমণার মন আজ কিছুতেই মানতে চাচ্ছে না। সে অবুঝের মতন নানা কথা বলেই চলে। বিবেকে লাগে বলে শ্রমণার অভিমান দীপকে বিচলিত করে। থাকতে না পেরে তাই উঠে দাঁড়িয়ে শ্রমণার হাত দুটো ধরে অনুনয় করে বলে,

-- প্লীজ শ্রী, একটু বুঝতে চেষ্টা কর। তুমি জান বিদেশ থেকে আজ একটা দল আসছে তাদের সব ব্যবস্থা না করলে তো চলবে না। ওরা আমাদের সবথেকে বড় ক্লায়েন্ট। ব্যবসা চালাতে গেলে তাদের খুশী তো রাখতেই হবে। তাই না ? কিন্তু আজ শ্রমণার মাথায় ভূত চেপেছে। কিছু বলবে না ভেবেও বলে ফেলে,

-- বেশ তো, তাই কর গিয়ে। পারলে ওখানেই থেকে যেও। আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

চোখের জল চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। শ্রমণার স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যবহারে অবাক হয় দীপ। আজ শ্রী-র কি হোল ? আগে তো কখনও এমন করে নি। কি করবে বুঝতে পারে না। শুধু এইটুকু বোঝে যে এখন কিছু বলতে গেলে ফল উল্টো হবে। তাই হতাশ হয়ে শ্রমণার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

শ্রমণার ঘুম হয় না সারা রাত। একটা অপরাধ বোধে মনটা তার অবশ হয়ে আছে। গতকাল রাতে কি যে তার হয়েছিল ভেবে পায় না। কেন যে ওরকম অবুঝপনা করে ফেললো তাও কিছুতেই বুঝতে পারে না। আর সে কারণে দীপের সামনে যেতে একটা অস্বস্তিবোধ ও লজ্জা, দুইই তার মনে একসাথে কাজ করছে। আজ তাই সে কোন কথা না বলে চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখে যাচ্ছে। শ্রমণার নীরবতা দীপ অনেকক্ষণই লক্ষ্য করছে। ওর ম্লান মুখটা দেখে দীপ আর থাকতে পারে না। চকিতে ছুটে গিয়ে শ্রমণাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলে,

-- কি ব্যাপার শ্রী ? কোন কথা বলছো না যে ? এখনও আমার ওপর রাগ করে আছো ? সত্যি, আজকাল তোমাকে একেবারে সময় দিতে পারি না। ঠিক আছে, এবারে কাজটা শেষ হলে চলো আমরা কোথাও ঘুরে আসি। কোথায় যেতে চাও ঠিক করে রেখ। কি রাজী ?

লজ্জা, অস্বস্তি সব কাটিয়ে শ্রমণা এবার ঘুরে দীপের মুখোমুখি দাঁড়ায়। নরম সুরে বলে,

-- রাজী না হবার কি আছে বল ? তবে তোমার ইদানিং যা হাবভাব, কোনদিন দেখবো আমাকেই ভুলে বসে আছ।

-- যাঃ কি যে বল। তোমাকে ভুলে যাব ? এত অবিশ্বাস কর তুমি আমাকে ?

-- কি করব বল ? গতমাসে যেভাবে তুমি বিয়ের –

শ্রমণাকে কথা শেষ করতে দেয় না দীপ। ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,

-- প্লীজ, শ্রী প্লীজ, সেটা সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। তবে ভুল তো ঐ একবারই করেছি, তাই না ?

তারপর একটু কি যেন চিন্তা করে বলে ওঠে,

-- ঠিক আছে, আমি তোমার পিবি-কে ফোন করে দিচ্ছি যাতে সে তোমার কাছে চলে আসে। আর সেটা নেহাৎই অসম্ভব হলে অন্তত ফোনে যেন কথা বলে তোমার মন ঠিক করে দেয়।

শুনতে শুনতে ভুরু কুঁচকে ওঠে শ্রমণার,

-- তুমি কার কথা বলছো ? আর ওই পিবিটাই বা কি ব্যাপার ?

হেসে ফেলে দীপ,

-- বাঃ এইটুকুও মাথায় ঢুকলো না ? চৈতী তোমার প্রাণের বন্ধু, তাই না ?

-- হ্যাঁ।

-- ওটাকেই একটু ছোট করে পিবি করে নিলাম আর কি !

শ্রমণা এবার হেসে ফেলে,

-- সত্যি, মাথায় আসেও তোমার !

মনের ভার নামিয়ে ঘর থেকে বেরোবার আগে তাড়া দিয়ে বলে যায়,

-- তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে খেয়ে নাও। টেবিলে খাবার দিয়ে দিচ্ছি। সময় কিন্তু আর বেশী নেই।

-- নাঃ, এই সাত সকালে কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।

-- একেবারে কিছু না খেয়ে বেরোবে ? একটু কিছু তো খাও।

-- ঠিক আছে একটু গরম চা দাও। সঙ্গে একটা বিস্কুট। আর কিছু না।

তাড়াহুড়ো করে কোন রকমে চা খেয়ে দীপ বেরিয়ে পড়ল। কথা দিয়ে গেল যত তাড়াতাড়ি পারে ফিরবে। গাড়ী বেরিয়ে যাবার পর গেট বন্ধ করে ফিরতে গিয়ে শ্রমণা দেখে গেটের কাছে শিউলী ফুলের গাছটা ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে হয়রান হয়ে গেছে যেন। গাছের নীচটা ঝরা ফুলে সাদা হয়ে আছে। শিউলি ফুলের হাল্কা মিষ্টি গন্ধ আকাশে-বাতাসে একটা মন কেমন করা উতলা ভাব ছড়িয়ে দিয়েছে। সব ভুলে ছুটে গিয়ে কোচড় ভরে ফুল কুড়োতে থাকে শ্রমণা সেই ছোটবেলার মতন। আসলে গাছটার সঙ্গে একটা প্রাণের বাঁধন আছে তার। খুব শখ করে বাপের বাড়ী থেকে ছোটবেলার সঙ্গী শিউলি গাছের চারা এনে লাগিয়েছিল বাগানে। সেই চারা এই ক বছরে গাছ হয়ে এই প্রথম ফুল ফুটিয়েছে। শ্রমণার মনটা তাই খুশীতে কানায় কানায় ভরা। ফুল কুড়ানো শেষ হলে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। পুব আকাশে এক অপরূপ রং-এর খেলা। চারদিক রাঙ্গিয়ে সূর্য উঠছে। বিহ্বল শ্রমণা প্রাণভরে উপভোগ করতে থাকে এই পরম মুহূর্ত। এ দৃশ্য রোজ আর দেখা হয়ে ওঠে না। একটু পরেই শরতের নরম আলো গায়ে জড়িয়ে হেসে উঠল সুন্দর একটা ঝল্‌মলে দিন। এত সুন্দর দিনটা একা কাটাতে হবে ভেবে শ্রমণার মনটা ভার হয়ে ওঠে। যে জায়গাতে ওরা থাকে এখন সেখানে যদিও সবই ভাল তবু কেন যেন ঠিকমতন মনটা তার বসছে না কিছুতেই। অথচ ওকে খুশী করার জন্যে আর সেইসঙ্গে ভবিষ্যত চিন্তা করে কোলকাতা থেকে সামান্য দূরে "সোনাঝুরি" কমপ্লেক্সের মধ্যে ছিম্‌ছাম ছোট্ট দোতলা বাড়ীটা দীপ কিনেছে কয়েক বছর আগে। উত্তর কোলকাতার বনেদী এজমালী বাড়ীর সব গণ্ডগোল, ঝগড়াঝাঁটি থেকে এখানে পালিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে শ্রমণা। প্রথম প্রথম ভীষণ ভাল লাগত। মুক্তির স্বাদটা প্রাণভরে উপভোগ করেছে। একটু থিতু হয়ে বাগান করায় মন দিয়েছে। বাড়ীর চারদিকে যে খোলা জমি ছিল সেখানে সে সুন্দর একটা বাগান তৈরি করেছে। সামনের দিকে ফুলের বাগান আর পিছন দিকটাতে তরি-তরকারী। মালীই অবশ্য সব করে। তবে শ্রমণাও খুব খাটে এই বাগানের পিছনে। গাছপালার প্রতি ভালবাসা তো আছেই। তাছাড়া এইসব কাজে ব্যস্ত থেকে সব কিছু ভুলে থাকতে চায় সে। অবসর সময়ে দীপও হাত লাগিয়েছে আগে। কিন্তু ইদানিং তার আর সময় নেই এসবের

জন্যে। সে এখন সর্বক্ষণ ছুটছে। আজ এখানে, তো কাল সেখানে, পরশু বিদেশে। বড় একা লাগে শ্রমণার। তার একাকীত্বটা দীপ বোঝে না। নাকি বুঝতে চায় না। এক এক সময় মনে হয় ছেলেদের বোধহয় সেই বোধটাই নেই। সত্যি কি তাই ? কে জানে।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে দেখে ভারী মন নিয়ে শ্রমণা ঘরে ঢোকে। একটা বড় কাঁচের বাসনে কুড়ানো শিউলি ফুলগুলো রেখে স্নানে ঢুকল। স্নান সেরে সোজা পুজোর ঘরে। পুজো শেষে যখন ঘরে ঢুকছে তার মনে হোল একটা গাড়ী এসে থামলো তাদের গেটের সামনে। এই সাতসকালে আবার কে এলো ভেবে বারান্দায় বেরিয়ে দেখে চৈতী এসেছে। বিস্রস্ত বেশবাসে, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় তাকে গাড়ী থেকে নামতে দেখে চিন্তিত মুখে শ্রমণা ছুটে আসে।

-- চৈতী তুই ? এত সকালে ? কি হয়েছে রে ?

শ্রমণাকে সামনে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে চৈতী। আকুলভাবে বলে ওঠে,

-- শ্রী, তুই ঠিক আছিস শ্রী ? অবাক হয় শ্রমণা।

-- কেন রে আমার তো কিছু হয় নি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চৈতী বলে,

-- ওঃ দীপাঞ্জন পারেও। এমন করে ফোনে বললো – "যাও দেখ গিয়ে তোমার বন্ধুর অবস্থা। প্লীজ একটু শান্ত কর গিয়ে। ভয় হচ্ছে কিছু করে না বসে।" আমি তো ঘাবড়ে গেছি কি হোল ভেবে। দ্যাখনা, যেমন ছিলাম তেমনই চলে এসেছি। শাড়ীটা বদলাবার পর্যন্ত সময় পাইনি।

শ্রমণা তার হাত ধরে বলে,

-- আয়, ভিতরে আয়। সকালের খাওয়াও তো বোধহয় হয় নি। আমিও এখনও খাইনি। ভালই হোল, একসঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে। আর দিনটাও কাটবে ভালই। এত সুন্দর দিনটা একা একা কাটাতে হবে ভেবে কান্না পাচ্ছিল।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শ্রমণা বলে,

-- জানিস তোর একটা নতুন নাম হয়েছে।

উৎসুক হয়ে চৈতী তাকায় ওর দিকে। হাসতে হাসতে শ্রমণা বলে -- পিবি। অবাক হয়ে চৈতী বলে,

-- পিবি ? ঠিক বুঝলাম না তো। হঠাৎ এই উদ্ভট নামের মানে ?

-- পিবি মানে প্রাণের বন্ধু।

হেসে ফেলে চৈতী। -- দীপাঞ্জনটা সেই একই রকম রয়ে গেল। এতটুকু বদলায় নি।

সকালে খেতে বসে চৈতী বলে -- চল্, সব বন্ধুদের ডেকে একটা আড্ডা মারার ব্যবস্থা করি। অনেক দিন এক জায়গায় বসা হয় না।

শ্রমণার মনে দ্বিধা -- এত অল্প নোটিসে সেটা কি ঠিক হবে ? তার ওপর আজ আবার রবিবার। ক জন আসতে পারবে ?

-- চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ? কেউ না এলে দুজনে মিলে আড্ডা মারবো আজ সারা দিন।

অগত্যা শ্রমণা রাজী হোল। দুজনে মিলে পালা করে বন্ধুদের ফোন করতে শুরু করল। অনেকেই রাজী। তবে যারা আসতে পারবে না তারা সকলেই অভিযোগ করলো আরও আগে না জানানর জন্যে।

ফোন ছেড়ে দুই বন্ধুতে এবার আসর বসানোর ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়। রান্নার মাসীকে ডেকে দুপুরের খাবার তৈরীর কথা বলে। জানায় বন্ধুরা সব আসছে, তবে কতজন, জানা নেই।

ওদের দুশ্চিন্তাকে মিথ্যা প্রমাণ করে একে একে অনেকেই এসে পড়ল। দেখতে দেখতে হাসি-গল্পে বাড়ী ভরে উঠল। একজন করে আসে আর তাকে নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয় নতুন করে। একটু দেরীতে একমুখ হাসি নিয়ে নিঃশব্দে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো বিশাখা। প্রথমে চোখে পড়ে চৈতীর। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে,

-- আরে বিশাখা যে ! আমরা কি স্বপ্ন দেখছি নাকি ? আয়, আয়, গায়ে হাত দিয়ে দেখি সত্যি তুই কি না।

ওকে দেখে সকলেই অবাক। ছুটে আসে শ্রমণা। বিশাখাকে জড়িয়ে ধরে বলে, -- ভিতরে আয়, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন রে।

তারপর বিশাখার হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে এনে বসিয়ে দেয় সবার মধ্যে। সকলে ঘিরে ধরে তাকে। রিয়া বলে,

-- তুই ম্যানেজ করলি কি করে রে বিশাখা ? আমরা তো তোকে বাদই রেখেছিলাম।

প্রণতি যোগ করে,

-- তোর শাশুড়ী কি হঠাৎ বদলে গেলেন নাকি রে ? তোকে এত সহজে আজ আড্ডা মারতে ছেড়ে দিলেন।

বন্ধুরা সকলেই জানে শান্ত সরল মেয়েটা শাশুড়ীর দাপটেই হাবুডুবু খাচ্ছে সব সময়। হেন কাজ নেই যা ওকে করতে হয় না। বেচারা যেন হাঁফ ফেলার সময় পায় না। কাজের লোক পছন্দ নয়, তাই লোক রাখতে দেন না। তাছাড়া বাড়ীতে তো বৌ-ই আছে। এত করে বেচারা, তবু এতটুকু স্বীকৃতি বা সহানুভূতি নেই। উল্টে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমন কি পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছেও ওর নামে যা তা বলে বেড়ান। ওঁর আপত্তি না শুনে ছেলে বিয়ে করেছে, সে জন্যে যেন বৌ-ই দায়ী। আর তারই প্রতিশোধ নিয়ে চলেছেন। বিশাখা মুখ বুঁজে সব সহ্য করে। প্রতিমের কাছেও কোন অভিযোগ করে না। শুধু দিন দিন তার মুখের হাসি শুকিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা দেখে কলেজ জীবনের সেই মিষ্টি হাসিতে ভরা সুন্দর মুখের বিশাখাকে এখন আর চেনাই যায় না। ওকে ঘিরে একটা বিষাদের ভাব ছড়ান। সকলের সামনে সহজ হবার চেষ্টা করে সলজ্জ হাসে বিশাখা। ওর হাসি দেখে সকলে খুশী হয়। কপট রাগে দাবড় দিয়ে নয়না বলে ওঠে,

-- এ্যাই মেয়ে আবার হাসছে দেখ। বল্ না কোন মন্তরে তোর ঐ নমস্য শাশুড়ীকে ম্যানেজ করলি ? বশীকরণ মন্ত্রতন্ত্র শিখেছিস নাকি রে ? আমাকে একটু শিখিয়ে দিস তো। বলা যায় না কখন কোন কাজে লেগে যায়।

চূর্ণী ওপাশ থেকে বলে,

-- থাক্ তোর আর ওসব শিখে কাজ নেই। এমনিতেই যা -- তাতেই যথেষ্ট।

সকলে হেসে ওঠে একসঙ্গে। হেসে ফেলে বিশাখাও বলে,

-- যাঃ, কি যে বলিস। আসলে উনি এখন হরিদ্বার-হৃশিকেশ গিয়েছেন বেড়াতে বন্ধুদের সঙ্গে। মাসী শাশুড়ীকে রেখে গেছেন সব দায়িত্ব দিয়ে। উনি মানুষটা ভাল আর আমাকে ভালওবাসেন খুব। শ্রীর ফোন পেয়ে ওঁকে বলতেই রাজী হয়ে গেলেন। আমিও আর দেরী না করে ছুটতে ছুটতে চলে এলাম। কতদিন দেখা হয় না তোদের সঙ্গে। আজ তোদের সঙ্গে আড্ডা মেরে বুক ভরে অক্সিজেন নিয়ে যাব। আরামের দিনগুলির মেয়াদ তো আর বেশী দিন নেই।

নয়না বলে ওঠে -- নিয়ে নে, নিয়ে নে, অনেক বেশী বেশী করে। নইলে বাঁচবি কি করে ? বাব্বাঃ কি করে যে সহ্য করছিস এত বছর ধরে তুই-ই জানিস। আমি হলে বাবা ---

নয়নাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ধম্‌কে ওঠে রাখী,

-- কেন ওর পেছনে লাগছিস ? বেচারা আসতে তো পেরেছে। তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি। সকলে কি তোর মতন না কি ?

বকুনী খেয়ে অপ্রতিভ হয়ে নয়না বলে,

-- না রে বিশাখা তোকে দোষ দিচ্ছি না। তুই আর কি করবি ? যার ভরসায় সব কিছু , যে বিপদ-আপদ থেকে করবে, সেই বরটাই যে মায়ের আঁচল ধরা। কিছু বলার সাহস নেই। মুখে কুলুপ আঁটা। নিজের বৌকে যে আগলে রাখতে পারবে না, তার বিয়ে করা কেন বাপু ? তাও আবার প্রেম করে। প্রতিমের চোখ কি কোন দিনই খুলবে না। আশ্চর্য্য !

নয়নার কথা শুনে বিশাখাকে মুখ নীচু করতে দেখে রাখী আবার তাড়া দেয়,

-- নয়না তুই থামবি।

-- আচ্ছা বাবা আচ্ছা, আর কিছুই বলছি না। তবে বিশাখা শোন্ , তোকে একটা সত্যি কথা বলি। তোর ঐ নমস্য শাশুড়ী মা হাজার বার গঙ্গায় ডুব দিয়েও এক ফোঁটাও পুণ্যার্জন করতে পারবেন না। ওপারে যখন যাবেন, অত সহজে কি আর যাবেন ? তোকে আরও অনেক অনেক জ্বালাবার পরে অবশ্য তা যখনই হোক গিয়ে তো দেখবেন স্বর্গের রাস্তায় "নো এন্ট্রি" বোর্ড ঝুলছে। অগত্যা যে রাস্তায় "ওয়েলকাম" বোর্ড সেখানেই যাবেন, আর সেটা সো-জা নরকের দরজায় গিয়ে থামবে। আমি একেবারে একশো পারসেন্ট সিওর।

নয়নার কথার ধরণে সকল হেসে ফেলে। আড্ডা আস্তে আস্তে জমে ওঠে। অনেক দিন পরে সব একসঙ্গে হয়েছে। শ্রমণা এক ফাঁকে উঠে গিয়েছিল দুপুরের খাবারের তদারকি করতে। এবার সে ঘরে ঢোকে। সকলকে তাড়া দিয়ে বলে,

-- অনেক বেলা হয়েছে। আয় সকলে খেয়ে নে আগে। তারপর যত খুশী আড্ডা মার বসে। আরও দেরী করলে আবার ফেরার তাড়া পড়বে।

শ্রমণার কথায় সকলে খাবার ঘরে আসে। টেবিলে খাবারের আয়োজন দেখে সকলে একই সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল ,

-- শ্রী, একি করেছিস রে ! আজ কি বিশেষ কোনও উপলক্ষ্যে আমাদের ডেকেছিস ?

শ্রমণা হাসতে হাসতে বলে,

-- না রে, আমি কিছু করিনি। তোরা জানিস মাসীকে। সব ব্যবস্থা তাঁর।

খাবার টেবিলে আড্ডা আবার জমে ওঠে। একথা সেকথার মাঝে মন্দিরা হঠাৎ বলে,

-- তোদের রুক্মিনী, পদ্মিনীদের মনে আছে ? সেই যে রে দুই জমজ বোন। খুব হৈ হৈ করতো, চেহারা একেবারে একরকম ছিল। কোন জন কে, তা আমরা ধরতে পারতাম না বলে মজা করতো ?

শ্রাবন্তী বলে ওঠে,

-- মনে থাকবে না আবার। একে তো সুন্দরী ছিল দুজনেই। তার উপর কি ঝর্‌ঝরে সুন্দর বাংলা বলতো বল্ তো ?

শর্মিষ্ঠা যোগ দেয়, -- সত্যি, ওদের কথা শুনে বোঝার উপায় ছিলনা যে ওরা দক্ষিণ ভারতের। অবশ্য ওদের জন্ম, বড় হওয়া সবই কোলকাতাতে। তা একরকম বাঙালীই বলা চলে। হঠাৎ ওদের কথা কেন রে ?

-- কিছুদিন আগে রুক্মিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল দক্ষিণাপনে। ও-ই দেখতে পেয়ে ছুটে আসে কথা বলতে। জানিস, আরও সুন্দর হয়েছে দেখতে। সঙ্গে স্বামী আর মেয়ে ছিল। আলাপ করিয়ে দিল। ভদ্রলোক বাঙ্গালী। পদ্মিনী থাকে ম্যাঙ্গালোরে। তার একটি ছেলে। অনেক দিন পর রুক্মিনীকে দেখে এত ভাল লাগল। সকলের খোঁজ নিয়েছে। একটুও বদলায় নি।

তারপর হঠাৎই যেন মনে পড়ে গেল,

-- ইশ্ , ও তো ওর ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর সবই দিয়েছিল আমাকে। আগে খেয়াল থাকলে ওকেও আজ ডাকা যেত।

চৈতী বলে, -- ঠিক আছে, পরের বার মনে করে ওকে খবর দিস্।

খাবার পর্ব শেষ হলে ওরা সকলে জড়ো হোল বসার ঘরে। নতুন উদ্যমে আবার সকলে ডুবে যায় নানান কথায়। চূর্ণী বলে,

-- এই যাঃ, তোদের বলতেই ভুলে যাচ্ছিলাম। সেদিন একটা নেমতন্নে গিয়ে জানিস অরুনাভর সঙ্গে দেখা। এখন তো ও ওদের পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করে। চেহারাটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। আমি তো চিনতেই পারিনি প্রথমে। এক গাল হেসে সামনে এসে দাঁড়িয়ে যখন বলল, "চিনতে পারছো ?" আমি আর সৌম্য একটুক্ষণের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওর হাসিটা তেমনই সুন্দর আছে। সেটাই ওকে চিনিয়ে দিল। কিন্তু বড় ম্লান হয়ে গেছে তা। চেহারা খারাপের কথা বলাতে বলল ব্যস্ত ভীষণ। প্রায়ই বিদেশে যেতে হয়। মাত্র দিন কয়েক আগে য়ুরোপ থেকে ফিরেছে। তাই ক্লান্ত। বিয়ে করেনি কেন সৌম্য জিজ্ঞাসা করাতে বলল ব্যস্ততার জন্য। সময়াভাবই নাকি একমাত্র কারণ। সৌম্যকে দেখে খুব খুশী হয়ে অনেক গল্প করল। আমার কেমন মনে হোল ও ঐ হাসি, গল্পের পিছনে একটা শূন্যতা বোধ রয়েছে। সুদেষ্ণার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির ধাক্কাটা পুরোপুরি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

রূপাঞ্জনা বলে উঠল, -- সত্যি, ওদের ছাড়াছাড়িটা মেনে নিতে কষ্ট হয়। কে ভেবেছিল এমনটা হতে পারে ? কারণটা বোধহয় কেউ জানেনা। সুদেষ্ণার খবর জানিস কেউ ?

শর্মিষ্ঠা বলে, -- ও তো কি একটা স্কলারশিপ নিয়ে জার্মানীতে চলে গেছে রিসার্চ করতে। যতদূর জানি ও-ও বিয়ে করেনি।

সকলেরই মনটা খারাপ হয়ে যায়। এতক্ষণের প্রাণবন্ত পরিবেশটা ভারী হয়ে উঠছে দেখে নয়না হাত তুলে বলে, -- আরে, আমারও তো রূপঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়েছে। অবশ্য বেশ কিছুদিন আগে। এমনিতেই বড়লোকের ছেলে ছিল, দেখেশুনে মন হোল এখন বোধহয় আরোই বেশী পয়সা হয়েছে। চেহারার যা চেকনাই হয়েছে না, দেখলে মনে হবে ফিল্ম-স্টার -- একেবারে নায়ক যেন ! তবে নাকউঁচু ভাব একেবারেই নেই। বেশ সহজভাবেই কথা বলল আমাদের দুজনের সঙ্গে।

নয়নার কথা শেষ হতেই শ্রাবন্তী সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, -- এবারের কলেজ রিয়ুনিয়ানে যাবি ? কতদিন যাইনা বলত ? যোগাযোগ করে দেখাই যাক্ না সকলে কি বলে। আমাদের গ্রুপটাকে অন্তত যদি জড়ো করা যায়, কি বলিস তোরা ?

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে। চা খেতে খেতে মন্দিরা বলে,

-- মন্দ কি ! সকলেরই মত আছে বলে মনে হচ্ছে।

চৈতী এবার সকলকে বলে, -- যে যার বাড়ীর সকলকে পটিয়ে পাটিয়ে রাখ। পরে যেন ঝামেলা না হয়। রিয়া, নীলাভ্রকে বলিস ওর বন্ধুদের যেন খবর দিয়ে রাখে এখনই। বিশাখা, তোকে আর কি বলব ? প্রমিত যদি ম্যানেজ করতে পারে তার মাকে।

বিশাখা চুপ করে থাকে। আবার এক জায়গায় হবার একটা উপলক্ষ্য পেয়ে সকলেই খুশী। সংসারের ঝুট-ঝামেলা ভুলে সারাটা দিন হৈ হৈ করে বেশ কাটলো। এবার ঘরে ফেরার তাড়া। কোন

ফাঁকে যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে ওরা টেরই পায়নি। একে একে সকলে উঠে পড়ে। দরজার সামনে এসে প্রণতি বলে,

-- এত সুন্দর কাটলো দিনটা বলার না। আমরা তো মাঝেমধ্যে এরকম এক জায়গায় হতেই পারি। তবে নোটিসটা যেন আরও আগে পাই।

শ্রমণা এগিয়ে এসে ওর হাতদুটো ধরে বলে,

-- সত্যি রে তুই ঠিক বলেছিস। আসলে এত দেরীতে সব ঠিক হোল। আজ সকালে চৈতী আসার পরে। তবু তো তোরা এসেছিস। আমরা তো ভাবতেই পারিনি এত জন আসতে পারবি। এর পরের বার আরও সময় নিয়ে প্ল্যান করে সব করব কথা দিচ্ছি।

নয়না এসে জড়িয়ে ধরে বিশাখাকে,

-- তুই আমার ওপর রাগ করিস নি তো ? অনেক দিন পরে তোকে দেখে একটু পিছনে লাগতে ইচ্ছা করল। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না বিশ্বাস কর। আমি সত্যিই দুঃখিত।

বিশাখা হেসে বলে,

-- না, না, আমি কিছু মনে করিনি রে। তোকে তো আমি চিনি।

সকলেই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল সুন্দর দিনটার জন্য শ্রমণাকে ধন্যবাদ জানিয়ে। চৈতীও ওদের সঙ্গ নিল। বেচারা কোন সকালে এসেছে।

সকলে চলে গেলে একটা চেয়ার টেনে বারান্দার একধারে চুপ করে বসে আকাশের দিকে আনমনে তাকিয়ে আজকের দিনটার কথা ভাবতে চেষ্টা করে শ্রমণা। ছুটির দিনে একা একা সারাটা দিন কাটাতে হবে ভেবে সকালে তার কান্না পাচ্ছিল। তার বদলে কি সুন্দর ভাবে দিনটা কেটে গেল। বন্ধুদের প্রতি মমতায় মনটা তার ভরে ওঠে। শুধু বিশাখার কথা ভেবে কষ্ট হয়। ওদের দলের মধ্যে একমাত্র বিশাখাই সুখী হতে পারেনি। শাশুড়ীর অত্যাচারে বিধ্বস্ত মেয়েটা। তবু আজ আসতে পেরে একটু সময়ের জন্য হলেও বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করতে পেরেছে ভেবে শ্রমণা একটু স্বস্তি বোধ করে। কলেজ রিয়ুনিয়ানে কি আসতে পারবে ? কে জানে ! হয়তো শাশুড়ী আটকে দেবেন। কি কপাল করেই যে মেয়েটা এসেছে। নয়নার মতন শ্রমণাও প্রতিমের উপর বিরক্ত হয়। বন্ধুরাই বা কি করতে পারে ? দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রমণা উঠে দাঁড়ায়। সারাদিনের নিরঙ্কুশ আনন্দের উপরে একটা বিষাদের প্রলেপ পড়ে। এখন কটা বাজে ? তবে বেশী রাত হয়নি বোঝা যায়। দীপ কখন ফিরবে কে জানে আর ফিরলে পরে খাবে কিনা তারও ঠিক নেই। শ্রমণা ঘরের দিকে পা বাড়িয়েই চম্‌কে ওঠে। ওদের গাড়ীটা গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ী থেকে হৈ হৈ করে নামতে নামতে দীপ চেঁচিয়ে ওঠে,

-- শ্রী, দ্যাখো তোমার জন্য একটা দারুণ জিনিষ এনেছি।

শ্রমণা দেখে দীপের কোলে সাদায়-কালোয় মেশানো ছোট্ট একটা কুকুর ছানা। বোতামের মতন গোল গোল ছোট্ট চোখে ওর দিকে ঘাড় কাৎ করে তাকিয়ে আছে। ছুটে এসে শ্রমণা দীপের হাত থেকে তাকে তুলে নিয়ে বলে,

-- ওমা, কি মিষ্টি ! কোথায় পেলে গো ?

-- মিঃ মেহেরার প্রেজেন্ট তোমার জন্যে।

তারপর কথা ঘুরিয়ে বলে,

-- তোমার পিবি-কে ফোন করে দিয়েছিলাম। এসেছিল নিশ্চয়ই। আর তার মানে তোমার দিনটা ভালই কেটেছে।

কুকুর ছানাকে আদর করতে করতে শ্রমণা বলে,

-- শুধু চৈতীই নয়, আরও অনেকেই এসেছিল। কলেজের সব বন্ধুরা। তুমি সকলকেই চেন।

দীপ চোখ গোল গোল করে বলে,

-- আরেব্বাস্ ! তোমার তো দারুণ সময় কেটেছে আজ !

শ্রমণা বলে ,

-- সে সব কথা পরে হবে। আগে চল হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নেবে মাসী আজ সাধ মিটিয়ে রান্না করেছে।

দীপকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে ঘরে ঢোকে শ্রমণা। ❑

নিত্য ট্রেন যাত্রা

- তুলি পাত্র

প্রত্যেক দিন সকাল ৭-৩০ মিনিটে শিনসুগিতা স্টেশন থেকে আমি আর আমার পুত্র ট্রেন ধরি স্কুলের জন্য। সাধারণত উঠি প্রথম কামরাতেই। ট্রেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, সে হল মিড্‌ল স্কুলের এক ছাত্রী। যে কোনো কারণেই হোক, কিশোরীটিকে সর্বক্ষণ হাত মুখ গলা (এমনকি চোখের পাতা পর্যন্ত) চুলকাতে দেখা যায়। ট্রেন ইয়ামাতে স্টেশনে পৌঁছালে, নেমে যায় মেয়েটি। ওই স্টেশনেই নামে আমার পুত্রটিও এবং আরও অনেকেই।

ভাবি এইবার বুঝি একটু শান্তিতে দাঁড়ানো যাবে। কিন্তু তা হওয়ার নয়, কারণ আবার ট্রেন বোঝাই করে যাত্রী ওঠে, আর আমার অবস্থা হয় স্যান্ডউইচের মত। ওই ভাবেই কোনো রকমে পৌঁছাই সাকুরাগিচো স্টেশনে --উল্টো দিকের প্ল্যাটফর্মে আরেকটি ট্রেন। একদিন হঠাৎ সেই ট্রেনের ভিতরে ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা পাঠরত এক ভদ্রলোকের দিকে চোখ পড়লো। চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন ! আরে, এ যে আমাদের শ্যামল দা ! চেঁচিয়ে আমি ডেকেই ফেলেছিলাম প্রায়, কিন্তু তখনই মনে হল, "এটা তো জাপান। এখানে স্টেশনের মধ্যে কাউকে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করা কি ভাল দেখাবে ?"

যাইহোক, ইয়োকোহামা স্টেশনে পৌঁছানোর পর ট্রেন অনেকটাই খালি হয়ে যায়, আর আমিও একটু এগিয়ে যাই দরজার দিকে --কারণ পরের স্টেশনেই ট্রেন বদলে আমার ইয়োকোহামা লাইন নেওয়ার পালা। দরজার পাশে স্যুট-বুট পরা অফিসযাত্রীদের ভিড়। দরজা বন্ধ হতেই শুরু হয়ে যায় তাঁদের বাসি মুখের হাই তোলা। ওদিকে আমার তখন "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি"র মত অবস্থা -- পেট থেকে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে আর কি ! কোনোক্রমে পরের স্টেশনে পৌঁছে তাড়াতাড়ি ট্রেন বদলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

আহ্ একটু যেন শান্তি ! কিন্তু তাই বা আর কতটুকু সময়ের জন্য। ভিড় হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে -- গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি। নজর কাড়ে এক teenager -- এই কিশোরী আমার সামনের সিটে বসে বড় ব্যাগ থেকে ছোট একখানা ব্যাগ বার করে মেকআপ-এ মনোনিবেশ করেছে। হাতে এক গোছা চোখের পাপড়ি। হায় ! হায় ! চোখের পাপড়িগুলো তুলে ফেললো মেয়েটা ? ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিশ্চিন্দি। False eye-lash -- মেয়েটা ততক্ষণে নিপুন হাতে সেঁটে নেয় চোখের পাতায়। "নিখুঁত কাজ" ! ভাবতে না ভাবতেই আরেক দফা আঁতকে ওঠার পালা ! কাঁচির মত দেখতে হাতে ওটা কি ? চোখের পাতায় আটকে নিয়ে এমন টানাটনি করছে যে ভয় হয় বুঝি চোখটাই উপ্‌ড়ে বেরিয়ে আসে ! তবে না , এবারও রক্ষে , বিপদ তো হয়ই না , বরং কাঁচিরূপী প্রসাধন সরঞ্জামটির দৌলতে মেয়েটির চোখ দুটো যেন বেশ ডাগর ডাগর পটলচেড়া চোখের মতই বড়সর দেখায়। মনে মনে ভাবি, "একেই বলে Made in Japan ."

আবার গন্তব্যে পৌঁছানোর অপেক্ষা। হঠাৎ মনে হয় গায়ে যেন কিসের সুরসুরি লাগছে। পাশে তাকিয়ে দেখি নিদ্রামগ্ন এক ভদ্রলোক ঢলে পড়েছেন আমার কাঁধে। তবু হুঁশ্ নেই, ঘুম ভেঙে যাওয়ার লক্ষণও নেই। আমি তাঁর মাথাটা ধরে সোজা করে বসিয়ে দেই। মিনিট খানেকের মধ্যে যে কে সেই। আবার ঠেলা মেরে সরিয়ে দি। ঠেলাঠেলির পুনরাবৃত্তির মধ্যেই ট্রেন পৌছে যায় তোকাইচিবাতে -- আমার চূড়ান্ত গন্তব্যে।

তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে।
এই হল আমার দৈনিক পঞ্চাশ মিনিটের ট্রেন যাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ❑

সূত্রধর মাহাতো ও একটি উন্নয়নের সূত্র

- শংকর বসু

সূত্রধর মাহাতো উন্নয়নশীল দেশের কোণ ঘেঁষে থাকে
হাতের মুঠোয় তার বনপাহাড়ের গল্প দখল
উন্নয়নের সব সূত্রের লাটাই হাতে
নষ্টচন্দ্রের দলবল।

সুন্দরবন সেদিন বিক্রি হল সাপসদাগরের হাতে
পূর্ণিমার রাতে ঝিমন্ত চাঁদের আলোয়
আস্তানা হারালো কালো-হলুদ ডোরা আর
সূত্রধরের পূর্বপুরুষনারীরা
সঙ্গীসাথী ডানাওলা ঝট্‌পটে অথবা
নিছকই ডোডোপাখির মতো।

শালের জঙ্গলে তখন ঠিকাদারের আস্তানা
চোরাই কাঠ রাতে ডানা মেলে ওড়ে
পাথুরে খাদানের জমা জলে
সূত্রধর দেখে সেই উড্ডীন জঙ্গল, লালমাটি
টিলার ধারে পড়ে থাকা ছেঁড়া শাড়ীর আঁচল
নিম্‌কি সিম্‌কিদের অপুষ্ট দেহের বেসাতি শেষ অল্প দামে।

সাদা কুর্তার আড়ালে লুকোনো হাতের জাদুতে পাহাড়-জঙ্গলের
নক্সা লোপাট, দুধ-সাদা গাড়ীর আনাগোনা
নরম প্রেমের ছায়াছবির আউটডোর
ডাঞ্চিবাবুর দল, প্রাতঃভ্রমণ আর টাকা ওড়ার পত পত
সূত্রধরেরা কান পেতে শোনে; বেলপাহাড়ীর ধিক্কা মুর্মু
কবে শেষ ভাত খেয়েছিল সেকথা আজ ইতিহাস।

সাদা মানুষের হাতে ঢল নামে গুলি-বারুদের স্তুপ
সূত্রধরের সংশয় পিছলে পড়ে অন্ধকার উন্নয়নের সিঁড়িতে
বেলপাহাড়ী, সারঙ্গার মাটী নিজেদেরই রক্তবীজে আঁধারশিলা
ঝাপ্‌শা হয়ে যায় রঙ্গীন জীবন হে সূত্রধর, কে জাগে ?
যারা রইল বাকী, মরল দলছুট জন্তুর মতো
পাহাড়-জঙ্গলের রুক্ষ মাটীতে মাথাচাড়া দেয়
উন্নয়নের চারাগাছ
সূত্রধরের চালাঘর ফুঁড়ে
আরো অনেক উঁচু সাদা মেঘের দিকে ।।

মশা

- নমিতা চন্দ

রাতে মশা দিনে মাছি
কি সুখেই আমরা এদেশে আছি,
তাই দেশান্তরী করলো মোদের
এই দেশেরই মশা
মশার কামড় খেয়ে মোদের
এমনই দুর্দ্দশা।

মশার কামড় খাই মোরা তরকারি কাটতে কাটতে
কে সাহায্য করবে মোদের মশার থেকে বাঁচতে
মাছির থেকে পেয়েছি রেহাই
মশার থেকে পাইনি রেহাই

মশা যে কত ভয়ঙ্কর প্রাণী
আমরা তা সকলেই জানি।
ইঁদুর বলে মশার কামড় একি জ্বালা
বাঘ বলে পালা পালা
তাই তো বলি মশার সাথে তুলনা কারুর নেই
মশা আজও বেঁচে আছে সেই পেশাতেই ।।

উপলব্ধি

- অজিত কুমার পাল

জয়ী যদি হতে চাও
পরাজয়কে স্বীকার কর,
সুখ যে তোমার হাতের কাছে
দুঃখ যদি বইতে পার।
শরীর ধারণ হরির কারণ
সেবার তরে জীবন ধারণ;
জীবন সে তো তুচ্ছ যেন
ভক্তি হল সবার বড় ।।

विश्व प्राकृतिक धरोहर शिरेतोको

– लोचनी अस्थाना

ग्यारह साल पहले जापान में तीन साल के प्रवास के दौरान फुजि पर्वत पर चढ़ने का सौभाग्य तो मिला लेकिन होक्काइदो जाना नहीं हो पाया था। इस साल महीना भर पहले भी बुकिंग न मिल पाने के कारण जब हिमोत्सव देखना संभव नहीं हुआ तो इन गर्मियों में होक्काइदो के पूर्वोत्तरी शिरेतोको प्रायद्वीप का राष्ट्रीय उद्यान देखने जाने की सोची जिसे युनेस्को, प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विश्व धरोहर घोषित कर चुका है।

जापान का ये वो सुदूर पूर्वोत्तरी क्षेत्र है जहां अनन्त आकाश, अथाह निर्मल सागर और हरियाली में ढकी धरती की गोद में भरपूर जैव विविधता है। कुलाँचें भरते हिरण, ज़रा सी आहट पर भाग निकलने वाली लोमड़ी, और दहशत देते गहरे भूरे रीछ जो मछलियों की तलाश में सागर में छलाँग लगा लें। ओखोत्सक सागर में मिलने वाला अत्यन्त नन्हा जीव क्लिऑन जिसे आम भाषा में सीएन्जिल कहते हैं, वहीं देखने को मिला। बमुश्किल एक सैंटीमीटर लंबा, पारदर्शी पँख और पूँछ के बीच सूक्ष्म गुलाबी देह। वाकई तैरता हुआ नन्हा फरिश्ता सा दिखता था।

रात में नंगी आँख से भी नक्षत्र इतने साफ और इतने पास दिखे कि यकीन नहीं हुआ। चमकीला शुक्र (वीनस), बृहस्पति (जूपीटर), बुध (मर्करी), सप्तऋषि, अंग्रेज़ी अक्षर डब्लु के आकार में दिखने वाले पाँच तारों का समूह काश्यपी, आकाशगंगा के आर पार वैगा और अल्टायर भी देखे जिनका मिलन यहां साल में एक बार तानाबाता की रात यानी सातवें महीने की सातवीं तारीख को माना जाता है।

जहाज़ में सवार हो कर शिरेतोको प्रायद्वीप के सूदूर आखिरी छोर तक जाते हुए ऊँचा चट्टानी तट और ओखोत्सक सागर में गिरते झरने देखने को मिले। इस विश्व धरोहर में एक तरफ पहाडों

और दूसरी तरफ सागर से घिरे, हरियाली से ढके दलदली क्षेत्र में झील देखने जाने का अनुभव अद्भुत रहा। झील तक पहुँचने के लिए लकडी का पुलनुमा रास्ता है। रास्ते के आस पास और नीचे हिरण कुलांचे भर रहे थे और पर्वत शिखर पर आराम फरमाते बादलों के बीच दूर झील में कमल के फूल खिले थे। तेज़ धूप में गर्मी इतनी थी कि छाता खोलना पडा। इस गर्मी में ये कल्पना करना तक मुश्किल था कि कुछ ही महीनों बाद सर्दियाँ आने पर सामने नज़र आ रहे ओखोत्सक सागर की सतह बर्फ में तब्दील हो जाएगी।

कुनाशिरी द्वीप भी देखने को मिला सिर्फ ३० किलोमीटर दूर नज़र आने वाला ये द्वीप उन चार द्वीपों में से एक है जिस पर जापान दावा करता है लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से रूस का कब्ज़ा है।

और हाँ यादगार रही इसी प्रायद्वीप के शहर उतोरो में होक्काइदो के मूल निवासी आईनू जनजाति की एक महिला की पारम्परिक हस्तशिल्प की दूकान जिसमें भारत की बाँधनी के सूती स्कार्फ भी थे। भारतीय सूती कपडे. की कद्रदान ने बेहद आत्मीयता से सत्कार करते हुए पीने को खास तरह के पेय का गिलास पेश करते हुए इशारे से बताया कि ये पेट के लिये बहुत मुफीद है। दीवार पर लगे एक बार अखबार में फोटो दिखाते हुए टूटी फूटी अंग्रेज़ी में इतना समझा दिया कि पिछले साल हुए उनके बेटे के विवाह की खबर अखबार में सचित्र छपी थी। लेकिन मैं तो धरती के इस सुदूर उत्तरपूर्वी छोर में भी भारतीय हस्तकला देख कर अभिभूत थी। ❑

फूलों पर मोहित जापानी मन

– प्रभा मित्तल

फूल तो कुदरत की वो नियामत हैं जो हर बुझे मन को खिला देते हैं। बियाबान में खिला जंगली आक भी बहार का आनन्द देता है। भारत में सरसों फूलते ही बसंत की मस्ती का आभास होने लगता है और फागुन आते–आते तो टेसू, सेमल और महुआ की महक मदमस्त कर देती है। पर जो भी हो जापान के पुष्प प्रेम का कहीं कोई सानी मिल पाना मुझे तो नामुमकिन ही लगता है। देश के किसी भी हिस्से में कोई फूल खिलते ही राष्ट्रीय समाचार बन जाता है।

मुझे आज तक याद है कि १९९६ में पहली बार जापान आते ही फरवरी में एक भारतीय परिवार ने उमे का फूल देखने जाने के लिये आमंत्रित किया। सच कहूँ उस समय फूल देखने से अधिक अनजान देश में भारतीय परिवार के साथ पिकनिक का उत्साह अधिक था। लेकिन उद्यान पहुँचकर एक फूल को देखने उमड़े जापानियों के हुजूम ने हैरान कर दिया। फिर शुरू होता है साकुरा का इंतज़ार। दिन–प्रतिदिन टेलीविज़न पर, अखबारों में अनुमान आने लगते हैं कि कब कहां पहला साकुरा खिलेगा। योजनाएँ बनने लगती हैं कि कब किसके साथ कहाँ हानामि होगी (फूल देखना)। शुरू में लगता था कि ये क्या पागलपन है, पर जब खुद साकुरा आच्छादित पेड़ों के नीचे बैठने का अवसर मिला तब अहसास हुआ कि यह पागलपन नहीं, प्रकृति से जुड़े रहने की बेसाख्ता चाहत है। यह जुनून सिर्फ उमे या सकुरा की बहार तक ही सीमित नहीं है। घर से स्टेशन तक के पैदल सफर में मोगरे और चमेली की खुशबू भी सहसा ठिठक जाने पर मज़बूर कर देती है। जापान में उनके नाम और किस्म भले ही अलग हों खुशबू तो जानी–पहचानी लगती है। फूलों से प्यार इस हद तक है कि किस्से–कहानियों और कविताओं से लेकर जापानी व्यँजनों, खासकर मिठाईयों में उनके रंगों और गंध का अहसास बसा रहता है। अपना अनुभव तो यही कहता है कि बाग–बगीचे हों या नदी–नहर का किनारा या बाज़ार हर जगह तरह–तरह के खिले–अधखिले फूलों की रौनक इस बेहिसाब भागते–दौडते देश में तन–मन को ऐसा सकून देते हैं कि शब्दों में ब्यान कर पाना कम से कम अपने वश में तो नहीं है। ❑

आदर्शों के प्रति श्रद्धा और कर्त्तव्य के प्रति लगन का जहाँ भी उदय हो रहा है, समझना चाहिए कि वहाँ किसी देवमानव का आविर्भाव हो रहा है।

अच्छाइयों का एक–एक तिनका चुन–चुनकर जीवन भवन का निर्माण होता है, पर बुराई का एक हलका झोंका ही उसे मिटा डालने के लिये पर्याप्त होता है।

हरी-भरी वादी, झाड़ू नदी और तप्त कुंड की त्रिवेणी

– अखिल मित्तल

क्यूशू के बेप्पू शहर में जापान के नरक यानि जिगोकु देखने और तप्त कुंड यानि ओनसेन का आनंद लेने के बाद मन प्रकृति की गोद में ओनसेन का आनंद लेने को मचल रहा था। कुछ व्यस्तता और कुछ जापानी भाषा की अज्ञानता ने कदम बाँधे रखे। फिर यकायक ईश्वर ने सुन ली। भला हो कुछ जापानी मित्रों का जो तोक्यो से दो घंटे के सफर पर ले गए। शुरू में आशंका थी कि न जाने अपनी मुराद पूरी होगी या नहीं, लेकिन शियोबारा पहुँचते ही सारी आशंकाएं आश्चर्य में बदल गईं।

आधी रात, बादलों से झाँकता पूनम का चाँद, पेड़ों का झुरमुट और पैरों के नीचे, धरती की कोख से निकलता तप्त जल। सोचा ऐसा स्वर्गिक आनंद भूतो न भविष्यति। पर कुदरत के खेल निराले, मानुस का अज्ञानी मन क्या जाने। हरित ग्राम की काठ की कॉटेज में रात कब कटी भान ही न हुआ। पर्वतों की गोद में बैठी घाटी में शीतल मंद पवन ने तन–मन ताज़ा कर दिया। कलकल बहती होकिगावा यानी झांडू नदी के किनारे खड़े होते ही हरिद्वार में गंगा तट पर बीते बचपन के भोर के पल याद आ गए।

पहाड़ी पगडंडी पर सैर को निकले तो नदी की कलकल दहाड़ में बदलने से पहले तट पर ही तप्त जल उबलता दिखाई पड़ा । ज़रा सा आगे बढ़े तो बाँस और देवदार के आसमान छूते पेड़ों के बीच, कुछ भद्रजन आदिम अवस्था में तप्त कुंड में विश्रामित थे। पहले तो भारतीय मन कुछ सकुचाया फिर ध्यान आया कि इसी आदिम स्नान का आनंद लेने को तो हम तरस रहे थे। चार कदम दूर पग स्नान की जगह देख कदम प्यासे घोड़े की तरह अड़ गए। पाएँचे ऊपर चढ़ाकर आसन जमा लिया। लगा वर्षों की संचित थकान उस तप्त कुंड में तिहोरित हो रही है।

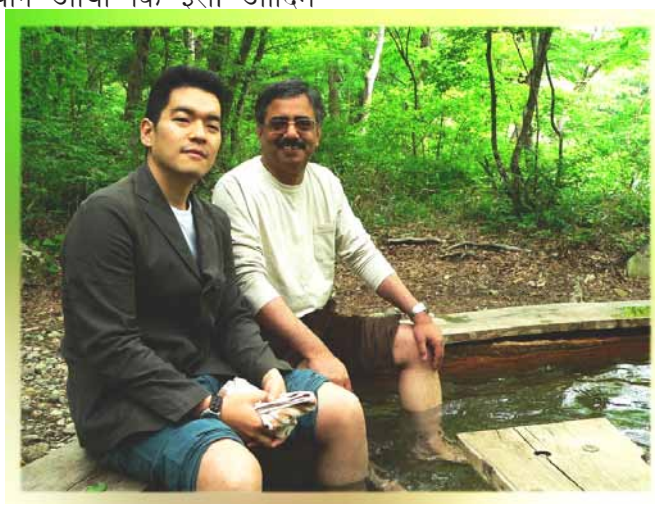

फुर्सत से पग स्नान के बाद आगे बढ़े तो पहाड़ी की कोख से निकलते उबलते पानी से लबालब भरता एक और तप्त कुंड दिखा जो नदी के ठिठुराते जल को चुनौती दे रहा था । संकोची मन दिन दहाड़े, सड़क किनारे अनावृत होने से कतरा रहा था। तय हुआ कि रात में आएँगे, फिलहाल घूम–फिर कर अपने हरित ग्राम में पेड़ों की आड़ वाले तप्त कुंड से ही संतोष किया जाए।

घूमते–फिरते, एक पहाड़ चढ़े, नदी किनारे आकर्षक जापानी रेस्तराँ में जापानी भोजन का आनंद लिया और अपनी कुटिया की तरफ लौट चले। रास्ते में अहसास हुआ कि ३०–४० मिनट के पैदल रास्ते में कोई दुकान, मॉल, बाज़ार और जापान की पहचान २४घंटे खुला, सुविधा स्टोर भी नहीं मिला। कुछ आश्चर्य के साथ सुखद संतोष भी हुआ कि जापान में भी लोग इस सब के बिना जी लेते हैं।

रात को खुले आसमान के नीचे नदी किनारे तप्त कुंड में स्नान का अरमान आलस्य की भेंट चढ़ गया लेकिन जापानी मित्र ने वायदा लिया की भोर होते ही चलेंगे। भोर हुई और हम निकल पड़े अपना अरमान पूरा करने। उस समय भी तप्त कुंड में चार–छ: स्नानार्थी मौजूद थे। हमने भी सारे संकोच त्यागे और आदिम अवस्था में उतर गए तप्त जल में। धरती की कोख से उफनते निर्मल जल में गंधक की गंध भी आचमन लेने से नहीं रोक सकी। जल की धार से चट्टान के बीच बने गड्ढे को हमने अपना बाथ टब बनाया और समाधि लगा ली।

अब न आसपास से गुज़रते लोगों का संकोच रहा, न समय का बोध। ये समाधि नहीं तो और क्या है? समय का पहिया किसी समाधि के रोके नहीं रुकता। हमें भी उस कुंड से निकलना ही था, पर इस अनुभव से ये गुत्थी हमेशा के लिए खुल गई कि जापानी बंधुओं को तप्त कुंड यानि ओनसेन स्नान इतना प्रिय क्यों है और उस समय आदिम अवस्था में आना विचलित क्यों नहीं करता। असल में ये महसूस करने की बात है कहने–सुनने की नहीं। बड़ी पुरानी कहावत है कि आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, पर हमने तो शियोबारा के नैसर्गिक ओनसेन में सदेह स्वर्ग का आनंद ले लिया। ❑

अमरात्मा

- शुक्ला चौधुरी

गीता में यह पढ़ा था कि "**मनुष्य मरने के बाद शरीर त्याग देता है, मगर आत्मा अमर रहता है, जो कभी नहीं मरता।**" यह कहा जाता है कि केवल तृप्त आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है, और अतृप्त आत्मा भटकता रहता है। जिस शरीर को मरने के बाद ठीक तरह से सत्कार नहीं किया जाता, वह आत्मा भटकता रहता है।

यहाँ जापान में आकर बोन उत्सव देखकर और उत्सव के बारे में सुनकर मुझे लगा की यहाँ के लोग भी

हमारी तरह अमरात्मा पर विश्वास करते हैं। बोन उत्सव में जापानी लोग अपने पुर्वजों की आत्मा के शान्ति के लिये प्रार्थना करने उनके समाधी पर जाते हैं। उत्सव के दौरान इधर–उधर नाच गाना चलता है जिसे "बोनोदोरी" कहते हैं। वहाँ हर उम्र के लोग, बच्चों से लेकर वयस्क तक सभी मिलजुल कर नाच गाना करते हैं। मुझे भी यह नाच देखने का मौका मिला। मैदान के बीचोंबीच ऊँचा सा दो तीन परत का मँच बना था जिसके सबसे ऊपर के परत पर बच्चे ढोल बजा रहे थे, कोई गाना गा रहा था, उसके नीचे कुछ लोग किमोनो पहन कर नाच रहे थे। और सबसे नीचे मैदान में मँच के चारों ओर जिसका भी मन चाह रहा था वही आकर नाच रहे थे। वहाँ मेरे दामाद और नाती ने भी नाचने में योगदान दिया। वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था। गाने का धुन बहुत मधुर था। सभी उत्सव का बहुत आनन्द ले रहे थे। छोटे–छोटे बच्चे भी किमोनो पहन कर कुछ खा रहे थे और कुछ खेल रहे थे। यह बोन उत्सव देखकर मैंने यह महसूस किया कि देश हो या विदेश हो सभी आत्मा का पूजन करते हैं। जापान का यह उत्सव, और उनका अमरात्मा पर विश्वास देखकर एक घट्ना मुझे याद आ गया.....

यह कुछ साल पहले की बात है, मैं कुल्लू का दशहरा देखने, कोलकाता से कालका मेल में रवाना हुई थी। कुल्लू का दशहरा देशभर में बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ लोग दूर दूर से दशहरा देखने के लिये आते हैं। ट्रेन के कमरे में धीरे धीरे कुछ लोगों से परिचय हुआ। हमलोग एक दुसरे से बातें करते हुए जा रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि उनसब से पहली बार मिल रही थी। पता चला कुछ लोग "गया" जा रहे है। अपने पूर्वजों की आत्मा के शान्ति के लिये तर्पन् करने। कुछ मेरी तरह कुल्लू के दशहरे का आनन्द लेने जा रहे थे। और कुछ दिल्ली और चण्डीगढ़। सबसे बातें करते हुऐ सफर में बहुत सी घटनाऐं सुनने को मिल रहीं थी। यह घट्ना मेरे पास बैठी महिला, जिसका नाम माधवी था उसने बताया, जो दिल्ली जा रही थी। उसकी बातों में सच्चाई थी, जिसे सुनकर मुझे भी अमरात्मा पर विश्वास होने लगा।

उन दिनों माधवी के पति को नौकरी के बदली के सिलसिले में दिल्ली जाना था। इसलिये वे सपरिवार दिल्ली जा पहुँचे, वहां एक किराये का घर लिया। गेट से घुसते ही, दाहिने तरफ का घर किराएदार का था और बाएं ओर का, मकान मालिक का। घर में घुसते ही वह कुछ देर के लिये अवाक हुई, एक बड़ा हॉल, पीछे एक छोटा कमरा, और रसोई, वहां से निकलो तो आंगन, इतना बड़ा घर इतने कम किराए में! पास वाला छोटा सा घर मकान मालिक का था। वह सोचने पर मजबूर हुई, क्यूँ मकान मालिक खुद इतने छोटे घर में रहकर, इतने कम किराए में बड़ा घर उनको दे रहे हैं। फिर दिन गुज़रने लगा,माधवी ने अपना घर सजा लिया। दिन के समय जब बच्चे स्कूल जाते और पति दफ्तर, वह घर में अकेली रहती थी। एक दिन दोपहर के समय सब कामकाज खत्म करके जब वह लेटी थी, तो किसी ने आंगन के तरफ का दरवाज़ा खट्खटाया। वह उठकर देखने गई पर वहां कोई न था। वह जा कर लेट गई। फिर एक दिन वैसे ही किसी ने खट्खटाया, दरवाज़ा खोला तो फिर कोई नहीं..... अब उसके मन में थोड़ा डर लगने लगा कि कौन आंगन कि ओर का दरवाज़ा बारबार खट्खटा रहा है, पर दरवाज़ा खोलने पर क्यों सामने नहीं आता। उसने अपने पति को बताया, तो पति ने उसे दरवाज़ा न खोलने की राय दी। अब दो तीन बार और किसी ने दरवाज़ा खट्खटाया पर उसने नहीं खोला।

कुछ दिन बीते....., उस दिन जब वह कपड़े सुखाने छत पर गई, हमेशा छत के कोने में जो छोटा सा चारपाई पड़ा रहता था, उसपर एक वयस्क आदमी सफेद धोती

पहनकर लेटा था, जो इतने लम्बे कद का था कि उसका पैर चारपाई से बाहर लटक रहा था। उसने एक बार के लिये सोचा की हो सकता है, मकान मालिक का कोई रिश्तेदार छत पर आकर लेटा है। मगर उसके छत पर क्यों? यह नहीं हो सकता। माधवी साहस जुटाकर उनके पास गई और पूछा, "आप कौन हैं? बाहर का गेट बन्द है फिर आप अन्दर कैसे आए?" वह वयस्क आदमी, उठ कर बैठे और बोलने लगे कि "मैं इस घर का मालिक था, मुझे अब यहां आने से कोई नहीं रोक सकता, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ।" यह सुनकर वह कुछ ठीठक गई, तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, "मेरे पास बैठो, और मेरी बात मन लगाकर सुनो,"तो माधवी बैठ गई, वे फिर बोलने लगे, "मैं यहां अकेला रहता था। एक बार मेरी तबियत बहुत खराब हुई तो मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद हो गया। कभी–कभी पड़ोसी कुछ कुछ खाने को दे जाते थे तो खा लेता था, धीरे–धीरे वह भी बन्द हो गया। फिर यह चारपाई ही मेरा साथी रह गया। करीब एक साल बाद मेरे दूर के रिश्तेदार ने आकर मेरी अस्थियाँ देखीं, तो उसने उठाकर मुझे पानी में बहा दिया और मेरा सब सामान पास वाले खाली ज़मीन में एक आम के पेड़ के नीचे दबा दिया। फिर यह घर बेचकर पैसा लेकर चला गया। उसने ठीक से मेरा अन्तिम संस्कार नहीं किया।" फिर उसने पूछा "क्या तुम मेरी आत्मा की शान्ति के लिये पूजन कर सकते हो? मेरे पास बहुत धन दौलत है।" माधवी ने पूछा "कैसे, और कहाँ।" उस वृद्ध आदमी ने बताया "जिस ज़मीन में मेरा सब समान सन्दूक में दबाया था, उसके अन्दर एक थैली में बहुत से मोहरें हैं। तुम उसे निकाल कर, मेरे लिये पूजन करोगी, तो मेरी आत्मा को शान्ति मिलेगाा। तुम करोगी ना? अब माधवी थोड़ा सोचकर बोली, "हाँ, जरूर मैं पूजा करूंगी।"

फिर वह सीधे मकान मालिक के घर पहुँची पूछताछ करने के लिये, उनलोगों ने बताया कैसे, और किससे उन्होंने वह मकान खरीदा था। जब वे लोग मकान में घुसे थे, तब वह चारपाई एक कमरे में ही मौजूद था। जो भी उसपर सोता था, उसको रात में कोई नीचे उतार देता था। तंग आकर उन्होंने चारपाई उठाकर छत पर रखवा दिया था, और दिवार पर एक चित्र भी टंगा था, जिसे तहखाने में रखवा दिया था। अब माधवी ने वह चित्र देखना चाहा, तो मकान मालिक तहखाने से चित्र उठाकर लेकर आए। चित्र देखकर माधवी के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई। उसने लपक कर उनके हाथों से तस्वीर लिया और बोली कि "छत पर यही थे, मैंने इनसे ही बात किया था। इसका मतलब उस वृद्ध आदमी ने जो भी बोला, वह सत्य है। मगर पास वाला ज़मीन तो अब खाली नहीं है, उसपर किसी का घर बन गया है। अब क्या करें?" मकान मालिक ने बोला "चलो पड़ोसीयों से बात करके आते हैं।"

सब मिलकर पास वाले घर में गए, उन्हें सबकुछ विस्तार से बताया, तो वे बोले "हां, एक आम का पेड़ पिछवाड़ में है।" जो उनके मकान बनाने से पहले से था। उन्होंने वहां खोदने की अनुमति दे दी। अब सभी मिलकर पड़ोसीयों के घर के पीछे गए, और खोदना आरम्भ किया, ४–५ फुट खोदने पर ही उन्हें एक सन्दूक मिला, सबने मिलकर उसे खोला, बहुत से कागज़ादों के साथ उन्हें मोहरों का थैला भी मिला। फिर माधवी ने सब आसपास के लोगों को बुलाकर, उस वृद्ध आदमी के कहे अनुसार, उनकी आत्मा की शान्ती के लिये बहुत बड़ा पूजन किया। बहुत लोगों को बुलाकर भोजन कराया, उसके बाद वह बहुत साल तक उसी मकान में रही मगर फिर कभी कोई परेशानी नहीं हुई।

माधवी की यह घटना सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि आत्मा अमर है। जो कभी नहीं मरता। ❑

– सद्व्यवहार में शक्ति है। जो सोचता है कि मैं दूसरों के काम आ सकने के लिये कुछ करूँ, वही आत्मोन्नति का सच्चा पथिक है।

– जीवन के आनन्द गौरव के साथ, सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ जीने में है।

– हम क्या करते हैं, इसका महत्त्व कम है; किन्तु उसे हम किस भाव से करते हैं इसका बहुत महत्त्व है।

"साकुरा-साकुरा"

(जापान के प्रसिद्ध गायक एवं गीतकार "ताओतारो मोरीयामा" के गीत का भावानुवाद)

- सुरेश ऋतुपर्ण

ओ मेरी अंतरंग!
फिर मिलेंगे एक बार
वहीं, उसी राह पर
बिखरे हैं जहाँ साकुरा के फूल!

यही तो दिया था वचन
विदा होने से पहले कि
फिर मिलेंगे ज़रूर।

ओ मेरी अंतरंग सहचर!
मैं हाथ हिलाते
नतसिर लूँगा तुमसे विदा
अपने इस शहर की गलियों में
खो जाने से पहले
जिन्हें हर ओर से
साकुरा के फूलों ने घेरा है।

जाने कितने अच्छे और बुरे दिनों के ताप में
तप कर निकले हैं हम!
लेकिन तुम्हारे होठों पर
मैंने देखी है केवल मुस्कान!

और जब काल, मुझे खींच लेगा
ज़मीन की गहराईयों में
तब उन कुंदन तपे दिनों की याद
भर देगी मुझमें असीम ऊर्जा
कि मैं धुन्ध में डूबी गहराईयों के आर-पार
पहचान लूँगा उस अनाम धुन को
जो हमारे होठों पर
रह-रह कर थिरकती थी।

साकुरा, साकुरा
कैसे लिपटे हैं शाखों से ये फूल
शायद जानते हैं
बिछुड़ने का क्षण नहीं है दूर।
फिर भी हवाओं के क्रूर थपेड़ों को सहते
कसकर थामे हैं एक-दूसरे को

अलविदा!
अलविदा ओ मेरी सहयात्री!
आ गया है वह मोड़ अब हम निकल जाएँगे
दिलों में सँभाले एक-दूसरे की याद
दूर जाती उस अनजान डगर पर।
पर जाने से पहले
कह देना चाहता हूँ वे शब्द
जिन्हें कहने के लिए
तरसता रहा हूँ न जाने कब से
ओ मेरी अंतरंग मित्र!
मेरा प्यार और मेरी शुभाकांक्षा
चलेगी तुम्हारे साथ लगातार।

मैं जानता हूँ
शहर की ये हड़बड़ाती भागमभाग
हमारे साथ समानान्तर चलती है
और उधर साकुरा के
खिले फूलों की पंखुरियाँ
शाखों से बिछुड़ रहीं हैं
इस उम्मीद के साथ कि फिर जन्म लेंगे।

इस विदा बेला में
आँसू न बहाना ओ मेरी अंतरंग मित्र!
मैं तुम्हारे सुर्ख नर्म होठों पर
देखना चाहता हूँ वही मुस्कान
जो तुम्हारी पहचान है

देखो!
शहर की झिलमिलाती रोशनी में
नहाते हुए
आकाश के आँगन में
नाच रहीं हैं
साकुरा की झड़ती पंखुरियाँ

विदा.....
ओ मेरी अंतरंग मित्र.... विदा.....
पर इस विश्वास के साथ
कि फिर मिलेंगे
ऐसे ही..... इसी राह पर
जहाँ बिखरी हैं
सकुरा की पंखुरियाँ

हाँ फिर मिलेंगे
नहीं है यह चिर–विदा.....
फिर मिलेंगे.....

ओ मेरी अंतरंग मित्र
फिर होगा मिलन
पूरा करेंगे फिर हम अपना वचन।

मैं दूर देश क्यूँ जाता हूँ?

– अनुराग पांडेय

समय समय के अनुसारों में,
निश दिन फँसता मझधारों में।
अविरत पतवार चलाता हूँ ,
माँ मैं दूर देश को जाता हूँ।

रंग उत्सव की मधुर है बेला,
मैं इस पार नितांत अकेला।
सिर्फ श्वेत श्याम रह जाता हूँ,
माँ मैं दूर देश को जाता हूँ।

वहाँ रोचना राखी टीका,
इधर मेरा उल्लास भी फीका।
रेशम के तारों से खींच भी नहीं मैं पाता हूँ ,
माँ मैं दूर देश को जाता हूँ।

दूर दीवाली की झिलमिल से,
शांत सूक्ष्म से काठ के घर में।
एक दीप मैं भी जलाता हूँ,
माँ मैं दूर देश को जाता हूँ।

वो बहना के हाथ की मेहंदी,
अपना हो घर का सपना।
अर्थ जगत में पिसता जाता हूँ ,
माँ मैं दूर देश को जाता हूँ।

मैं पाषाण नहीं हूँ माता,
वर्षपूर्ण एक ही अवसर आता।
पितृ चरणों को जा छू पाता हूँ,
माँ मैं दूर देश को जाता हूँ।

प्रियजनों की बुझती आँखें ,
दरवाज़े की ओर ही ताके,
.....
क्या देख नहीं मैं पाऊँगा,
क्या मिल भी नहीं मैं पाऊँगा
.....
मैं दौड़ा भागा जाता हूँ ,
मां मैं दूर देश को जाता हूँ।

माँ मैं जल्दी आता हूँ.....
माँ मैं जल्दी आता हूँ.....

कुछ रंग इधर उधर के

– मोहन चुटानी

1. चेरी ब्लोसम की बहार
हानामी का खुमार
साकुरा के प्यारे रंग

2. गर्मियों की उमस
सिकाडा की तड़प
फुहार का इंतज़ार

3. फूजी सान की चढ़ाई
तना हुआ सीना,
श्वेत बादलों की झालर में उलझा सा

4. मात्सूरी के मेले
किमोनो में सजी किशोरियां
हाथ में पंखे हिलाती, इतराती हुईं

5. पतझड़ के लाल पीले रंग
ठूंठ वीरानगी के जश्न
बर्फानी हवाओं को, गिर के सलाम

6. सर्द बर्फ हवाएं
धरती सोती श्वेत चादर तान करू
सूर्य की किरणे भी ठंडी सी लगतीं

कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो

– सुनीता पंघाल

ना मैं तुम्हें हूँ जानती, ना तुम्हें मेरी पहचान है
पर बात बनती जाएगी
कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो
ज़िन्दगी के रास्ते, लम्बे भी हैं मुश्किल भी हैं
अकेले थक भी जाऊँ, शायद डर भी जाऊँ मैं
पर रास्ते कट जाएँगे
कुछ मैं चलूँ कुछ तुम चलो

दुनिया में हैं लाखों गम
रोने से हासिल हो क्या
हर दर्द भी मिट जाएगा
कुछ मैं हसूँ कुछ तुम हसों
हर बात बनती जाएगी
कुछ मैं कहूँ कुछ तुम कहो।

融和にむけて
Building Harmony

吉田美紀　Yoshida Miki

インドを訪れるといつも胸に浮かぶことがある。「インドはカラフル。」

色彩だけでなく、その多種多様な文化をカラフルと表現するのが良さそうな気がするのだ。言語、食べ物、衣服や日常生活。日本に比べるととてもexplicitな多様性を感じる。私は、様々な機会で40を超える国を訪れたが、その中には多種多様な文化を持つ国がいくつもあった。ある時は感動し、ある時は戸惑いながら、生活し、通過して来たが、そんな中で感じたことを、つれづれなるままに、綴ってみたいと思った次第である。

私にとって興味深かったのは、あくまでも個人的な観察なのだが、多様な文化を持つ所では、全体としても、多様性を構成する一つ一つの要素も、強い個性を備えている所が多いことだった。多様性の中で自分とは異質なものに触れる機会が多い所は、異質のものを受け入れる許容度が高いのかなあと当初想像したが、その半面、多様な中で強い個性の文化を持つ環境では人の自我も強くなるのか、現実では互いに合い入れるのが難しいことも多々あるだろうという思いも起きた。個性の強いものが多種多様に存在する中では、自分を護るためには、それが必要な人生の術なのか。極楽トンボの呟きかもしれないが、この多様性がぶつかって消耗するのではなく、融和していけば、大きなエネルギーになる、世界も平和になるなあ、と常々思うのである。

先日お寺でこんな話を聞かせて頂いた。融和というテーマだった。

命あるもの、すべて個性がある。色で表現すれば、青い色の人や、赤い色の人、紫色の人がいたりする。融和というのは、それらの色を一つの色にすることではなく、また自分の色と同じ色に上塗りしようとすることでもない。それぞれの色が一番輝く中に、ハーモナイズしていくこと、と。これはすごいな、と思った。どうしたらそんなことができるのだろう。そう言えば、様々な国からの移民が暮らすアメリカは、かつて「アメリカは、異なるものの”melting pot”」という表現をしていた。それが、melting　potではなく、ジグゾーパズルという表現に変わった。異なるものが溶けて一つのものになろうとするのではなく、様々な色や形をしたピースがぶつかり合わず、うまくフィットしていくという意味だと思う。

私は、仏教のお寺で在家の修行をさせて頂くようになってから29年になる。師と仰ぐのは、伊藤真乗という大阿闍梨であるが、真乗は仏教史に残る大僧正であるだけでなく、昭和の仏師とも言われ、「衆生の心にみ仏を刻む」祈りの中、自ら数々の仏像を謹刻し、その芸術性と宗教性を共に高く評価されている。その真乗の仏像展が3年ほど前に、東京から出発し、アメリカ、ヨーロッパの都市で行われた。ニューヨークでの仏像展の時だったが、かつて米国大学院での同級生でニューヨーク在住のアメリカ人の友人が、仏教のことをもっと知りたいと言っていたのを、ふと思い出した。展覧会期中、meditationのセッションもある。彼女に久しぶりにメールをすると、是非行ってみたいと言う。が、一人では気遅れしているようだ。そこで私はニューヨークに向かった。

仏像展を訪れた翌日、二人でmeditationのセッションに行った。場所はマンハッタンのかつての倉庫街がおしゃれな街に変身したソーホー。そこに展覧会期間中、meditationができる場所が設けられていた。会場はいくつかのセクションに区切られており、meditationの場所の他にもライブラリーがあったり、ビデオが見られるようにもなっていた。一緒に行った私の友人は各種注文の多い人で、座った時も座布団を借りたのだが、その向きが座りにくい等、いろいろ言って、指導に当たって下さるお坊さんが、彼女が座りやすいように気を配ってくださった。Meditationが始まった。目を閉じると、会場の来訪者の声や、ビデオの音などが耳に入ってくる。「ああ、きっと彼女は、こんなに音が聞こえるんじゃ集中できない、とまた文句を言うだろうなあ」と思ってドキドキしてしまった。すると、指導のお坊さんの声が聞こえてきた。「皆さん、目を閉じて静かにすると、外のいろいろな音が聞こえてきます。人の声や、ざわめき。この中で祈り、自己を見つめていくことは難しいですか。そうですね。でも、考えてみましょう。私達の日常生活の中で、まったくの静寂な時がどれだけあるでしょう。いろいろな雑音が周りにあります。雑音とは、批判される言葉や、聞きたくない言葉を言わることであったり、誤解されたり、思わぬ問題が起きたり、諸々のことがあります。でもそれが現実だということ、そこで生きることだということも良くわかっておられますね。その中で祈っていける自分になっていくことが大切なのです。さあ、この中で今日はやってみましょう。深く見つめていけますか。」と。彼女はいたく納得したようだった。

日常生活には、本当に様々な雑音がある。多種多様な文化の国では、一層多種多様な雑音があるだろう。個性の強い文化では、強い雑音もあるだろう。その中で、融和を実現していくにはどうしたら良いだろう。先ほどのお寺での話に戻る。その話は、こう続いた。

「己を少し滅していくことができますか」と。ここで私は、己を滅するとは自分を失ったり、全てに妥協するという意味ではないと受け取った。滅するとは、自分の感情を少し譲ることもあろう。自分の時間を他の為に使っていくこともあろう。日常生活で、自分の好みと異なる人の意見も「それもあり」と受け入れていくこともあろう。各個人がそれぞれの色（性格）を持っているのだから、違いは存在する。その中で、異なる色も互いに少し認め尊重してみるのは可能だと思うのだ。とは言え、生身の人間、一挙に己を滅していくのは至難の業。でも、「少し」滅することは、まず第一歩でできる。そして、そう思うだけではなく、アクションとして行ってみようと思った。一歩前へ進むと、周囲の景色が変わるはず。見えなかったものも見えてくるはず。進まなければ、景色は変わらない。

世界の平和と幸せを願う一人一人が、それぞれ様々な色に輝く個性を持つ。カラフルなのは、インドだけではないかもしれない。様々な雑音に囲まれた日常生活の中で、己を少し滅することをトライしてみようと思う。その取

り組みを通して、来年のDurga Pujaには、少し人間の器が大きくなった自分であることを願っている私である。

Every time I visit India, it comes to my mind. "India is colorful."

I do not mean just about the number of colors I see, but also its language, food, dresses and the daily life, etc., and I feel it is best to express that it is "colorful". Compared with Japan, I feel in it the diversity in a more explicit way. I had chances to visit over forty countries so far and there were a good number of countries with great diversity among them. Sometimes positively amazed, sometimes perplexed, I have lived or traveled there. I felt like taking a liberty of freely sharing what came to my mind through that experience.

It was interesting to me, though it is limited to my individual observation, to find that the places with great diversity often had cultures with strong characteristics, in its entirety and in each element that forms the diversity. I imagined at fist that such places would have larger capacity to embrace differences. But on the second thought, I thought that, in reality, a diverse culture with strong cultural accent may naturally create stronger self consciousness in people and that it may be rather difficult to accept differences around. It may be a tactical measure of survival in life where many heterogeneous elements exist around with strong characteristics. It may sound like a tweeting of a happy camper, but I often think that it will be such a powerful energy and that the world will have more peace, if different pieces can harmonize rather than consuming energy out of conflict.

I listened to an interesting talk at a Buddhist temple the other day. It was about building harmony. All that are living have characters. It may be expressed by colors. There is an individual who is in color blue, in red, or maybe in purple. Harmony does not mean to make all these different colors into one, nor does it mean to override somebody else's color with my color. Rather, it is to create a harmonized co-existence with all these colors in a way that each color shines at its best. It was an eye opening concept to me and I was impressed. How can we make it happen though? I remembered then that the U.S. used to call itself a "melting pot" of heterogeneous elements", and eventually it has changed to call itself a "jigsaw puzzle". Rather than trying to melt differences into a homogeneous one, it rather tries to make all pieces of different colors and shapes just fit on the board.

It has been twenty-nine years since I started to practice Buddhism at a temple as a lay Buddhist. The master I highly respect is Shinjo Ito, a great Achari. Shinjo is not only a great abbot who is recorded in the history of Buddhism, but is also renowned as the "Sculptor of Buddha images of the Showa era". The spirit of his works was to engrave the Buddha nature in people's mind and his works are highly recognized for its artistic excellence and the religious impact. About three years ago, the exhibitions of Shinjo's Buddha sculptures were held, started in Tokyo and went to various cities in the U.S. and Europe. It was when the exhibition was in New York. I somehow thought about one of my American classmates from my graduate school in the U.S., living in New York, who was keen on learning about Buddhism. During the exhibition period, there would be a few sessions of meditation there. I sent her an e-mail after a long time. She replied that she definitely would like to go but a bit hesitated to go there by herself. So I flew to NY.

On the next day that we visited the exhibition, we went to the meditation together. The location was in Soho in Manhattan, once a warehouse area which had been turned into a trendy town. The place was divided in a few sections. Beside the meditation space, there were also a library and a place to watch videos. This friend of mine in NY tends to make various requests to meet her needs. When we sat down at the meditation, she borrowed a zabuton (Japanese mattress), tried to fit herself on it but couldn't do it comfortably. She was saying the height was not right, or the direction of the zabuton was not right, etc. The monk who was to guide our meditation kindly helped her so she could sit comfortably. The meditation started. As I closed my eyes, I heard various sounds in my ears, such as the voice of the visitors and the sound of video programs. I got nervous, worrying that she would say, "I can't concentrate with the sound like this…!" Then I heard the voice of the guiding monk. "Now everybody. When you close your eyes and sit quietly, you hear various sounds outside of this place. Voices of other people or the noise that you don't know from where. Is it difficult for you to meditate and reflect upon yourself in this circumstance? Maybe so. But just think… How much perfect tranquility do we have around us in our daily life? There are various noises around us. The noise – it may be the criticism somebody says about us, it may be the words that we do not want to listen to, or misunderstanding or it may be an unexpected problem. We also know that it is the reality and that we all live in there. It is important that we become able to see things correctly and reflect upon ourselves in such a reality. So, let's try today in this circumstance. Can you deepen your reflection upon yourself?" My friend seems to have highly appreciated what she just learned.

In our daily life, there are really various noises around us. A place with greater diversity will have more variety of noises. In a place where strong cultural accent exists, there may be a stronger noise. In such a circumstance, how can we realize the true harmony? Let me go back to the talk at the temple. It continued as follows. "Can you reduce your ego a little bit?" When I heard it, I understood "reducing my ego" does not mean to lose my "self" nor to totally compromise. I tried to reflect it on my daily life and tried to understand what it meant. It can mean that, when somebody says the words that irritates me, rather than emotionally reacting to it in return, at least I take a deep breath and try to understand what he/she wanted to achieve by saying it. It can mean to use part of my time for the benefit of others. It can also mean that I try to accept different thinking of others even when it is not in my taste. As each person has different color (nature), differences do exist. Yet, we can still harmonize by acknowledging and respecting the other while still in different colors. Having said that, however, it is not easy to reduce ego. But as the first step, I said to myself that I can reduce ego "a little bit", and put it into action rather than just thinking about it. When I move forward by one step like that, the scenery around me will change and I can see what I could not see before.

Each person who wishes the world peace and happiness has his/her own shining color. It may not be only India that is colorful. In the daily life that lots of noise may come around, I would like to try to reduce my ego a little bit. Through that effort, I hope that I will be a person of a bit larger capacity to embrace differences when the next Durga Puja comes around. ❑

里山保育へ向けて
Country-style Day Nursery

山田さくら Yamada Sakura

梅雨が明け、久しぶりの青空に喜んだのも束の間。朝から気温はうなぎ上りに上がり続け、ここ信州も30度以上の真夏日が何日も続く。

梅雨と言っても、しとしとじとじと降るのではなく、今までの常識を覆すほどの雨量で、日本列島は水浸し。あちこちで被害が続出。まるで、インドの雨期のようだ。この異常気象は、日本だけでなく地球規模であるのだが・・・・

＊　　＊　　＊

インドに住んでいた頃、ある友人が、日本四季折々の原風景の写真集と星野富弘の詩画集を貸してくれたことがあった。

それまで、ホームシックなど滅多にかかることがなかった私だが、それらを見ているうちに胸に熱いものがこみ上げ、涙が止まらなくなってしまった。

海や山に囲まれた自然豊かな日本。美しい四季の移り変わりをこよなく愛し、日本独自の文化を育ててきた。それらによって日本人の心は、どれほど豊かに健やかに育まれてきたことか！

そして、その時思ったのだ・・・日本人からあの美しい自然環境を取り上げてしまったら、一体何が残るのだろう、と。

日本人が古来より慈しみ愛しんできた豊かな自然環境を、ここ半世紀以上惜しげもなく破壊し続けてきた結果、日本人の心をも壊し無機的なものにしてしまった気がしてならない。

『各民族が各個人と同様に、今生にそれの中心となる一つのテーマを持っています。他のあらゆる旋律がそれとまじってハーモニーを形成しているところの、主旋律であります。いかなる民族であれ、もしその民族の活力すなわち幾百年も伝えられてわがものとなったところの一定の方向を投げすてようと試みるなら、その民族は死にます』

— Swami Vivekananda

私達、日本民族は一体どこへ行きたかったのか、行こうとしているのか？

その方向性の見えないこの国で、子ども達の将来を思わずにはいられない。

＊　　＊　　＊

先日、私が親たちの前でしゃべらせていただいた時の資料を一部引用してみよう。

子どもの「心育て」

例えば、野菜や米を作る時、まず土を耕したり肥料をまいたりして土壌作りをしなければ、良い収穫は得られません。それと同様に幼少期の「心育て」は、まさに子ども達の生涯のための土壌作りなのです。

1.　子育て環境の変化

	日本本来の子育て環境	現在の子育て環境
食生活	家庭料理・家族との食事	個食・孤食・固食
家族形態	大家族	核家族
地域との関わり	行事への参加・井戸端会議	孤立化
子供同士の関わり・遊び	群れて遊ぶ・身近に自然	ゲーム中心・自然破壊
社会全体のあり方	地域独自の文化・開放的	情報過多社会・閉鎖的

2.　母子関係と脳

◎　五感を介した親子のスキンシップ

①　視覚・・見つめ合う

②　聴覚・・抱っこの時の心音・子守歌・笑い声

話しかける（ゆっくり・抑揚がある・高い声）

泣き声・喃語

③　嗅覚・・体臭・おっぱいの匂い

④　味覚・・おっぱい・離乳食

⑤　触覚・・抱っこ・おんぶ・頬ずり・キス・入浴・添い寝

（日本の伝承育児文化―おんぶ・添い寝・手遊びわらべ歌などの利用）

「赤ちゃんにとって赤ちゃん時代というのは、五感でやりとりすることが真剣勝負であり、最も大切な仕事なのだ」トレバーセン（エジンバラ大学教授）

◎　心の免疫（バランスの取れた脳の発達）

①　規則正しい睡眠・栄養・運動

②　親子の十分なスキンシップとコミュニケーション

＊　物理的に母子の一定以上の接触時間が必要

（理想）生まれてから3才までは・・

10000時間（1日約8時間）それもゆったりとした

最低でも7～8才まで・・6000時間（1日2時間）

＊　時間的に親子が一緒にいられる時間の確保が困難なら

★　濃いスキンシップを一日一度は行う

＊　子どもの安心＝親子の情緒的信頼関係

↓↓楽しい・うれしい・心地良い・好きという感情

自立心を養う

③　安定した愛着関係を築く→基本的信頼関係の確立
④　子どもの時間（自然との触れ合い・友達との遊び）を過ごす
↓↓
感性をみがき、思いやりを育てる
⑤　理性を育て社会性を身につける

「家庭」は、子ども達のスタート台です。スタート台がしっかり安定して揺るがなければ、楽に一歩を踏み出し前進することができます。
でも、もしスタート台がグラグラしていたり壊れたりしていたら、最初の一歩がうまく踏み出せるかどうか不安で、安心感も得られず力も沸いてこないでしょう。
「子ども達は、未来の希望であり、明日（あした）の建設者である」この言葉を、私達大人は決して忘れることなく、心して付き合っていきたいものです。

＊　＊　＊

この資料の一部を読んでいただいてわかるように、子育てには、親子の濃いスキンシップが何よりも大切だということです。この国でごく当たり前に行われていた親子のスキンシップや営々と続いていた子育て環境が崩壊し、子育てを科学的根拠を交えて手取り足取り教えていかなければならなくなっているのが現状だ。

明治時代、日本を訪れた欧米人の日本の子ども達の印象は、どうだったのか・・・？
『わたしはこれほど自分の子どもに喜びをおぼえる人々を見たことがない。子どもを抱いたり背負ったり、歩く時は手をとり、子どもの遊戯を見つめたりそれに加わったり・・・・他人の子どもにもそれなりの愛情と注意を注ぐ』。
『日本人が非常に愛情深い父であり母であり、また非常におとなしくて無邪気な子どもを持っていることに、他の何よりも大いに尊敬したくなってくる』。
『なんとかわいい子ども。まるまると肥え、ばら色の肌、きらきらした眼』。
『どの子もみんな健康そのもの、生命力、生きる喜びに輝いており、魅せられるほど愛らしい』。
明治時代だけでなく戦前までは、おそらく前述のような光景は日本のあちらこちらで見られたに違いない。その頃は、子育ての本や講演会などまったく必要なかったはずだ。
戦後、敗戦国日本が独自の文化を惜しげもなく捨て去って、すっかり欧米化の道を辿ってきた結果が、現在のこの国の子育て事情にかなりの影響を及ぼしている気がする。
アメリカの社会問題を取り上げたドキュメンタリー映画「華氏911」のマイケル・ムーア監督が「日本が、どんどんアメリカ化していくと、暴力も増えるし、銃の数も増え、アホな人々も増えるだろう」と、言っているように、まさにその通りになってきている。離婚・虐待・ギャルママ（15～19歳未婚）の増加なども当てはまるだろう。

＊　＊　＊

ところで、里山保育「わっこひろば　宙そら」は、今場所探し真っ最中！地元のミニコミ誌に、メッセージを載せてもらったり、知り合った人たちに声をかけたりしながら、少しずつ輪を広げ、来年の4月開園を目指している。
戦前の環境に戻ることなどまず不可能だけれど、有り難いことに、まだ辛うじて自然環境が残されているここ信州大町近辺で、地域の人たちを巻き込みながら、この場所の実情に合った保育・子育てを目指して、子ども達の未来のため私達大人がしっかりと次世代への責任を果たしていきたいと思っている。
そして宙そらの理念が、あちこちに飛び火し広がっていくことを祈っている。 ❑

The rainy season is finally over, and we were enjoying the first fine weather in quite a while, but alas. The temperature continues to rise after sunrise, and even the Shinshu region is in the 30 degrees Celsius day after day.

You might imagine drizzling rain when you hear about rainy seasons in Japan, but this year it rained rather heavily, and the Japanese archipelago was drenched and soaked all around. There were damages everywhere. It reminded me of the Indian monsoon seasons. Although, this abnormal climate is global and not only limited to Japan…

＊　＊　＊

Back when I lived in India, a friend of mine lent me a photograph collection with sceneries of Japan from all four seasons, along with a collection of poems and paintings by Tomihiro Hoshino.

I had never been homesick before, but while flipping through these collections I was gradually overwhelmed with a sense of longing, and before I knew tears were flowing down both my cheeks.

Japan, bountiful with nature and surrounded by oceans and mountains- the Japanese people loved the passing of the seasons and nurtured a distinct culture revering nature. Oh, how the soul of the Japanese people have been brought up rich and sounds by the culture and Mother Nature!

This is when I thought… if we took away the beauty of nature from the Japanese, what would they have left?

I cannot help but feel that by destroying the natural environment that the Japanese had so affectionately loved and revered since ancient times, the souls of the Japanese have also been deteriorated and turned mechanical.

"Each nation or people like any individual hold on to a belief that is central to its existence. This belief forms the principal melody as it mingles and harmonizes with other prevalent tunes all around. However great a nation may be, if this source of

vitality that has been passed on for centuries and has become synonymous with its existence is willfully neglected and abandoned, that nation will eventually cease to exist." — Swami Vivekananda

Where did we, the Japanese people, want to head? Where are we actually headed? In this country where we cannot determine our course, I worry for my children's futures.

Let me quote from a material I recited in front of a group of parents.

Nurturing your child's mind

For example, you must first secure rich soil by cultivating the fields and sprinkling fertilizer in order to end up with a great harvest. Not unlike, nurturing your children's mind from infancy is cultivating the soil in order to secure a great harvest that is your children's lifetime.

1. The change in childrearing environment

	Original environment	Present environment
Diet, Eating Habits	Home cooked meals, meals with the family	Personal meals, Meals in solitude, Ready-made meals
Family Structure	Large, extended family	Nuclear family
Relationship with the Local Community	Participation in local events, housewives' gossip	Isolation
Relationship between the children; their amusement	Play in a group, easily familiarized with nature	Mainly electronic games, emphasis on natural destruction
Societal Structure	Culture unique to the community, very open	Excessive information, exclusive and unsociable

2. Mother-child relationship and the brain
   ◎ Personal contact between mother and infant using all five senses
      1. Sight – eye contact
      2. Hearing – mother's heartbeat heard when the baby is held, lullabies, laughter
         Talking to the baby slowly, intoned, high pitched
         Crying, babbles
      3. Smell ‥ body odor, the smell of mother's milk
      4. Taste ‥ mother's milk, baby food
      5. Touch ‥ being held, piggyback rides, nestling cheeks, kissing, taking baths, sleeping together
      6. (Japan's traditional childrearing culture — piggyback rides, sleeping together, games using children's song)

"For a child during infancy the most serious and important activity is the exchange with the world around utilizing all the five senses." – Trevarthen, University of Edinburgh.

◎ Emotional immunity Developing a well-balanced brain
   1. Well regulated sleep schedule, nutritious diet, and exercise
   2. Sufficient personal contact and communication between parent and child
      ＊ Certain amount of physical contact required between mother and child (ideal) from birth to 3 years of age,

10000 hours (8 hours per day) as relaxed as possible.
Until 7 or 8 years of age at a minimum‥6000 hours (2 hours per day)

★ If setting aside certain amount of time for parent-child communication difficult
★ Conduct very intimate personal contact at least once a day

＊ The child's peace of mind = emotional relationship of mutual trust between the parent and the child

↓ ↓ emotions such as fun, happy, pleasant, love

Foster self-reliance

3. Establishing a stable fondness → Establishing basic trust
4. Spending child time (interacting with nature, playing with friends)
   ↓ ↓
   By polishing sensitivity, encourage the child to be considerate
5. Foster reason and sociability in the child

The "household" if the starting block for the children. As long as the starting block is stable and unnerving, the child can easily step out and slowly advance.

However, if the starting block is slightly loose or broken, the first step will be very unstable, making the child anxious and depriving him or her of any will to keep going.

"Children are the hope of the future, and the architects of tomorrow." Us adults should constantly keep these words in our heart while we spend time with our young ones.

＊ ＊ ＊

As you can probably tell reading part of this manuscript, close and intimate personal contact between the child and the parent is a very important part of childrearing. The personal contacts and childrearing environment that had been normal in this country has slowly deteriorated, and now we are required to teach childrearing step by step while explaining the scientific reasoning behind every action.

During the Meiji era, what impression did visiting Westerners have of Japanese children…?

"I have never seen people so fond of their own children. They hold them and let them ride on their shoulders, holding hands while walking, watching the children's games or even taking part… they show love and consideration regardless of whether they are their children or not."

"The Japanese are very loving fathers and mothers, and the children are very meek and innocent – for these reasons I feel a strong sense of respect for these people."

"How cute the children are. Completely plump with rosy cheeks, their eyes continuously sparkling.."

"Every child is healthy, radiating with life and its happiness, and this is charming to the point that it completely fascinates me."

Such scenes as described above were probably very common in Japan not only during the Meiji era but also up to the Second World War. How-to books and classes for childrearing must have been useless during those times.

I feel that the complete Westernization and loss of its cultural identity that Japan followed after its loss in the Second World War is to be blamed for the childrearing situation in the present.

Michael Moore, known for his satirical documentary of America's societal issues, "Fahrenheit 911", said "If Japan continues to Americanize, there will be more violence, more guns, and more stupid people", and frankly, I believe he is right. Divorce, child abuse, and young teenage mothers can all probably fit in to those categories.

＊　　＊　　＊

On another note, 里山保育「わっこひろば　宙そら」is right now looking for a place to set up! By entering ads in the local magazine and by advertising to people we have met, we are slowly increasing our circle of friends and hope to open a nursery school by April next year.

Reverting back to the ways before the Second World War may be impossible, but fortunately here around Shinshu-oomachi nature is still largely preserved. By rounding up and winning the cooperation of the locals, I wish to set up the ideal child nursing environment for this local area, and hence fulfill our responsibility for the future of our next generation.

And ultimately, I hope 宙そら's ideal will spread all over this country, and beyond. ❑

My Room

- Sneha Kundu, Grade II

Recently I have shifted to a new house. For the first time I have got a room for myself only. I feel so happy to play in my room, to read storybook and do whatever I want. In my room there is a white bed looking like Snow White's bed. When I enter my room and sit on my bed, I feel like I am Snow White. Mostly I love the place where I sit in front of my study table. When I sit in that place I can see all the people going and coming in the super market beside our home from a big window. Sitting over there, I spend my time thinking about fairy tales and looking around the place but I get my senses back when my mother yells at me for not doing any work. Oh God, it is written Sneha's room outside, still why can't I do whatever I like here at least. ❑

PUZZLES

Crossing River

Four adults, each weighing 60 kg, want to cross a river to attend Durga Puja festival celebrated on the other side of the river. The river is very deep and unfortunately nobody could swim, so they were waiting near the river bank for help. Suddenly they saw two kids rowing a boat; they asked the kids if they could help them to cross the river. The kids said, " our boat is very small, it can carry only 60 kg at a time, both of us are 30 kg each, so how can we help you in crossing the river in this boat?" One of the adult said, "Don't worry, we will solve this problem."

Do you know how all of them crossed the river in that small boat?

Counting Triangles

How many triangles are there in this figure?

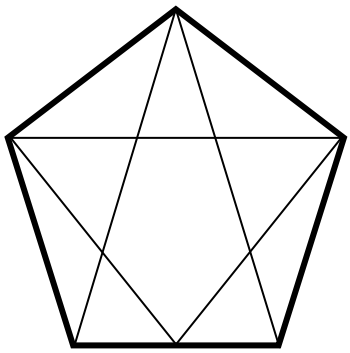

My trip to Universal Studios Japan

- Shubhankar, Grade III

On the 15th of May 2010 we visited the UNIVERSAL STUDIOS in Osaka. I was really looking forward to this trip. We took the Shinkansen Nozomi 700 Super express to Osaka. We reached the Universal Studios in a colorful Universal Studios train. After the entrance there was a huge rotating Globe surrounded by mist and UNIVERSAL written around it.

I felt very excited to see so many rides and shows. The first show we saw was Shrek's 4D Adventure. It was amazing because it was like we were part of the story. Then we took the ride Space Fantasy. After that we took many other rides and shows.

The rides I loved most were Space Fantasy, Spider man, Jurassic Park, Back to the Future, Jaws and The Hollywood Dream Ride. Hollywood dream ride is a flying roller coaster and you can choose your own music! The first fall was very steep and we felt like we will come out of our seats. It was very thrilling and everyone was shouting. My Dad told me to shout so I would not feel scared.

After some time it was time to go home. I had enjoyed my day a lot and was very sad to leave Universal Studios. Hopefully we can go there soon again. ❑

Mystery of the Golden Statue

- Nishant Chanda, Grade IV

As Robin and Sam were on their morning walk towards the Museum of Golden Artifacts, Robin sipped up the last bit of his orange juice from his bottle; he threw the P.E.T. bottle into a trashcan labeled "plastics". There, he spotted a fresh newspaper titled in **bold** letters, **"Theft of the Golden Statue"**. He picked it up and read it aloud to Sam, who is his detective partner and his brother: *"On Sept. 9th, around 9:09 p.m. a thirty-kilogram statue made of gold was stolen from the* ***Museum of Golden Artifacts****, right after one of the caretakers locked the museum with one of his heavy lock at nighttime. People suspected him for the theft because he was the last person seen in the museum, but "he" has proven that thought wrong…"*

Sam and Robin exchanged glances and, scurried back to their house. They packed their bags with all sorts of spy gadgets, and sat on a strong old branch of an oak tree growing beside the museum's corner, waiting until the night of Sept. 10th. As the nine o' clock bell rang on the museum's clock… Sam and Robin jumped off the branch. They pulled down their night vision goggles that were on their forehead and, crept up to the walls surrounding the museum's trash corner. They glued on many one centimeter-sized night vision cameras on the walls around that point, to keep watch if the thieves will pass through that point and will have proof if they do. Then they studied the map of the museum's ventilation shafts with their magnifying glasses.

After that, they ripped the net, covering the entrance of the nearest ventilation pipe and slithered into it. Soon the inside of the pipe got big enough for them to walk in. The children saw footprints on the surface of the pipe and realized the thieves must have used this ventilation pipe for entering the museum. As they noticed it, they heard an evil giggle coming from a corner of the shaft and, heard some wicked voice, "Boss our plan is almost finished. By now, still no one has noticed this area of the museum. Our only challenge now, is to ship it back to our city." "Good, but hurry up, before anyone knows the golden statue is in this region of the museum, which is not in everybody's daily use. We should move that statue away from this place. Go, and bring that here."

Now the children were sure that the statue was nowhere else, but somewhere inside the museum only. But where was it? They were supposed to face some big bad people who could carry a thirty-kilogram statue easily with maybe one hand. However… as they were thinking, they heard one of the members of that gang was heading towards the exit of this ventilation, where they were standing. Therefore, Sam and Robin ascended some footholds that were right beside them luckily and, walked into another pipe that was above the previous one. First they were stunned, and then they ran straight. While running, Sam who was in front bumped into something and felt it, it was a long rope ladder hanging from nowhere, even with the night vision goggles, they couldn't see the end of it. As they started to climb, they glued another tiny camera on the rope ladder. While ascending, they grew tired and took a break on the ladder. As they regained their strength to climb, they started again. By now, they had climbed for twenty minutes including their break in the middle. They reached the edge from where the ladder hung and hauled themselves up. They saw red carpet with golden lining at the edges of it. They started to walk in another passage and

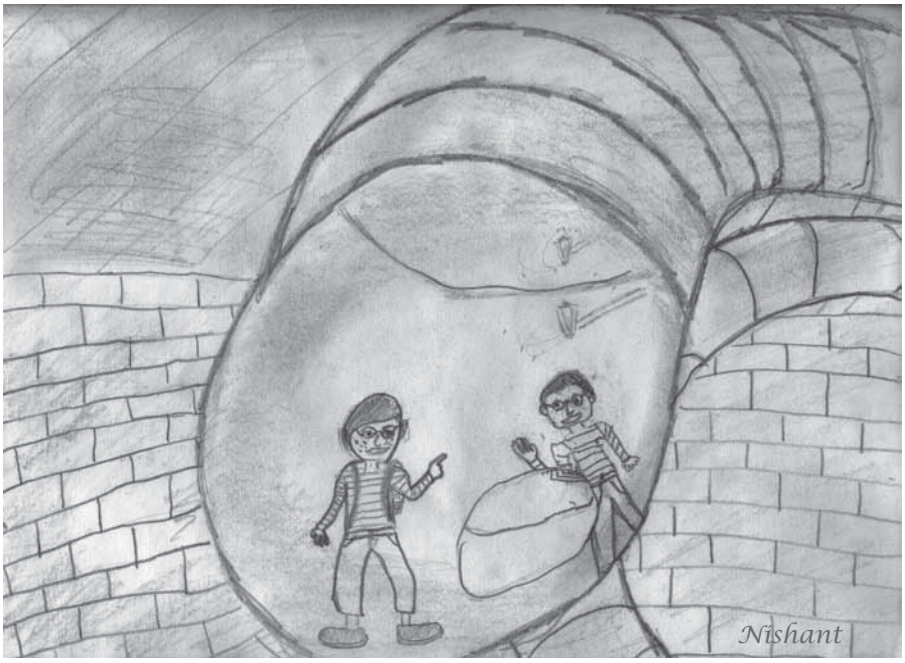

ran straight until they saw a door.

The door had golden lining in the shape of a rectangle plate on the door. This room seemed as if nobody used it for many years. The door was covered with a layer of dust. For a while, they stood siliently and thought if it was better to enter in that room and waited for a while. They opened the door slowly, and they totally froze and shocked to see what was standing there. There was standing the shining thirty kilograms golden statue, which was polished everyday by the caretakers of the museum. Even though the room was lit by only one light bulb that was reflecting on the golden statue, the whole room was glowing brightly. The floor here was just smooth granite. There was a small table, made of rose wood and had a pencil, an eraser on it, a note that had scribbles on it, and a blue vase that has three flowers in it. The smell of dampness and dust tingled their nose. Two pictures hung from the cold wall, one had a yatch and the other one had a picture of a tree standing in snow beside the sidewalk. Both of them were framed above a rocking chair.

As they stood there awestruck, watching the statue. While thinking about the museum's architect and how the thieves brought the statue in that room. Suddenly they heard footsteps coming from the hallway that was leading towards the door to the statue, where they were standing.

They dived in between the two large book racks that had lot of books, standing at the right side of the door to hide themselves behind it. Right at that moment, the door creaked opened. The small clan walked in slowly..... After exactly one day from the time the statue was stolen, they could see who the real culprits were. With the help of their gadgets, they contacted the police and mailed them the pictures that were taken with their mini cameras. The police were also shocked to see the real culprit's pictures. The gang's boss was the garbage truck driver and the other three were the museum's tour guides who knew the museum inside and out.

As few gangmembers entered the room and pushed the statue towards the door, Sam and Robin instantly yelled "FREEZE" and threw an elastic net on the thieves. They jumped onto them and pushed them on the floor. They caught them and tied them with a rope to the chair. While they were tying them, they spotted another big hole on the wall like the last one. They saw that the ventilation net was already ripped so they must have used this way to steal the statue. "WE SURRENDER", the surprised bandits said to these tiny kids who captured them. By that time the police reached the site. The pitiless thieves were shoved into the police car. Then the police officers said, "Thank you" and they drove off to police station with those thieves.

Next day, their names came in the newspaper "Mystry of golden statue solved by Sam and Robin." The statue was placed back in place in museum. However, this time security was improved, they had put lasers around the ventilation shafts and statues so there will be less chances of big crimes like this one. ❑

Nishant

Invading Robots

- Arsh Bhole, Grade IV

One day when Mark was in the library he came across a book titled "Robots". He borrowed the book for two weeks. When he read through it, he really liked it! It was about robots taking over the world. In the story people didn't know how or why the robots were made. All they knew was that robots were taking over the world. The robots were almost indestructible. They had a simple structure, all covered in titanium, which is the strongest and one of the lightest metals. There was a ship in space that was creating these robots and sending them to earth. Humans knew they were looking for something, but what?

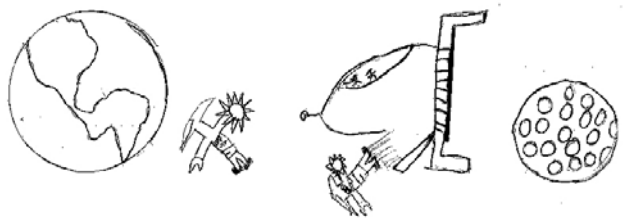

Arsh

Then in year 3000, this happened to be true. Some scientist figured out that the robots were coming from an alien ship which was very close to the moon through the Hubble telescope. Army knew they were looking for something, but what was it that they were looking for?

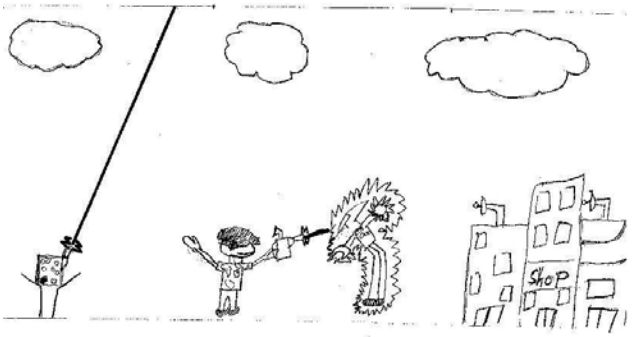

Arsh

The army figured out that the aliens needed more titanium and steel and were taking it from Earth since they had no more left on their planet. The human armies got together and thought of many ways to destroy the ship that was making the robots. Their plan was to build a machine that will aim a laser beam at the alien ship. It will also locate the ship with a special navigation system. It took them a year to build the machine. The army also built smaller machines of the same type to destroy the robots that were already on Earth. The robots that were coming to earth did not arrive at earth.

Then came D-day. The machine worked perfectly and destroyed the alien ship. With the ship destroyed, the Earth was finally saved from the aliens. ❑

Answer of puzzle crossing river:

First, two kids said bye to the 4 adults, and reached the far side. There one the kid got down the boat, and only one kid weighing 30 kg, returned and gave the boat to an adult. Now the adult of 60 kg crossed the river and handed over the boat to the waiting kid. The kid brought the boat back and transported the other kid again to the far side. This pattern continued, till all of them crossed the river.

A trip to Phuket

- Aishwarya Kumar, Grade V

I went to Phuket, Thailand for a holiday it was a great experience for me. It was my first time snorkeling and I was very excited. It is way different from swimming. If you wanted to, you could keep your head in the water for an hour straight.

When my family and I reached Phuket it started raining and since it was evening we could not do much. The next day my family went to a tour where we rode on elephants, fed them, watched baby elephants do tricks and saw a type of monkey called a pigtail macaque climbing trees to collect coconuts.

On third day we went on a tour of Phi Phi Islands where we did snorkeling. Where I was snorkeling most of the coral was brown and there were lots of yellow and black fishes. The water was around 2 meters deep around the boat we dived from. Then we went into deeper water, since we were wearing life jackets, it was easier to swim. After that we went to a beach for lunch and played in shallow water. Before returning to Phuket we snorkeled once more where there were more corals and fishes.

The next day we went to Khai Island. We did not have to jump from boats this time; we could go into water from the beach. There were a lot of different types of fishes in the reefs, some even swimming into the shallow waters in search of food. During snorkeling I saw corals shaped as heart, star, question marks and even a bowl of spaghetti. After snorkeling we fed the yellow fishes cookies. A cookie fell off my hand as they started nibbling it from all directions; they were all over it instantly. ❑

Mysterious Bee – havior

Imagine you are a bee keeper in United states of America and you went to check your bees, you find 36% to 70% of your bees have disappeared and when you mention this to other bee keepers, you hear the same story. So you go to a bee expert to find out what might have happened to your bees.

However Wait!! Why are bees important to us? They are well known for their sting. But we can't forget their sweet honey and fruits and nuts which are all directly or indirectly pollinated by bees. So they are not useless.

So now you are ready to find out the answer you're waiting for. Sadly, nobody knows the answer. It may be a bee flu, poor nutrition or fungus. Experts do know that bees are having trouble with their immune systems. Is that the culprit? But investigators are working as busy as bees to put honey bees back into business.

Four more quick facts about bees.

- The first known bee keepers were ancient Egyptians
- Honeybees communicate by dancing
- To collect enough nectar for one pound of honey, bees fly 50,000 miles
- A honey bee's wings beat about 11,400 times a minute.

Reference: National Geographic Kids Almanac 2010.

AmaZing Facts

Compiled by - Aneek Nag, Grade VI

Animals

- All cats are born with blue eyes.
- A tiger's roar can be heard over a mile away.
- Cats communicate using 16 known 'Cat words'.
- The world's termites outweigh the world's humans.
- Lady bugs squirt smelly liquid from their knees when they get scared.
- Some dinosaurs had 1,000 teeth.

Ways to be polite around the globe.

- Leave food on your plate in Egypt.
- Avoid snapping your fingers in Belgium.
- Keep your napkin at meals in Hungary
- Stick the tip of your index finger in your ear and kiss it to show that you have enjoyed your food in Portugal.
- Arrive 15 minutes late to parties in India.

Weird but TRUE.

- An 11-year-old invented Popsicles.
- If you spent a dollar a second, it would take you 32 years to spend a billion dollars.
- It is so cold in Siberia that your breath can turn in to ice in midair.
- The town of Monowi, Nebraska has a population of one.
- Some cars run on used French fry oil.
- A broken toilet sank the German submarine U-120
- 75% of all volcanoes are under water.
- If you heat a diamond to 1405 degrees Fahrenheit, it will turn into vapor.
- Because of strong winds in Hawaii, waterfalls some times go up instead of down.
- Days are longer than years in Mercury.
- 90% of snow is air.
- The Hawaiian language consists of only 12 letters - A, E, I, O, U, H, K, L, M, N, P and W.
- A cockroach can live up to 9 days without its head.
- Your Hair grows faster in warm air.
- If you eat too many carrots your skin can turn orange.
- You can't move your body when you dream.
- 60,000 miles of blood vessels run through your body.
- In Greece nodding your head means 'no' and side-to-side means 'nothing'.
- There are 43,674 more injuries with toilets than sharks.
- There are 293 ways to make a change for a dollar.
- Russia is only two and a half miles away from Alaska.
- The biggest snowflake ever recorded was 15 inches wide.
- Every minute, about 600 bolts of lighting strike the earth.
- The tallest snowman ever built was higher than a ten-story building.
- On New Year's Day, the people of Scotland open their front doors to let the old year out and the New Year in.
- Most Americans eat about 1,500 peanut butter and jelly sandwiches before graduating from high school.
- Mona Lisa had no eyebrows.
- A 13-year-old designed Alaska's flag ❑

Answer of puzzle Counting Triangles:

There are thirty five Triangles. If your count did not match then try again.
Tips: Don't miss to count the overlapping bigger triangles as well as the smaller triangles.

The Parcel

- Amartya Mukherjee, Grade VI

Let me tell you an amazing story that happened a few weeks ago.

"Dear Abhay"

On a Sunday afternoon I went to my friend, Abhay's house and was playing computer games with my best friends - Abhay & Sai. Then the doorbell rang and a postman delivered a parcel. It was addressed to *"Dear Abhay"*. As my friend Abhay opened the parcel - we were very surprised. It contained baby clothes and was addressed to "Dear Abhay" who was over 10 years old!

"Hah? Baby stuff?" said Abhay in a very surprised manner *"It was sent by my grandfather ..."*
Sai & I started laughing *"Baby stuff! Your grandfather thinks that you are a baby!"*
"Something is very strange" said Abhay *"This letter was sent from Cape Town in South Africa. But I don't have any relatives in South Africa!"*
Then I suggested *"Ok, let's go to the post-office and find more about this strange parcel."*

The Post-Office

The following week, the three of us went to the post office and showed them this letter. After a while the postman told us something very strange - *"Believe it or not, this letter was posted more than 20 years ago!"*

I asked, *"You mean to say that a letter addressed to Ojima 6-14-4-201, by a South African, in the name of Abhay was posted more than 20 years ago?"*
The postman replied *"Exactly!"*
Then Sai said *"So there must have been another Abhay, living in the same address 20 years ago!"*
Abhay replied *"Exactly - but how do we find out who it was?"*
Then I had an idea. I suggested *"Let's use Google to find out all the Abhay's living in Japan. We can contact them if it is possible."*
My friends agreed. *"That's a terrific idea"* said Abhay *"I am also curious as to how many more Abhay's live in Japan!"*

Abhay Ranjan Shah

As we Googled using the search phrase *"Abhay Japan"* we got 16 contacts. We then found the email address of each one of them and emailed them asking if any of them had relatives from South Africa.

A few days later we received an email from Abhay Ranjan Shah. Abhay told us that he was now 20 years old and was born in Ojima 6-14-4-201. He also told us that his maternal grandfather lived in South Africa. Several times - his grandfather had enquired if they received his gift. However Abhay and his parents thought that the old man was perhaps dreaming and didn't take him too seriously.

"Unfortunately, my grandfather died around 5 years ago." said Abhay Ranjan Shah, *"and I never got a chance to say 'Thank you' for this wonderful gift!"* ❑

Marathon – A True Story

- Tannistha Roychoudhury, Grade VII

My childhood has not been a great one. When I was seven, a tutor came to my home to teach to read and write. On the first and only day he came, he stormed out, complaining how I was a born idiot and should be prohibited from education, like a slave. I ultimately never did touch education, but I also never liked to do anything else. Everyone, including my rich parents, said that I was good for nothing. But there was one thing I was good at. I liked to run. It gave me a very refreshing feeling, like I was drinking water from the coolest spring in the world. Whenever I got the chance, I ran. My parents did not approve of my running and no studying, but I didn't care about that.

Then, when I was a young adult, I first went to see the Olympic Games. I was mesmerized by the accuracy of the spear-throwers and the strength of the boxers, and many more. But I was just simply enthralled by the long-distance runners. They had so much speed, so much stamina, and so much endurance. It was then that I promised myself that I would work hard to become an athlete and participate in the Games.

My name is Pheidippides. I was born in the Greek city of Athens. Greece was doing quite well at my time. Ever since the fall of the Mycenaean Empire several centuries ago, Greece had been receiving bad harvests. All of Greece's residents had to drop everything involving education in order to have many farmers to grow food. By doing so, most Greeks forgot many of the skills they had learned, including reading and writing. Then, a couple of centuries later, Greece started to trade with the people of other civilizations such as Egypt and Assyria. The Greeks grew wealthier and were able to reinforce the skills they had lost during the fall of the Mycenaean Empire.

I kept the promise I had made when I first saw the Olympic Games. I worked hard day and night, running round and round the entire city until I was groaning in pain. I ate only bread and boiled vegetables twice a day. I took plenty of rest. I even lifted heavy weights with my feet. It took me about thirty years, but after that time, I was readier than ever to compete in the Games and claim the gold crown for long-distance running.

I was very excited that I would participate in the Games, until that day when my life took a different turn. I was forty years old. I had just registered my name in the list of participants, and I had sworn to Zeus that I had been in training for at least ten months.

Then the messenger came.

I was returning home, happier than a man who had won every event in the Games, when the messenger came sprinting through the street, shouting, "They're coming! The Persians are invading!!!"

My happiness instantly transformed into dismay. I knew then that I wouldn't have a chance this year to participate in the Olympic Games. The Games were canceled when there was an invasion. But that wasn't what bothered me most. There was a rule that all men who had registered their name for the Games would be drafted into the military and serve the army until the invasion was over.

I had to immediately report to the Acropolis. All the other participants were present. General Antenor, the commander of the hoplites in Athens, gave a very long speech about how we should serve our country faithfully and die for it if necessary. We were then recruited into the army by the general.

We started training immediately. Some of the competitors had trained only for the combat events and were such experts that they did not need further training. Most of the competitors, including me, had trained for the other events, and did not know much about combat. It was a hard day. The training was just grueling. By the end of the day, all my muscles felt like they had been roasted in a fire. But it was worth it, because now I, and mostly everyone else, knew how to handle a sword, spear, dagger, mace, and countless other weapons. We also knew how to put on armor and how to block and parry. We were ready for the counterattack for the next day.

During the training, General Antenor noticed how agile and fast I was while dodging my opponent. The general challenged me to a race of twenty laps around the Acropolis. I was a little bit nervous because the general was the winner of the golden crown of long-distance running in the Olympic Games twelve years ago.

He was no match for me. While he was running his seventh lap, I had finished my twenty laps. The general was groaning in frustration and he was showing how mad he was at me beating him. His face was red and his eyes were full of fury. Then I saw the slight smile on his lips and realized that he was actually impressed.

After training had ended, the general approached me. "Pheidippides," he declared. "I am impressed by your speed and endurance. We need

fast people like you in the military."

"Why is that, sir?" I asked.

"For messengers, of course! Now that I think of it, one of our messengers has fallen off a cliff and died. You will make a fine replacement." he boomed as he slapped me on the back. My heart sank. The Messenger was one of the lowest ranks in the Greek military. Not only was the messenger positioned in the last row of the hoplite phalanx, but the messenger's main job was to relay messages between the army on the battlefield and Athens. Because of the treacherous landscape, full of rugged mountains and deep, muddy streams, messengers were not allowed to use horses. Messengers were not allowed to travel by sea in case of capture by the enemy fleet.

Early the next morning, General Antenor and the hundred new hoplite recruits left for the battle. Antenor gave a speech just before we left. "Men! The time has come for us to fight to the death! Remember that we have to fight our hardest, even if the odds are against us. We must be brave! We must be strong! And also remember that the Persians use the weapon known as the scimitar, which is more powerful than the sword or spear. The Persians also disregard the use of armor, so they are very vulnerable to our attacks. Remember that even if we don't win, we tried our hardest!" He raised his sword and everyone cheered.

On the journey, Antenor informed us that the battle would be taking place at Marathon. Marathon was a small coastal village on the Southern coast of the Greek peninsula. The Persians had landed on the coast and plundered the village, taking no prisoners. Apparently, the last messenger had described marathon as "a city of the dead," since all the houses and temples were in ruins and hundreds of corpses were littered on every street.

When we arrived, the remainder of the Greek military, meaning the garrisons from all the other Greek cities, had already started the battle. We heard clangs of swords against scimitars, and cries of people who were slashed and killed. We saw blood spilled all over the rocks and grasses. There were war cries from both the hoplites and the Persians.

We were all near the back of the hoplite phalanx. Since I was the messenger, I was in the last row. None of the enemy ranks had reached me yet. I wasn't doing anything. I was just standing there at the back of the phalanx while the other hoplites were fighting for their lives at the front. I didn't like being out of the action. Plus, I was cold, and no fighting meant that I wouldn't get any warmer either. Everyone was wearing scarves. I had on a green one.

Less than a day had passed and I was already called to General Antenor for my first message. It wasn't a good one. "Pheidippides," Antenor said. "We are losing the battle. Our hoplites are not enough to defeat the Persians. The Persians fight dirty – too dirty. You must carry this message to the Spartans, our good friends. They are the most powerful and fearsome fighters in the whole of Greece. There was no time to send the message to them before counterattacking, but now we need them, and fast," he continued, handing me a stone tablet with words written on it, words which I could never hope to understand. "It says that we need reinforcements. And here's a map," he said, handing me a simple map on an Egyptian papyrus. "Here is Sparta," he said, as he showed a point on the map.

"How far is it?" I asked.

"It's not far…only about fifty leagues." He replied.

I nearly passed out. My ears were certainly deceiving me. Fifty leagues?! That was a very, very long distance, longer than I had imagined running. It would take a day at least to get there and another day to get back here. The harsh landscape would leave me exhausted. And to make matters worse, I had to carry a heavy stone tablet and a papyrus, which would only add to my exhaustion. "That journey will take me two days at least. Are you sure you can hold off the invaders for that long?" I asked him.

"According to my calculations, we have enough soldiers to hold out the Persians for two weeks. The only problem is that after two weeks, we're lost, because the Persian fleets keep arriving all the time." He answered. He must have noticed that I had become wan, because he said, "Don't worry, lad. You'll make it. You just have to believe in yourself." He slapped me on the back and dashed back into the battlefield, shouting orders to his hoplite soldiers. I stood there for a few moments, deep in thought, and, finding no other option, took off for Sparta.

I started off with a fast jog over a grassy field. It was nearly as fast as running, and it would conserve more energy for the remaining journey. It felt quite pleasant at first. It was nice to be jogging on a grassy field with the cool breeze rushing through my skin. The feeling didn't last long.

It wasn't long before I tripped for the first time in my journey. It was a huge boulder, which I somehow hadn't seen before. It was as if it appeared there just as I was about to jog past. I fell over onto the grass, and my left knee grazed a sharp, jagged rock. I cried out in pain as blood began dripping from the cut in my knee.

It wasn't a serious cut, but every time my right foot touched the ground, a burst of pain would shoot up my leg. Soon, after about half a league, I found a small stream. The water was clean and I washed my knee in order to prevent the pain. I also drank some of the water, even though it tasted a little metallic. It quenched my thirst a bit. Soon, I was up and jogging.

As I went along, the grass started disappearing. I was seeing more of a grey, barren landscape. Even the sky started becoming grey. Soon the grass was gone, and I started to see rocky, grey mountains towering above me. According to the map, I had to go over these mountains to get to Sparta, which meant a full-scale climb. I groaned. Something told me the day was going to get much, much worse.

I tripped three more times before reaching the first mountain, all of which were over a rock. When I reached the mountain, I saw that it was a steep climb. And since I hadn't brought any climbing tools with me, I knew that the climbing would take lots of effort.

I wrapped the stone tablet and the map around my green scarf and strapped them to my military belt. At least they would be safe. Then I started the climb. It was grueling. There were not many hangings to climb on and I had to cling onto the rocks with my fingernails. When I finally reached the top ages later, one of my fingernails had broken off and I had dozens of tiny blisters in my hands.

Looking around, I was relieved. I wouldn't have to climb back down yet. This was a mountain range, and all I had to do was to climb from peak to peak. It wasn't so hard.

Well, it wasn't hard until I reached a peak that was so tall that I could barely see the summit. I could see a faint blue light shining from the top. I recognized it as Mt. Olympus. I had seen it in many pictures painted by artists in Athens. This was the legendary Mountain of the Gods. Zeus lived there along with the other gods such as Poseidon and Aphrodite. It was considered a sin to climb to the mountain's summit, so I decided to cross it. It would take more painstaking effort to do that, but I wasn't about to commit a sin in order to make the journey easier to handle.

After what seemed like ages, I crossed Mt. Olympus. I was sweating and all my hands were ashen with the texture of rock. My heart was beating faster than a rabbit can hop, and each of my breaths came in painful fractions. I was so tired I could barely stand up. I decided to rest for a while on the side of The Mountain of the Gods.

I nearly fell asleep. I needed all my mental strength to keep my eyes open. After some time, I was ready to begin again. Before I started, I muttered a prayer in the direction of the heavens. "Gods, please help me have strength to continue my journey."

I started. There were not many peaks remaining to go over. Soon, I had reached the last peak. Now the hard part would start: going back down!

Suddenly, the scarf tied to my belt came loose. "No!" I screamed, and reached for it, a moment too late. It had disappeared down the mountain, taking my message and map with it. I had to get down and retrieve it!

I cautiously placed my left foot on a rocky ledge. My first mistake was to look down. I was nearly a league off the ground. Along with the realization came dizziness and nausea. I almost fell over the top. I tried my hardest to regain balance and forced my mind to forget my current altitude. My second mistake was to think that there were more rocky ledges underneath this one to place my right foot on, which there weren't. This time I really did fall over.

My body was the wrong side up. I felt very ill as I fell. Then I hit the side of the mountain. My face collided with sharp rocks. But that wasn't the end of it. I could see the ground coming up. I then saw that I was about to land on hard rock. Before I could reach out my arms to protect myself, my head crashed onto the rocks and I felt an agonizing pain that sent my body straight upright. I could feel the blackness covering up the corners of my vision. I managed to keep my eyes open long enough to see that my scarf was just beside me, its contents still intact. "Safe," I muttered, and blacked out.

When I woke up again, I was not at the foot of the mountain. I was in a very bright room. I realized that the walls, floor, and ceiling were made of white marble. Only the wealthy could afford such a material. Then I realized I was lying in a warm, comfortable bed. The mattress was covered with white velvet. I sat up and realized that there was a bandage around my head.

I took in my surroundings. There were many statues of some old Greek generals around the room. There was also a large portrait of a handsome couple on the wall. There was a window on the other side. Through the window I could see a huge garden with many flowers and plants. There was a beautiful fountain in the middle of it all.

"Do you like the garden?" said a voice. I spun around. There was a very old woman standing in the pillared doorway, smiling. Her long silver hair flowed down her back. Her face was covered in wrinkles and she had kind eyes. She was wearing a long white dress. I recognized her as the lady from the portrait but much older.

I suddenly remembered what had happened. "Where am I?" I asked. "I remember falling down a mountain and crashing into some rocks, and then…"

The lady held up her hand. "Don't fret, messenger. You are in my house, and I know what happened. I was strolling along the outside of the town when I saw you fall. I was terribly scared, and I returned to the city and called my daughter. Together we brought you into our house, and my daughter nursed you. I hope you feel fine now?"

I smiled weakly. "Yes, thank you very much. But I must be going. I have a message to deliver to Sparta and…wait…how do you know that I'm a messenger?" I asked.

"You are in Sparta. While we were carrying you to our house, I noticed the stone tablet on your belt. I read it and passed it to General Hector, who commands the Spartan army. He says that he would be happy to help your troops succeed against those pesky Persians," she answered.

"Phew!" I gasped in relief. "Did the general say the amount of time it would take to ready his own troops?"

"No. You must talk with him. Come." She said. "And by the way, my name is Cassandra."

"Pheidippides," I answered as I followed her out.

As I went along, I noticed the beauty of Sparta. Athens was nothing compared to this city. The streets were cleaner and no common mongrels wandered them. Almost all the houses were made of expensive white marble. There was less noise around the marketplace. All the people were friendly, saying "Welcome to Sparta" whenever they saw me. The grass was greener and the air was fresher.

We soon reached a huge building that I realized as the Barracks of Sparta. There was a heavily-built and muscular man sitting on a bench in the front lawn, staring at the tall fountain. "General," said Cassandra. "He is here." She turned to leave. "I wish you the best of luck, Pheidippides." She bowed. I nodded in thanks.

I watched as the general turned around. I couldn't help staring at his face. There were various scars on his forehead and down his cheek. He had a crooked nose and he was wearing a black eye patch. His mouth was twisted down into the most terrible frown and his lips were dull grey. Flies flew around his head and he smelled of rotten eggs. He was more like a filthy street-beggar who had stolen a general's coat rather than the general of the most powerful military force in the whole of Greece.

When he saw me gaping at his face, he grinned, showing cracked, yellow teeth. "Hello, messenger. I hope you've had a nice rest." He said. His voice came as a sharp cackle which made me shiver. I made no answer.

He laughed heartily. It sounded more like a bear growling. "You seem to be surprised by my poor state. It was a drastic accident." Now he was sniffing, as a tear rolled down his open eye. It was blood-red in color. "It was a long time ago. I was a common messenger like you. I fell off a mountain and hit a very sharp rock. The impact made my teeth break permanently, made permanent scars on my face, and removed one of my eyes permanently. I also had a broken leg, a broken arm, and a broken nose. Still, I endured the long hours of pain and made it back to Sparta. As a reward, I was promoted to lieutenant, and when the general died, to general." He held out his hand, and I shook it.

"General Hector," I started, finally back in control. "Have you accepted our proposal to assist our troops?"

"Aye," replied the general. "I don't like those Persians. They raided our settlement near the Nile and stole everything. Well, now they'll know never to anger old Hector! Messenger, I promise you that I will lead my forces to assist yours at Marathon. It would take nearly two days to refresh my troops because, well, it's been more than six years since we've fought last. And also they held an unauthorized banquet last night. But after they're ready, I promise that we will reach Marathon in three days. Now give this message to old Antenor, will you." He reached through a coat pocket and pulled out a very thin piece of papyrus.

"The message is on this papyrus?" I asked.

The general chucked. "This here is the finest papyrus you could find. Imported directly form Egypt. Lighter and handier than stone. Worth every piece of gold we spent on it. Now off you go, young lad, and good luck." He patted me on the back and returned to the Barracks. I could hear him shouting, "Wake up, you lazy drunkards, and get running! Come on!! You'll never vanquish those Persians if you're in this state." I chuckled quietly to myself as I left the city.

The trip back to Marathon was quite uneventful, except that I fell off the last mountain on the trail. I hit my bandaged head on a rock and blacked out. When I woke up, the sun was setting. I quickly hurried off again.

I breathed a sigh of relief when I heard the sounds of battle coming from Marathon. My relief vanished when I saw the piles of corpses, of which most were Greeks.

Antenor was leading the battle at the front. I saw him cut through a Persian soldier and then slash at four Persians at the same time. Desperately, I called to him. He heard me and let his lieutenants take over the front. He hurried to me.

"What news, Pheidippides?" he asked, panting. I handed him the papyrus. Somehow, he wasn't surprised to see it. Perhaps he always got messages from Sparta in the same manner. He read the message and sighed in relief. "Thank the gods," he gasped. He turned around and called to his troops. "Help is on the way! Fight your best!" This seemed to have an impact on the Greek soldiers. We could hear less Greek cursing and more Persian cursing as they died.

The general turned to me again. "Pheidippides, I know that you're not a lieutenant," he said. "But how would you like to join me at the front of the ranks? As a reward for delivering the message this fast."

I accepted. For some reason I fought better than most of the well-trained soldiers. I think I had a sense of patriotism inside me. I had claimed several

Persian lives with my sword, while not one Persian fighter had even touched me with his scimitar. Soon, the piles of Persian corpses were exceeding the Greeks.

I fought for a bit longer until I felt something very, very hard hit my head with unbelievable force. I was out before I hit the ground.

Later, I woke up again. I was in a tent. There was a second bandage around my head and the nurse of the army of Athens was by my side.

"How long has it been since I went down?" I asked sleepily.

"It has been five days," answered the nurse.

I sat up hurriedly. "Five whole days?! Have the Spartans arrived yet."

"They will soon."

"I must talk to General Antenor at once!" I stood up and looked at the nurse. "Where is he?"

She answered in a sad voice, "I am afraid that the general has left us. A Persian soldier stabbed him in the stomach. I tried my hardest to cure him, but the wound became infected and he died. I am sorry."

I took this all in. The general was a nice person. He had stood by me all the time and had allowed me to fight. I felt that I had to avenge his tragic death. "I'm going back in," I said with clenched teeth. The nurse was about to protest, but she must have noticed how determined I was, so she gave me my weapons and armor instead.

I ran back into the battlefield, roaring in rage. I slashed at every Persian I could find, showing no mercy. I slashed and stabbed and blocked until I was so exhausted that it took all my strength to lunge with my sword.

Just then, I heard a familiar voice. "Avast, ye Persians! Go back to where you came from!" It was General Hector, with his army of five thousand soldiers. The Persians in front of me stared in shock for a few moments until their fighting side took over and they started attacking again.

The Spartan army was a juggernaut. It destroyed every Persian in its path. After some time there were no more Persians left alive. All those who were alive had fled to their ships. We saw the ships moving away into the horizon.

All the Greeks left alive shouted, "Victory for us!" We sounded like a thunderstorm.

General Hector approached me. "To Acropolis! Run, Pheidippides, one race more! Victory is ours! Athens is saved, thank Pan, go shout!"

I ran. I cannot forget the sensation. The wind whipping through my body and the grass cool under my bare feet, I ran. I ran for nearly a day without stopping. I did not feel my breath coming in tiny gasps. I did not feel my heart beating faster than my body could withstand. I only felt victory.

The sun was setting by the time I reached Athens. I ran though the streets screaming, "We have won! Victory is ours!" Everyone cheered and cried out with joy.

I kept running. I didn't stop until I reached the Acropolis. When I reached there, I collapsed to the floor. All the officials of the Greek government were staring at me in wonder and surprise.

"We have won!" I managed to gasp. I then realized that I wasn't breathing. My heart had stopped beating. I lost all my senses. I did not see the officials jump up with joy and start dancing. I did not hear the shouts and cheers of the officials and all the other locals who had followed me into the Acropolis. I did not feel the floor beneath me. There was only darkness. That day, in front of nearly everyone in Athens, I breathed my last.

I was famous for a time, but soon I was forgotten. Luckily, my story was recorded by a man named Herodotus about forty years after I died.

Herodotus' writings were discovered in the nineteenth century and poet Robert Browning wrote a poem about me. In the modern world, I have no significance. But there is one thing that relates to me in the modern world. Something that many people enjoy.

The famous long-distance running event which is about forty two kilometers long is named after the battlefield in which I fought. It is known as the… marathon.

Author's Note

The story is based on the poem by Robert Browning. The Battle of Marathon is a true historical event. The legitimacy of the part when Pheidippides runs to Athens without stopping and dies from exhaustion and the part when Pheidippides runs to Sparta to request reinforcements has not been proved, and historians still debate if it is true. ❑

The Sign of a Victory:
A glimpse of Indian Fo⚽tball

- Arindrajit Basu, Grade XII

It was nearly six on a Monday morning. Under normal circumstances, those two factors would have combined to bring about the activation of an alarm that would rouse me from the oblivion of sleep and then force my reluctant person to the shower to face the trials of a new day and receive the joys of education. Yet, this Monday morning was no usual one. In fact, speaking generically, it wasn't morning - just a very late night I had wrestled with the perils of sleep since ten PM the previous night just to catch a glimpse of the spectacle that was unfolding before my eyes- the ' mother of all earthly events': The finals of the 2010 FIFA World Cup. The deprivation of sleep couldn't impede the excitement that swept through me as Andres' Iniesta smashed the golden Jo'bulani (an alternate spelling of the conventional 'Jabulani' was used by FIFA themselves to acknowledge the efforts of Jo'burg in making the event at Soccer City possible) past the Dutch goalkeeper Stekelenburg. As Iker Casillas, captain of Spain, lifted the glorious World Cup with his saintly hands that have been insured for a million pounds, the whole of Spain rejoiced. My father couldn't help commenting on the fact that the Spanish national colors were notoriously similar to that of our own East Bengal FC. That caused me to wonder: Would our tri-colours ever be waving among the 31 other flags at a senior men's football world cup?

Now, several readers might be of the impression that India has failed to qualify for any of the FIFA world cups to date that is a misunderstanding... The 1950 World Cup held in Brazil saw the Indian contingent qualifying to the tournament by default due to the withdrawal of its scheduled opponents at the preliminary qualifiers. However, the governing body, the All India Football Federation (AIFF) forced this contingent to withdraw from the tournament as they failed to recognize the significance of the event at the time. The official excuse made by the AIFF stated that the team did not have sufficient practice and were undergoing severe selection problems. Later, the organization has gone onto modify this tale by claiming that they were compelled to withdraw due to rules against barefoot football. Shailen Manna, captain at the time, declared that this was simply a myth designed to cover up to the outrageous decision made by the AIFF. Sixty years have passed since this fiasco and still, Indian boots have failed to tread on World Cup soil.

Even so, after the mishap, Indian football entered what is still referred to as its 'Golden era' with stars like Chuni Goswami and Balaram leading the charge. India won gold medals at the 1951 and 1962 Asian Games, and reached the semi-finals of the next two Asian Games. The Indian team also set a new record in 1956 with their semi-final appearance in the Melbourne Olympics as it represented, at the time, the best performance by an Asian team in an Olympic football tournament. The record stood until the 1968 tournament when Japan also reached the semi-finals before capturing the bronze medal that had eluded the Indian squad. India went on to qualify to the 1960 Olympics but failed to make an impact and had the distinction of being runners-up in the 1964 AFC Asia Cup with a narrow defeat to Israel in the tournament (that was played in a round-robin format only) by two points.

Alas, all good things must cease and India's football laurels have stagnated for decades now. With such abject failure, the Indian youth have stopped following the performance of the national team and the domestic I-League. I must confess that I am guilty of the above mentioned crime. The most recent travesty that comes to mind is the plight of the Mahindra United Football Club (MUFC), a team that ironically shares its initials with a more reputed club based in Old Trafford. Anyhow, the Indian MUFC finished third in the I-League and as a reward for their efforts, will be disbanded next season. Imagine a team in the Premiership or La Liga sharing their fate? The reason lay in the literal dearth of supporters who bought tickets for their matches. Attendance at the I-league encounters may be less than the attendance at the fifth day of an inter-school cricket test match. The wealthy sponsors of Mahindra United did their best to keep the club alive but even the wealthy do (sometimes) have their limitations.

Obviously, there is an overgrown elephant occupying the cage of Indian sports and the criminal is indeed cricket. While, I am a keen supporter and follower of cricket myself, it is clear that cricket has robbed Indian football of its necessities-both financial and psychological. Off-season often causes goalposts to be moved around in major football pitches to enable the creation of makeshift cricket squares without much hassle. I'm sure the installation of numerous zealous footballers onto the lush Eden Gardens would make the front page of The Telegraph before long.

Indians love football. Most of my friends in

India ignored the wants of the demanding ISC and CBSE curriculums and stayed up long nights, claiming to be indulging in futile matters such as Calculus or Chemistry, but in reality, following the World Cup exploits of Forlan or Messi. These folks have favourite clubs as well ranging from Chelsea FC in the Premiership to Barcelona in the Primera Liga (albeit they may know zilch about the geographical location of these clubs). I am no exception. My interest in Indian football remains limited to the annual domestic encounter between East Bengal and Mohun Bagan in the Kolkata Football league.

This could change. This should change. No sport can survive solely on players. The fans form an integral part of the equation. The only catalyst that could be used to change the perception of Indian football needs to be the media. Scores need to be published on time. Fans need to be made aware of the kick-off times and the TV channels have to broadcast the club matches. The national team requires more promotion than 1 minute ads made by hack promoters. Talent doesn't show up at one's door. A search has to be made. The AIFF needs to exert itself more and ensure that these hunts do actually take place. On too many occasions, over my 'para' footballing career on the streets of Mumbai and Kolkata, I have seen poverty-stricken youngsters dribble past the college-going veteran in style. Invariably, a few months later, the youngsters have departed from our league to work (or beg) in order to supplement their family's limited gross income

Indian men's football is showing faint signs of a revival to its glory days. The Nehru Cup has been won consecutively in 2007 and 2009. With a 4-1 victory over Tajikistan in the 2008 AFC Challenger Cup, India has managed to qualify for the Asia Cup in Qatar next year after 27 long years. 'God's gift to Indian Football', skipper Baichung Bhutia is alive and well. Sunil Chettri, the centre-forward has been recruited to play for the Kansas City Wizards, a club that competes at the first division of the US club scene. There is also talk of a bid for hosting the 2022 World Cup. Perhaps, these are, in the words of R. Kelly, the 'Signs of a Victory.' As the Indian contingent graces the pitches of Qatar in January next year to compete in the Asia Cup, we'll know just how reliable these signs are. ❑

Butterfly

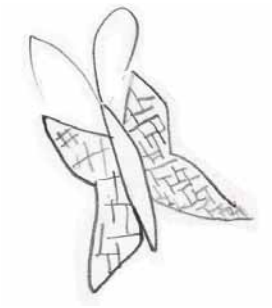

Ankita Basu, Grade VI

Oh dear little butterfly,
I wonder how do you fly so high !

You are so bright and colorful,
You look like a fairy,
Who is so beautiful !

I also want to fly like you,
But my mother says,
I don't have wings like you ...

But one day I'll also fly high,
That's my promise to all of you.

Meal-at-Home

- Shalini Mallik, Grade XII

I am on my summer vacation now. It's nice to relax, be lazy, have no school homework, tests and exams – but I must admit, it can get boring sometimes. One afternoon, an unexpected idea came to my mind – to cook an evening dinner for my family! I decided to make a "Meal-at-Home".

CONSIDERATIONS:

Age of family	-avoid fatty foods, red meat, excess cheese or sweets - have more of green vegetables, fruit and protein
Ideal diet	-calcium based food for my mom -low sugar diet for my dad
Cultural Factors	-Indians like fried foods, more oil based, and a lot of spices added to their cooking - at home we avoid oily foods
Dietary Family Rules	- have to have vegetable on a daily serving, fruit and protein - avoiding excess sugar, oil, fat, red meat, salt
Likes/Dislikes	Likes: vegetables, fish, chicken, rice, pita, snacks Dislikes: too much sugar, fatty foods, dry food like pizza
Exercise levels	Mom: none Dad: occasional

Health-a-licious Dinner

Appetizer
- Lentil soup
- Bread roll

Main Course
- Fried chicken
- Boiled vegetables
- Carrots
- Peas
- Hot peppers
- Baked potato

Dessert
- Yogurt fruit salad
- Coffee/juice

Ingredients

- 1 Chicken breast
- 1 Big bread roll
- ½ cup of Lentil
- 1 Potato
- 2 cups of Baby carrots
- 1 Green and red hot pepper
- 1 tsp of butter
- Philly garlic cream-cheese
- 1 cup of Watermelon
- 1 Peach
- 1 Apple
- ½ of strawberry yogurt

Seasonings:
- Salt, coriander powder, red chilli powder, cumin powder, bay leaves, turmeric, soya sauce, vinegar, and yoghurt

Recipe

1. Preheat oven to 350 degrees C.
2. Slice the potato almost half way through, wrap it in tin foil and put it in the oven for 40 minutes for a nice soft baked potato. When finished add Philly garlic dressing in the middle of the potato.
3. Set water to boil in a pot and add the ½ cup of lentil; leave it in for about 20 minutes.
4. Wash carrots, hot peppers, watermelon, peach, apple, potato and chicken breast in hot water.
5. Set water in another pot and make sure the water comes to a boiling point.
6. Slice the chicken in 4 thin pieces and cut off any fat. Place the chicken on a plate; start to season it with salt, coriander powder, red chilli powder, cumin powder, turmeric, vinegar, and ½ a cup of plain yogurt.

7. Slice the baby carrots horizontally in half and slice the hot peppers into thin pieces; take out seeds. Add all the vegetables to the boiling water for about 10 minutes.
8. Sprinkle the frying pan with PAM (non cholesterol, low fat cooking oil) and place the chicken strips on it; cook on low heat for about 8 minutes on each side to get a nice tender meat.
9. Dice the watermelon into small squares, the peach into thin slice, and the apple into 4 slices. Put all the diced fruit in a small bowl with the apple slice on the side and a ½ cup scoop of strawberry yoghurt.
10. Presentation: serve the lentil soup with sliced bread pieces; place the chicken strips next to the boiled vegetable and the baked potato; serve coffee or orange juice with the fruit salad dessert.

This recipe took me 52 minutes to prepare and 1 hour 43 minutes to cook. The total time taken was 3 hours and 15 minutes!!

Self Assessment of Meal-at-Home

Categories	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Meal Planning -included three courses (appetizer, main course, salad and/or dessert and a beverage) -selected food that could be eaten by all members of the family				☺
Preparation -prepared a complete and accurate grocery list -followed recipes for all dishes in this meal -used accurate measuring and cooking skills -used equipment and appliances correctly -followed safety and sanitation procedures -cleaned up kitchen efficiently			☺	
Achievement of the Goal -completed the meal preparations -prepared an appetizing and enjoyable meal -served meal attractively, using a suitable table setting				☺

I also took photographs of my culinary skill and achievements. Here they are!

DRAWINGS

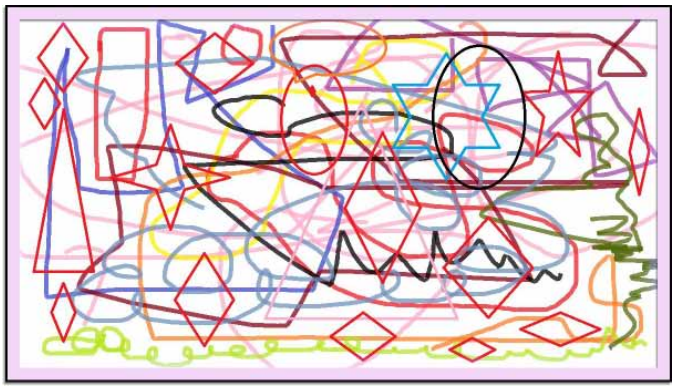

"First Art", Ananya 3 yrs old

"Back to the future India",
Manas 3 yrs old

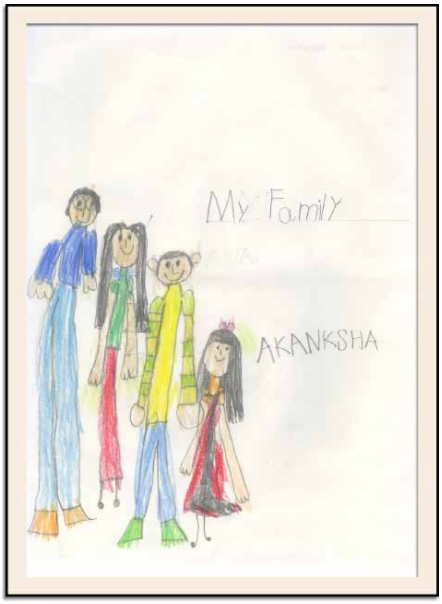

"My Family", Aakansha 5 yrs old

"Ocean Life", Aaryan 5 yrs old

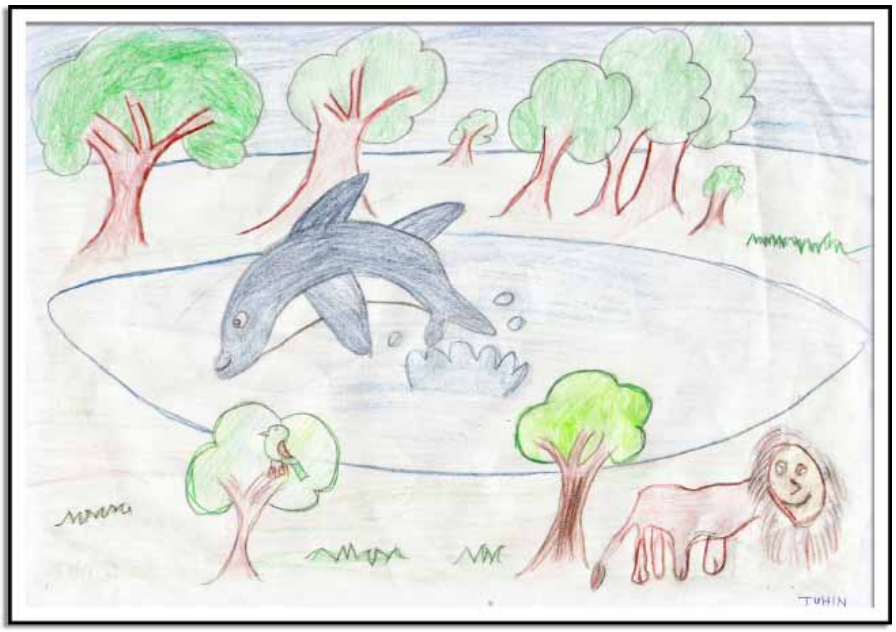

"Dolphin" , Tuhin Nag, Grade III

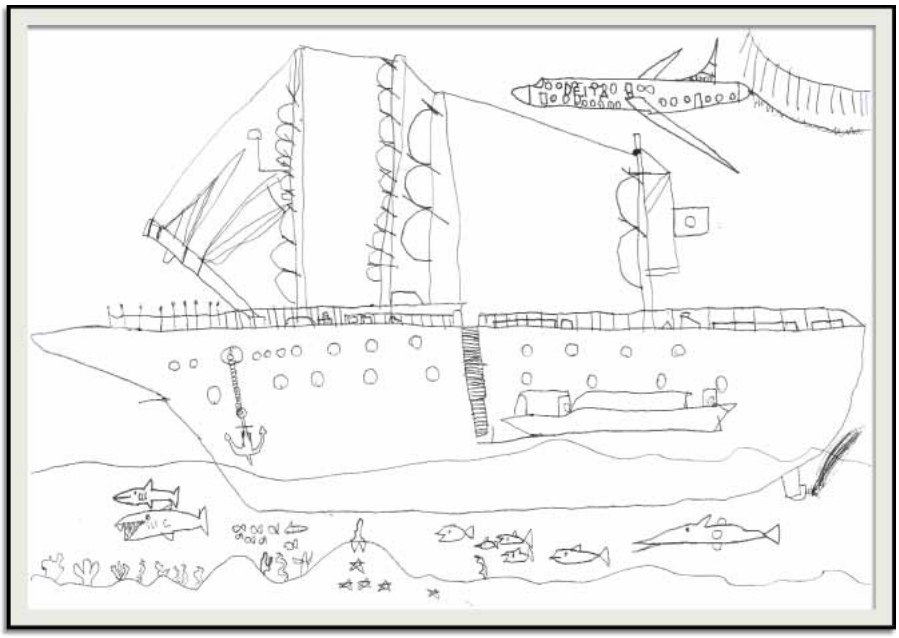

"Flight over the Pacific", Aditya Tripathi, Grade II

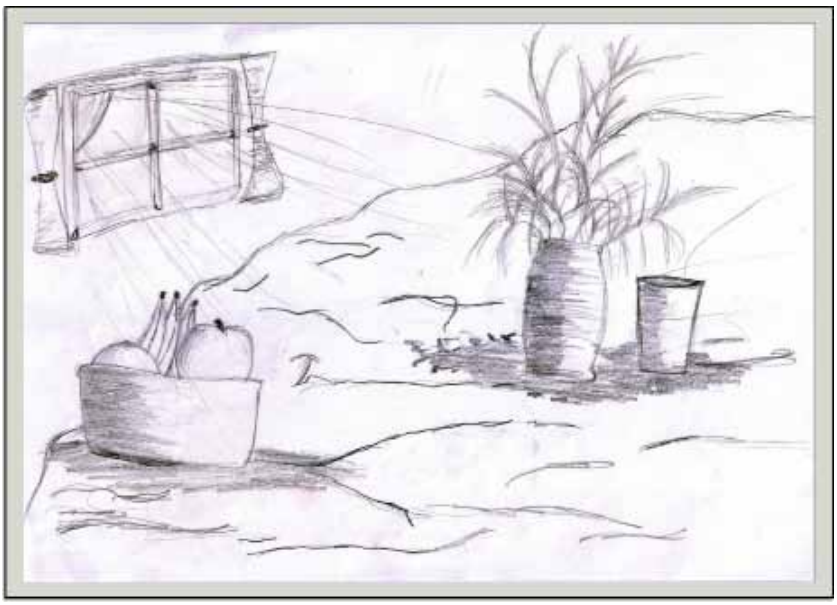

"Sunrise",
Saptarshi Nath, Grade VI

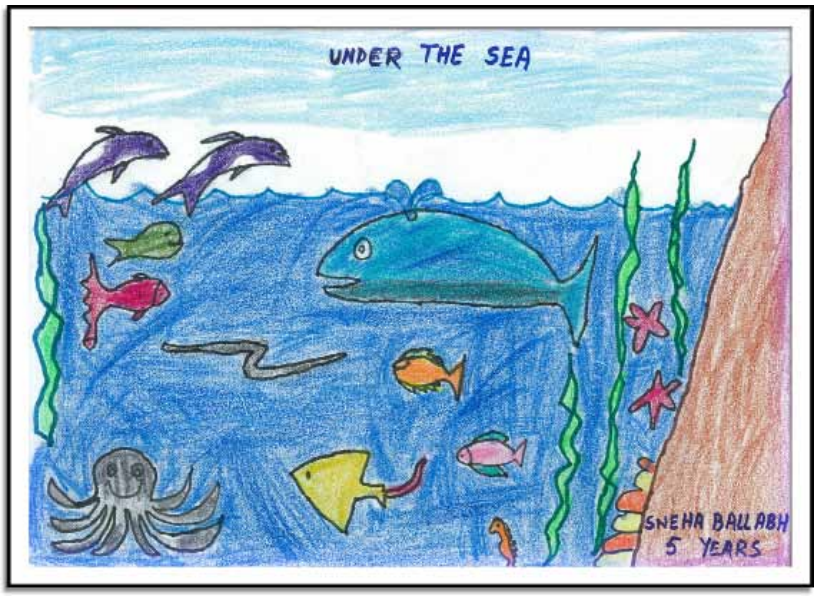

"Under the Sea", Sneha Ballabh, 5 yrs old

"Indian Village", Worli art, Nimisha, Grade III

"Moe Work", Moe Okuda, Grade X

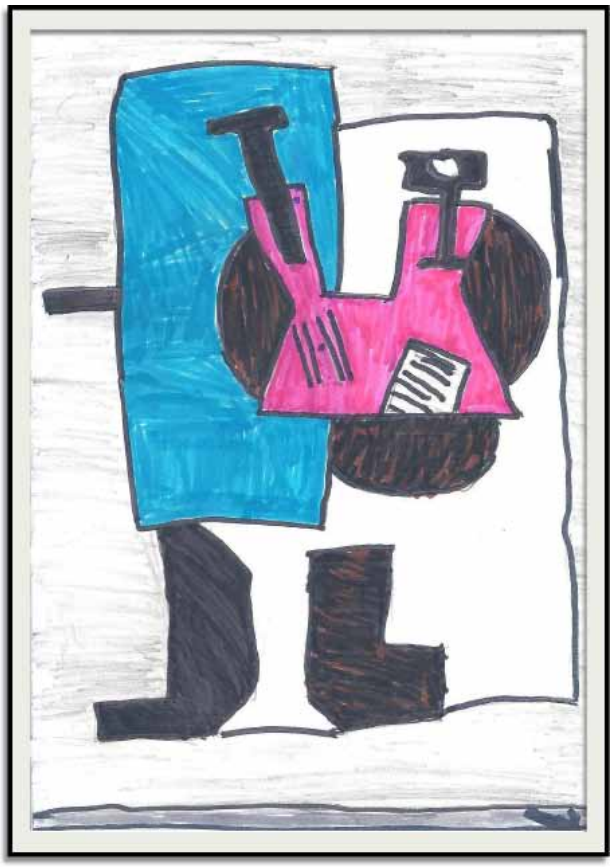

"Cubism Guitar and Man", Bikramjit Basu, Grade VII

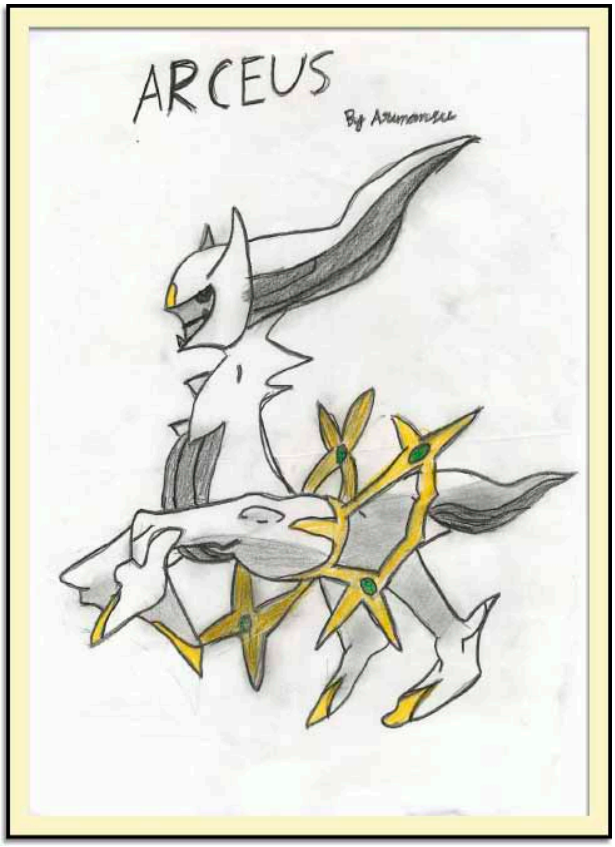

"Arceus", Arunansu Patra, Grade V

"Siblings", Maya 5 yrs old

Photographs

"Snow Festival China (Harbin) -2010", Chandrima Mukherjee

"Creation", Sanjib Chanda

"Mt. Nasu", Shantanu Nag

Arts

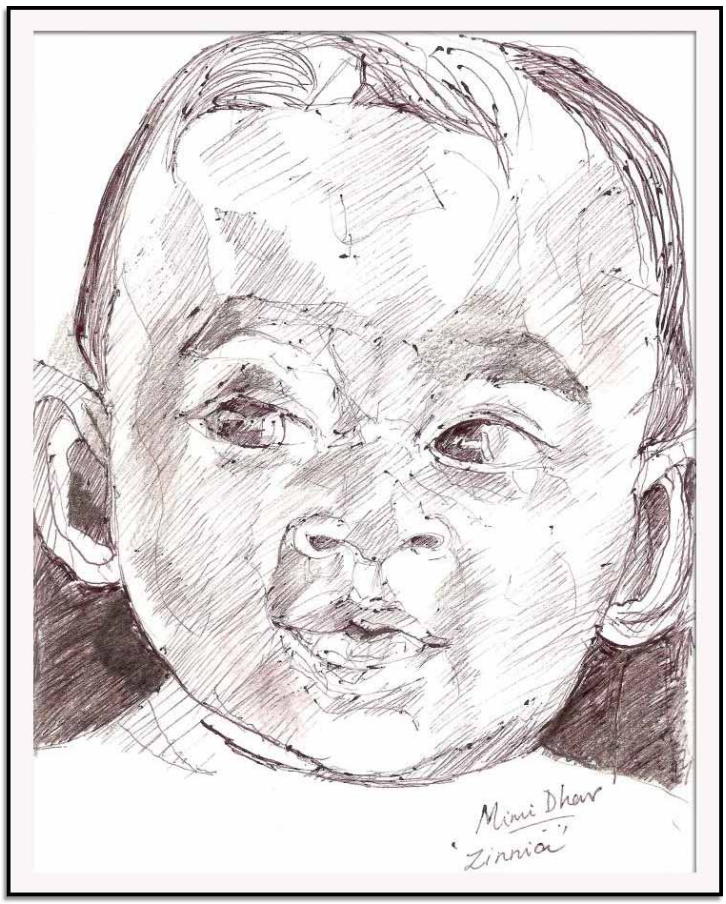

"Zinnia", Mimi Dhar

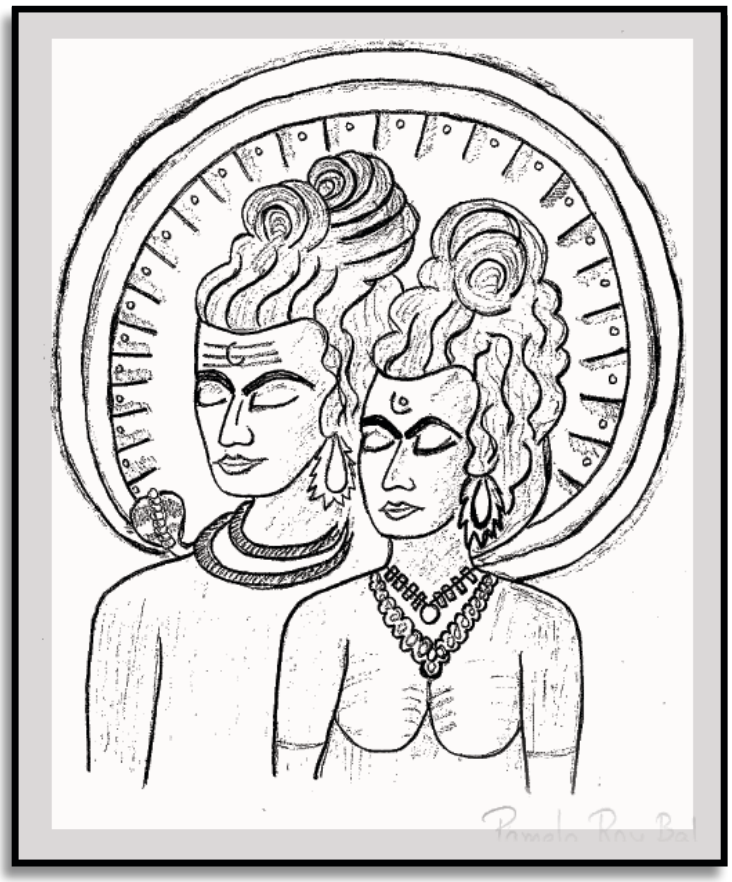

"Shiv Pravati", Pamela Roy Ballabh

"Indoor Plant" Sanchita Ghosh

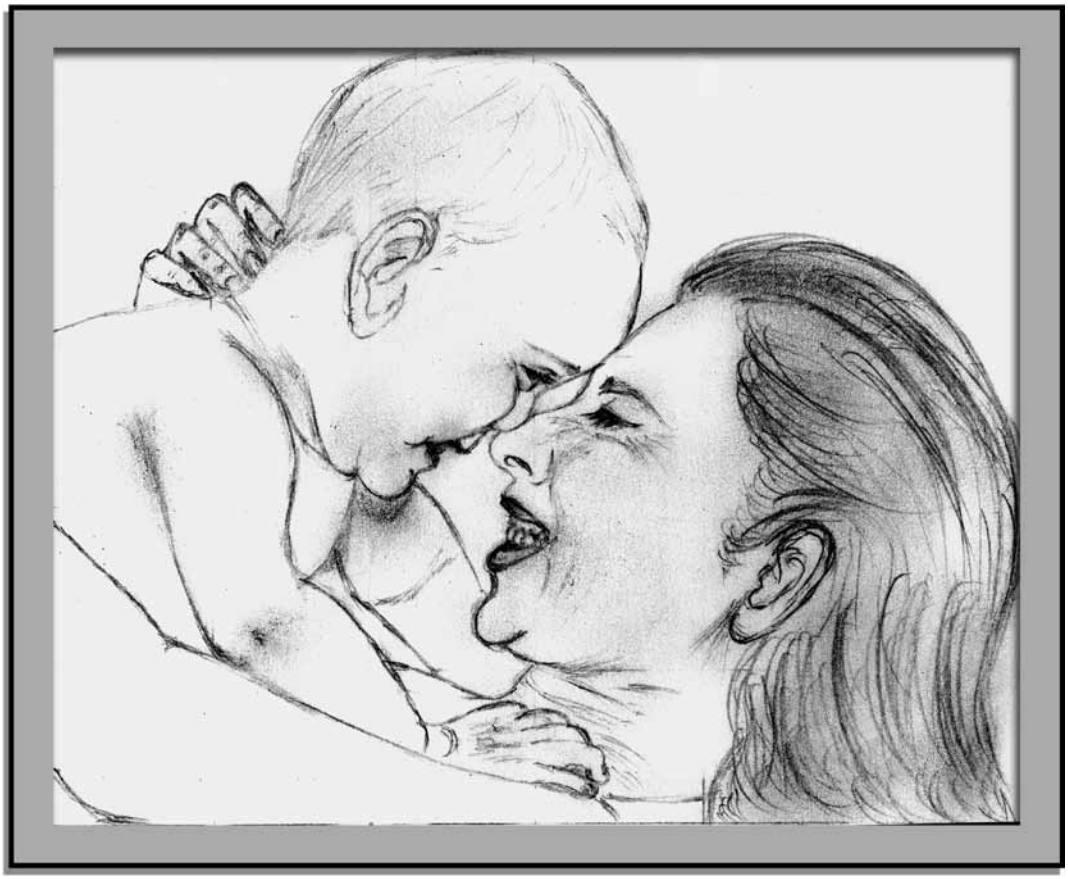

"Affection", Meeta Chanda

"Ganesha", Sushmita Pal and Amrita Pal

"Season of butterfly" oil painting, Madhab Ghose

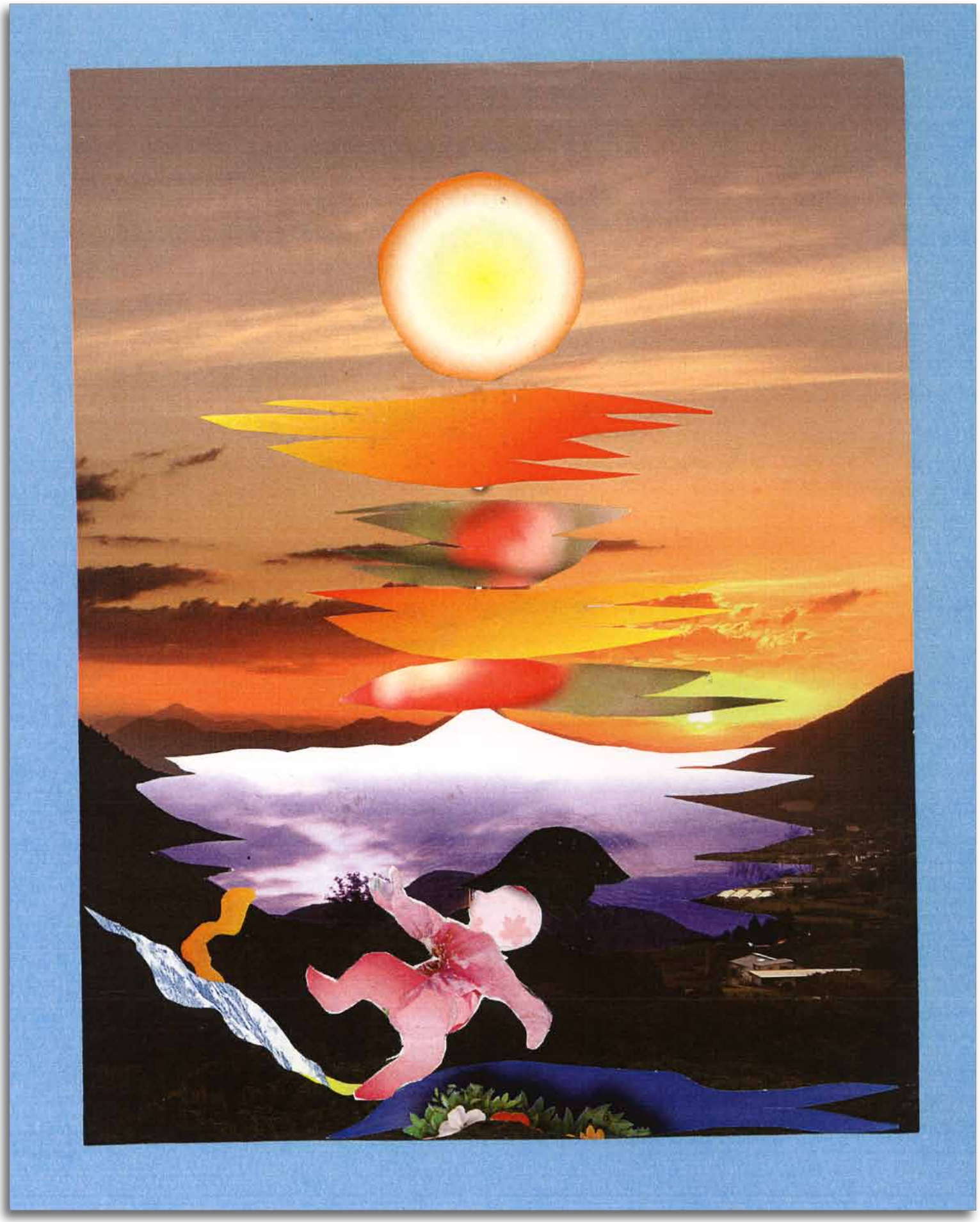

Chigiri art by Jyotirmoy Ray

NIPPON VEDANTA SOCIETY

Ramkrishna Mission in Japan

This mission is represented by

Swami Medhasananda *and is located at*

NIPPON VEDANTA SOCIETY

4-18-1 Hisagi, Zushi-shi,

Kanagawa-ken 249-0001

Bengali Association of Tokyo, Japan

-এর

তরফ থেকে জানাই

শুভবিজয়ার প্রীতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা

আমাদের ওয়েবসাইট

www.batj.org

আমাদের e-mail

batjapan@gmail.com

STATEMENT OF ACCOUNT FOR 2009-2010

INCOME		EXPENDITURE	
ITEM	**AMOUNT**	**ITEM**	**AMOUNT**
Opening Balance on July 31, 2009 from 2008-2009 • In bank a/c • Cash in hand	Yen 640,559 Break up - Yen 423,065 Yen 217,494	Expenses for Durga Puja, Anjali printing, Saraswati Puja, Community meetings, Advertisement in Vivekananda magazine, Storage of Durga Pratima, Hall rentals, rehearsals etc.	Yen 2,313,950
Collection by Subscriptions, pronami, advertisements in Anjali etc.	Yen 2,235,302	Closing balance on Sept 11, 2010 (carried forward to 2010 – 2011) • In bank a/c • Cash in hand	Yen 561,911 Break up – Yen 380,088 Yen 181,823
TOTAL	Yen 2,875,861	**TOTAL**	Yen 2,875,861

SINCERE THANKS FROM
Bengali Association of Tokyo, Japan
www.batj.org

For assistance on the occasion of Durga Puja on October 3, 2009 –

- Mr. and Mrs. J.S. Chandrani for providing Shanti Masala tea for tea time
- Mr. and Mrs. Biswanath Paul for providing flowers for the Puja

For assistance on the occasion of Saraswati Puja on January 30, 2010 –

- Mr. and Mrs. J.S. Chandrani: Shanti Masala Chai and Antakshari Prize (Calcutta Spice Magic Restaurant Gift Coupons)
- Mr. and Mrs. Byomkesh Panda: Antakshari Prize (Priya Restaurant Gift Coupons)
- Brastel Telecom: Antakshari Prize (Prepaid Telephone Gift Cards)
- Ambika Trading Company: Antakshari Prize (Ambika Purchase Gift Coupons)

Anjali Editorial Team